শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

চতুর্দশ ভাগ

চতুর্দশ ভাগ

[জানুয়ারী, ১৯৫৭—ডিসেম্বর, ১৯৫৭]

গুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমা'র অসীম কৃপায় শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী (দিদি) লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের চতুর্দশ ভাগ প্রকাশিত হইল। বর্তমান ভাগে ১৯৫৭ সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা'র অনবদ্য লীলা-কথা স্থান পাইয়াছে। লেখিকা নিজের শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যে ডায়েরীর ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন সেজন্য শ্রীশ্রীমা'র অসংখ্য ভক্ত তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করা যায় শ্রীশ্রীমা'র অনুগ্রহে পরবর্তী ভাগগুলির প্রকাশনও শীঘ্র সম্ভবপর হইবে।

শ্রীশ্রীমা'র শুভ জন্মোৎসব
রা মে, ১৯৭০।

বিনীত—
প্রকাশক

সূচীপত্র

কাশীতে মা ... ১
মামুর বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠা ... ৯
বম্বেতে মা ... ১৬
আমেদাবাদে তুইদিন ... ২০
জয়পুর, কুচামন ও যোধপুরে ... ২১
বৃন্দাবনে গীতাভবন ভাগবত ভবনের প্রবেশ ... ৩১
মোদীনগরে আট দিন ... ৪৪
দেরাতুনে গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব ... ৫৬
আমেদাবাদে শ্রীশ্রীমা'র জন্মোৎসব ... ৬৬
বম্বেতে পাঁচ দিন ... ৮৭
পুণাতে মা ... ৯০
মা'র নিকট দিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী ... ৯৩
মাদারের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ ... ১০৬
দেরাতুনে মা'র বিশেষ অসুস্থতা ... ১৩৪
সূক্ষ্মশরীরধারী অনেকের আগমন ... ১৬৭
কাশী আশ্রমে তুর্গা পূজা ... ১৯১
দিল্লী আশ্রমে সংযম সপ্তাহ ... ২১২
রাষ্ট্রপতি ভবনে মা ... ২২২
রাষ্ট্রপতি ভবনে মা'র ভোগ ... ২২৫
ডাঃ সুধীন মজুমদার ও কান্তিভাই মুন্শী,
ও রামবাবু সাক্সেনার দেহত্যাগ ... ২২৯
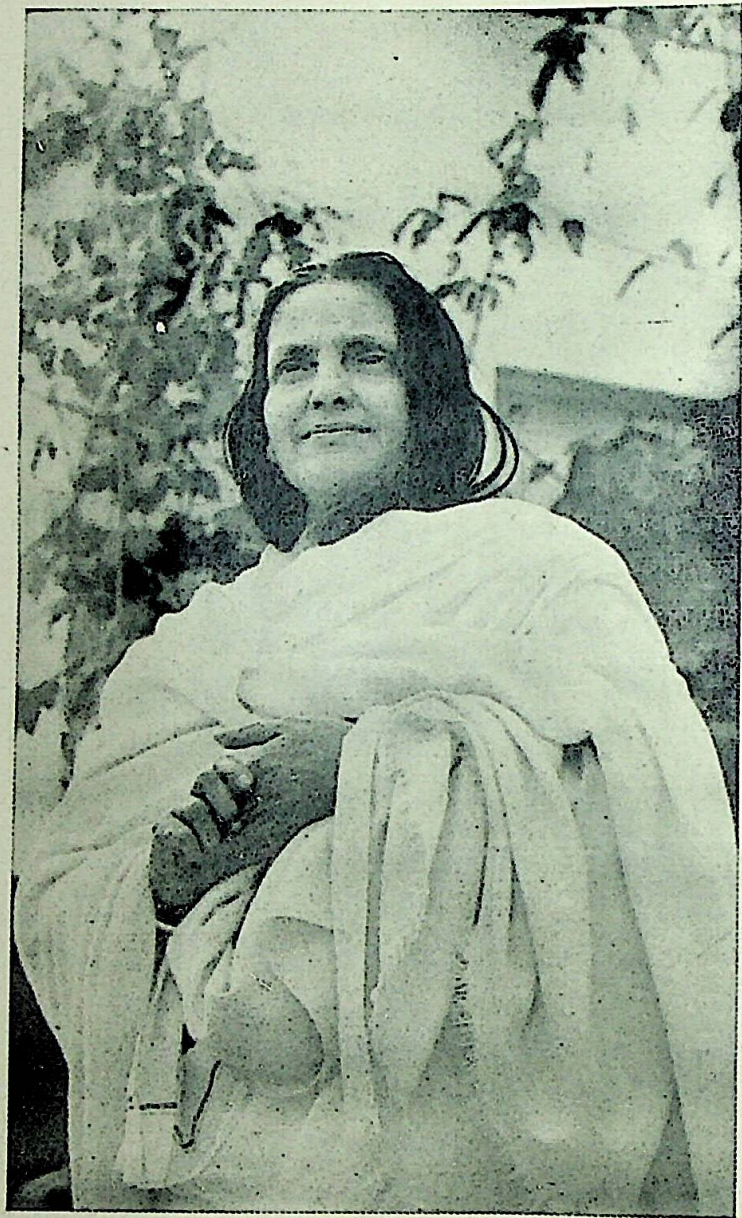
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

চতুর্দশ ভাগ

১লা জানুয়ারী ১৯৫৭।

শ্রীশ্রীমা কাশীতেই আছেন। মা'র শরীরটা মোটেই ভাল যাইতেছে না। আমরা সকলেই সেজন্য বিশেষ চিন্তিত। মা'র শরীরে কিসের জন্য কি হইতেছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ত আমাদের নাই। শুধু এইটুকু জানি যে আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যা মা'র শরীরের উপর প্রয়োগ করা চলিবে না। কিন্তু তবু আমাদের মন যে মানে না।

ডাঃ গোপাল দাশগুপ্তও মা'র জন্য খুবই ভাবিতেছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে কলিকাতা হইতে একজন বড় চিকিৎসক এবং অপর একজন কর্ণরোগ-বিশেষজ্ঞকে আনাইয়া মাকে দেখান হৌক। সেইমতে গতকাল রাত্রেই কলিকাতায় শ্রীঅনিল গাঙ্গুলীর নিকট ফোন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গতকল্য মধ্যরাত্রিতে মা'র অবস্থা হঠাৎ যেন কেমন হইয়া পড়িল যে আমরা উপস্থিত সকলেই বিশেষ ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে মা'র সম্মুখে আমি, দিদিমা, যোগীভাই এবং ভাইয়া প্রভৃতি ছিলাম। হঠাৎ মা'র হাত ছড়াইয়া পড়িল এবং শ্বাসের গতিও যেন কেমন হইয়া গেল। কি যে করিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটু পরে মা'র অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক মনে হইলে আমরা আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই নারায়ণ স্বামীকে পাঠাইয়া শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং ডাঃ দাশগুপ্তকে লইয়া আনা হইল। গতকাল রাত্রে যে অবস্থা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির

হইল যে আজ সকালেই কলিকাতায় ডাক্তারের জন্য ফোন করিয়া দেওয়া হোক।

কবিরাজ মহাশয়ও বলিলেন যে ঔষধপত্র ব্যবহার করা যাইবে না তাহা ত জানা কথাই; কিন্তু তবুও পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত অবস্থা কি তাহা জানা উচিত।

কলিকাতা হইতে ফোনে জানা গেল আগামী কাল সকালেই Heart Specialist ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী এবং Ear-Nose-Throat Specialist ডাঃ যতীন সেন দুইজনে আসিয়া পৌঁছিবেন।

২রা জানুয়ারী ১৯৫৭।

কলিকাতা হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ডাঃ সেন মা'র নাক, কান, গলা বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে ঠাণ্ডা লাগিয়াই নাক হইতে কান পর্যন্ত যে একটি সরু নলী আছে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই বাতাসের চাপের পার্থক্যে এইরূপ শব্দ শোনা যায় এবং ঐ শব্দই অনেক সময় মাথার মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। নাকের মধ্য দিয়া ঈষৎ-উষ্ণ লবণ-জল টানিতে এবং ফুটন্ত জলের তাপ নিতে পরামর্শ দিলেন।

ডাঃ সর্বাধিকারী মায়ের একজন পুরাতন ভক্ত। তিনি মা'র শরীরের এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া ডাঃ সেনকে নিয়া আসিয়াছেন। তিনিও মা'র হার্ট, লাংগ্‌স্‌ এবং রক্তের চাপ খুব মনযোগ-সহকারে পরীক্ষা করিলেন। সবই স্বাভাবিকভাবে আছে বলিলেন। তবে মাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকিতে বলিলেন। কথা-বার্তাও যত কম বলেন ততই ভাল। মা'র ঘরের মধ্যেও যাহাতে সকলে কথাবার্তা না বলেন সেজন্য অনুরোধ করিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার কাজ শেষ করিয়া তিনি নিজে মা'র চরণে সুস্থ হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মা'র সামান্য খেয়ালেই সব-কিছু ঠিক হইয়া যাইতে পারে—আমাদের একমাত্র আশা ত ইহাই।

উভয় ডাক্তারই রাত্রিবেলার গাড়ীতে আজই কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৩রা জানুয়ারী ১৯৫৭।

আজ প্রাতঃকাল হইতে যোগীভাই মা'র শরীরের জন্য অখণ্ড সম্পুটিত চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করাইলেন।

"দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"—এই মন্ত্র দ্বারা সম্পুটিত করিয়া পাঠ সুরু হইল। সাতজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই কার্যে ব্রতী হইলেন। ছয়জন পাঠক এবং একজন আচার্য। সর্বসমেত ২১বার সম্পূর্ণ চণ্ডীপাঠ করা হইবে।

একেবারে গঙ্গার উপরে আশ্রম-চাতালে বসিয়া মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের মুখে এই চণ্ডীপাঠ সকলকেই আনন্দ দিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া সম্পুটের মন্ত্রটি খুবই সুন্দরভাবে নির্বাচন করা হইয়াছে। বারংবার সকলের মনে ঐ সম্পুট-মন্ত্রের অর্থই আসিতেছে,—'হে অখিল জগতের, বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি এবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হইয়া তুমিই নিজ শরীর রোগমুক্ত করিয়া আমাদের ত্রাণ কর।'

সন্ধ্যার পরে ডাঃ দাশগুপ্ত মা'র ঘরে বসিয়া আছেন। কথায় কথায়

মাকে বলিলেন যে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে মহাশয় নাকি খুবই অসুস্থ। তিনি এই অবস্থাতেও মা'র কথা খুবই স্মরণ করিতেছেন। যদি যোগাযোগক্রমে মা'র একবার দর্শন পাইতেন তবে এই সময়ে বৃদ্ধ খুবই আনন্দিত হইতেন।

দে মহাশয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং পরে Pro-Vice-chancellor-ও হইয়াছিলেন। বিশেষ খ্যাতনামা পুরুষ। তাঁহার যথাসর্বস্ব তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইবে। পূর্বেও তিনি মা'র দর্শনলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

তাঁহার এইরূপ অসুস্থতার কথা শুনিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ ত, যদি কোনও আকস্মিক বাধা না হয় তবে কাল সকালে গিয়ে বাবাকে দেখে আসা যাবে।" মা একবার তাঁহার শরীরের বর্তমান অবস্থার কথা খেয়ালেও আনিলেন না।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৭।

সকাল ঠিক ৯টার সময় মা ডাঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দে' বাবাকে দেখিবার জন্য মোটরে রওনা হইলেন। সঙ্গে নারায়ণ স্বামী এবং উদাসও গেলেন।

মা'র শরীর বাহির হইতে দেখিয়া খুবই দুর্বল মনে হইতেছিল। রাস্তা পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে মা'র শরীর এবং পা যেন টলিতেছিল। এই অবস্থায় যে মা আশ্রম হইতে বাহিরে যাইতে পারিবেন তাহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে মা ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলাম মাকে 'দে' বাবার শয়ন-ঘরেই নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। মাকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশাতীত

ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা তাঁহার গলায় মালা দিয়া হাতে ফল দিলেন। একটু সময় সেখানে বসিয়া মা যখন মোটরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor শ্রীযুক্ত ঝা মহাশয় সস্ত্রীক আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন।

জব্বলপুরের বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ডাঃ রঙ্গীলালজী, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুবোধ দাশগুপ্ত, ডাঃ শোভা বাসু প্রভৃতি আরও অনেকেই মা'র আগমন-সংবাদ পাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারাও এক এক করিয়া সকলে,—কেহ একা, কেহ বা সস্ত্রীক, আবার কেহ বা বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মা মোটরেই বসিয়া আছেন। সকলে ঐভাবে ঐস্থানে এইরূপ আকস্মিকভাবে মা'র দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মাকে দর্শন করিয়া সকলে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। মা-ও আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

৫ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

মায়ের কাছে স্বামী বিদ্যানন্দজী।

আজ সকালবেলা হঠাৎ পূর্ব হইতে কোন সংবাদ না দিয়া মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দজী (গীতা স্বামী) মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসিয়াছেন। স্বামিজী ভারতে এবং পাশ্চাত্যদেশে বহু স্থানে গীতাপ্রচার-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন।

মা কন্যাপীঠের উপর তলার ঘরে শুইয়া ছিলেন। মাকে সংবাদ দেওয়া হইল এবং স্বামিজীকে মা'র কাছে নিয়ে যাওয়া হইল। স্বামিজী মা'র নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া নানা কথা বলিলেন এবং মা'র শরীর যাহাতে

শীঘ্র সুস্থ হইয়া ওঠে, তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া গেলেন। স্বামিজীকে মালা-চন্দন এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফল দেওয়া হইল।

সন্ধ্যাবেলা কান্তিভাই এবং পানুকে স্বামিজীর স্থানীয় আশ্রমে পাঠান হইল। তিনি যদি আগামী কাল আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করেন তবে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইব বলায় স্বামিজী বলিলেন যে তিনি নাকি আশ্রমের বাহিরে কোথাও ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

৮ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

মা'র শরীর প্রায় এক প্রকারই চলিতেছে। কথাবার্তাও খুব কমই বলিতেছেন।

আজই সকালে চণ্ডীপাঠও সমাপ্ত হইল। সকল ব্রাহ্মণ মিলিয়া হোম-ও সমাধা করিলেন। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। স্থির হইল, আগামী কাল হইতে শোভা (বম্বের ডাঃ ধীরেনবাবুর স্ত্রী) মা'র শরীরের জন্য নয় দিন পর্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া সম্পূটিত চণ্ডীপাঠ করাইবেন।

৯ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

যোগীভাই আজ হরিদ্বারে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে তিনি মায়ের নিকট, খেয়াল করিয়া শরীরটাকে সুস্থ করিবার জন্য, পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়া গেলেন। মা'র চরণে মিনতি করা ভিন্ন আমাদেরও আর কোন ক্ষমতাই নাই, কি করিব।

মায়ের সুস্থতার জন্য মা'রই চরণে প্রার্থনা।

কলিকাতা হইতে বিনুদা (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীশরদিন্দু নিয়োগী) আসিয়াছেন। সকালবেলা অন্নপূর্ণার মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হঠাৎ মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইবার সঙ্কল্প আসিল। সেই সময় মা-ও ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। বিনুদা বলিলেন যে তাঁহার মনে ঐরূপ সঙ্কল্প ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মা তাঁহার দিকে একবার চাহিলেন; ইহাতে বিনুদার মনে আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে ঐ অনুষ্ঠান যেভাবেই হোক করাইতেই হইবে।

. . . . .

১১ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

মা'র শারীরিক অবস্থা একটু একটু করিয়া যেন ভালোর দিকেই যাইতেছে মনে হয়। প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় কবিরাজ মহাশয় আশ্রমে আসেন। আশ্রমেই সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া মা'র ঘরে রাত্রি ৯-৯৷৷৹টা পর্যন্ত নানা কথা বলেন। ঐ সময়ে নারায়ণ স্বামী, অমূল্যবাবু, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতি জনাকয়েক ভিন্ন আর বিশেষ কেহই থাকেন না।

মায়ের শোওয়া একটা পর্দা টানিয়া দেওয়া মাত্র।

নারায়ণ স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আজ মা'র শুইবার বিষয়ে কথা উঠিলে মা বলিয়াছেন,—"এ শরীরে শুইয়া থাকা মানে ত পড়িয়া থাকা। একটা পর্দা টানিয়া দেওয়া মাত্র। লোকের সহিত বাহিরের দিক দিয়া ব্যবহার বন্ধ করা। তোমরা যেমন ঘরের মধ্যে শুইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেও না, ঐ রকমটাই বলিতে পার। আবার এ শরীরের ব্যবহার অব্যবহারের কোন প্রশ্নই নাই। অন্য কেহ থাকিলেও ব্যবহার—নিজের সঙ্গেই নিজের ব্যবহার আর কি!"

মা'র শরীর ভাল যাইতেছে না এই প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"এই শরীরটা যে তোমরা খারাপ খারাপ বলিতেছ না, ইহার ভেতরেও একটা কথা আছে। এবার হরিদ্বারে সপ্তর্ষি আশ্রমে যখন সংযম সপ্তাহ হয় না, সেই সময়ে সৎসঙ্গে বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে এত বেশী সময় না বসা। তাই এখন একটা নিমিত্ত হইয়া যেন সেই খেয়ালটাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।"

মায়ের খেয়ালের উপরেই মায়ের শারীরিক অবস্থার নির্ভর।

বিনুদার প্রস্তাবিত মহামৃত্যুঞ্জয় জপ আগামী পৌষ-সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করা স্থির হইল। এক লক্ষ জপ, দশ সহস্র হোম, এক সহস্র তর্পণ, এক শত অভিষেক এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার কথা হইয়াছে। মহামৃত্যুঞ্জয় পুরশ্চরণ এইভাবে করাইবার নিয়মই তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, তাই তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ দ্বারাই এই অনুষ্ঠান করান স্থির হইয়াছে। তন্ত্রমতে মাত্র এক অক্ষর জপের বিধি আছে। কিন্তু বৈদিক মতে ৫২ অক্ষর মন্ত্রের বিধি।

মা'র শরীরের জন্য আশ্রমবাসী ছেলে-মেয়েরাও অখণ্ডভাবে জপ ও মৌনতা চালাইয়া আসিতেছে। সকলেরই একমাত্র একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা, কি করিলে মা'র শরীর শীঘ্রাতিশীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবে।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

আজ প্রাতঃকাল হইতেই মহামৃত্যুঞ্জয় জপের অনুষ্ঠান চণ্ডীমণ্ডপের ঘরে আরম্ভ করা হইল। বাসন্তী-পূজার বেদীর উপর আর-ও একটি বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে ঘট স্থাপন করা হইল, আচার্যপদে বরণ

করা হইল কাশীর প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাহিত্যাচার্য মহাশয়কে। সঙ্গে দশ জন ব্রাহ্মণ জপকর্মে নিযুক্ত থাকিবেন। অপর একজন তন্ত্রধারকের কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ব্রাহ্মণদের আসন, বস্ত্র, রৌপ্য-অঙ্গুরী, পঞ্চপাত্র, তাম্রকুণ্ড, পিতলের রেকাব, রুদ্রাক্ষের মালা ইত্যাদি দিয়া বরণ করা হইল। আচার্যকে দেওয়া হইল রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়।

প্রত্যহ ২০ হাজার করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া পাঁচদিনে মোট এক লক্ষ জপ সমাপ্ত করা হইবে। ব্রহ্মচারী ভরত অনুষ্ঠানের যজমান হইলেন।

আজ আরও একটি বিশেষ শুভ কার্য আরম্ভ করা হইল। মা'র শরীরের পিতার একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল একটি শিব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দিদিমাকে স্বপ্নেও নাকি একবার বলিয়াছিলেন,—"কৈ আমার কাজটি করাইলে না!"

আশ্রমের সন্নিকটেই মায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাখন গত কয়েক বৎসর হইল একটি বাড়ী করিয়াছে। সেই বাড়ীর মধ্যে-ই ছোট একটি শিব-মন্দিরের নির্মাণকার্যও সমাপ্ত হইয়াছে। আবার বহু দিন পূর্ব হইতেই নর্মদা হইতে কয়েকটি শিবলিঙ্গ আনাইয়া আশ্রমে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি লিঙ্গ নির্বাচিত করিয়াও রাখা হইয়াছিল। সেই লিঙ্গটি-ই আজ মায়ের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ এতদিনে মা'র কৃপায় দাদামহাশয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মা যদিও বলেন,—"স্বয়ং তিনি আজ কৃপা করে এসে প্রতিষ্ঠিত হলেন।"

মাখনের বাড়ীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা

যাহা হৌক ভোর ৬টার সময় আশ্রম হইতে বাদ্যঘণ্টা-সহ শিবলিঙ্গ মাখনের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পরে সেখান হইতে পুনরায় বাদ্য-ভাণ্ড-সহ, শিব পার্বতী ও নন্দীকে

গঙ্গাস্নানে লইয়া যাওয়া হইল। স্নানান্তে তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া শিবলিঙ্গ, পার্বতী এবং নন্দী আসিয়া মা'র উপস্থিতিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরের মধ্যে-ও প্রথমে পঞ্চগব্য এবং পঞ্চামৃত দ্বারা উহাদিগকে স্নান করাইয়া পরে পুনরায় ৮ ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করান হইল। ইহার পরে শিবলিঙ্গকে যথাবিধি স্থাপনা করা হইল। স্থাপনান্তে ষোড়শোপচার পূজা এবং হোম আদিও মা'র উপস্থিতিতেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শিব-লিঙ্গের নামকরণ হইল বিপিনেশ্বর এবং মন্দিরের নাম হইল শিবধাম।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

গতকাল শিব-প্রতিষ্ঠার পর হইতে-ই মা'র নাকি কেবলই খেয়াল হইতেছিল যে শিব-প্রতিষ্ঠাকার্যে কোথায় যেন কি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মা তখন ঐ বিষয়ে কাহাকে-ও কিছু বলেন নাই।

আজ সকালে মা আসিয়া আমার ঘরে বসিয়াছেন। এমন সময় নারায়ণ স্বামিজী, বাটুদা এবং পুরোহিত বিশু আসিল। বিশুকে দেখিয়াই মা প্রশ্ন করিলেন,—"কাল তোমরা কি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলে?"

বিশু একটু অপ্রস্তুত হইয়া-ই বলিল,—"না, মা। শিবমন্দির শোধন করা হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।"

তখন মা বলিলেন,—"কাল থেকেই কেবল খেয়ালে আসছিল, কি যেন একটু কাজ রয়ে গেল। আজ তোমরা সামনে উপস্থিত তাই বলার খেয়াল হ'ল। এই কাজটা না হলে কিন্তু চিরদিনের জন্যে কাজটা অপূর্ণ-ই থেকে যাবে। এখন কি মন্দির আর প্রতিষ্ঠা হতে পারে না? তোমাদের শাস্ত্রে কি লেখা আছে?"

সর্বজ্ঞা মা।

মা'র জিজ্ঞাসা অনুসারে এই বিষয়ে খোঁজ লওয়া হইল। মহামৃত্যুঞ্জয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে কয়েকজন অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, প্রাচীন পণ্ডিত আশ্রমেই আছেন। ইহা ভিন্ন কাশীর সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত কমলাপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে-ও জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহারা সকলেই মন্দির-প্রতিষ্ঠায় মত দিলেন। সেই অনুসারে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আগামী কাল পূর্ণিমা তিথিতে মন্দির-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইল।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৭।

একটি বিচিত্র ঘটনা।

আজ বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্ণিমা তিথি আছে। তাই সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে-ই মাখনের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। দশজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস্তু-মন্ত্র জপ করিলেন। মা'র উপস্থিতিতে মা'র সম্মুখেই বেলা ১১॥০ টার মধ্যে বিধিমত সুন্দর-ভাবে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। মা'র ব্যবস্থায় কোন বিষয়েই ত সামান্যতম ত্রুটি-ও থাকিবার উপায় নাই। মন্দিরের কার্যে সামান্য ত্রুটির জন্য গতকাল হইতেই আশ্রমের ব্রহ্মচারী কয়েকজনকে দিয়া এক লক্ষ শিবমন্ত্র জপ করান হইতেছে।

আশ্রমের মধ্যে-ও একটি কাজ করাইবার ছিল। আজ তাহাও বিধিমত সম্পন্ন হইল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনাতে পুস্তকালয়ের উপরে মা'র জন্য একটি নূতন ঘর নির্মিত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে পৌষ-সংক্রান্তির দিন মাকে ঐ ঘরে প্রবেশ করান হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে মা'র মুখ হইতে কয়েকবার-ই পূর্ণিমার কথা বাহির হইয়াছিল। যোগাযোগক্রমে তাহাই সত্য হইল। যোগেশদাকে সংক্রান্তির পূর্বে-ই বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে তিনি ঐদিন প্রাতে মা'র ঘরে নারায়ণ-শিলা লইয়া পূজা এবং হোম করিবেন। মা'র ঘরের উপরে-ও একটি ছোট সুন্দর ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে।

যোগেশদা মনে করিলেন যে ঐটি-ই বোধ হয় মা'র জন্য করা হইয়াছে। তাই ভুলক্রমে তিনি ঐ ঘরে-ই নারায়ণ-শিলা লইয়া গিয়া পূজা এবং হোম সমাপনান্তে মাকে-ও ঐ ঘরেই প্রবেশ করাইলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত বড় যে, একটা ভুল ইহা তখন কাহারো নিকটেই ধরা পড়িল না এবং মা-ও নীরব-ই রহিলেন। পরে অনেকেই খেয়াল করিয়া বলিলেন যে ইহা কি হইল।

এদিকে আজ পূর্ণিমার দিন তাই মা'র নির্দিষ্ট ঘরে-ই পুনরায় নারায়ণ-পূজা এবং হোমের ব্যবস্থা করা হইল। ১২ টার মধ্যে-ই মাখনের বাড়ীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য করাইয়া মা আসিয়া নূতন ঘরে প্রবেশ করিলেন। একে একে উপস্থিত সকলকেই মা ঘরে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং গিয়া আসনের উপর বসিলেন। মাকে মালা চন্দন দিয়া পূজা করা হইল। আমরা অবাক্ হইলাম এই ভাবিয়া যে মা'র মুখ দিয়া বহু পূর্বে-ই পূর্ণিমা দিনের কথা বাহির হইয়াছিল এবং আজ তাহা আমাদের ভুলের মধ্য দিয়া ফলিয়া গেল।

কথা হইল আজ হইতে মা এই ঘরেই শুইবেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে মা'র খেয়াল অনুযায়ী খাট, আলমারী, সতরঞ্চি বা গালিচা কিছু-ই পাতা হইল না। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বোরার মধ্যে খড় পূর্ণ করিয়া গদি বানান হইল। তাহার-ই উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া কাঁথা দিয়া মা'র শয্যা তৈয়ারী হইল। অবাক্ হইয়া আমরা মা'র লীলা দেখিলাম। কখন কি জন্য মা কি করেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৭।

গত কাল মহামৃত্যুঞ্জয় জপ-সমাপ্ত হইয়াছে। আজ আহুতি পূর্ণ হইল। হোম এবং পূর্ণাহুতির সময় মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক সহস্র

তর্পণ, তাহার দশমাংশ মর্জন, এবং ১০ জন ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপ্ত হইল। পুনরায় ষোড়শোপচারে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের ও পার্বতী দেবীর পূজা হইল। শান্তিজল প্রদান এবং দক্ষিণান্ত করিতে করিতে প্রায় অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইয়া গেল।

মা'র শরীর-ও যেন আজ একটু ভালই বোধ হইতেছে। মা'র শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে সেই জন্য সকলেই নানাভাবে মা'র চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন। কেহ অখণ্ড চণ্ডীপাঠ করাইতেছেন, কেহ মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করাইতেছেন, কেহ বা অখণ্ডভাবে নাম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা ব্যক্তিগতরূপে সংকল্প করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সকলের-ই একমাত্র কামনা মা যেন শীঘ্রাতিশীঘ্র সুস্থ হইয়া ওঠেন।

২০শে জানুয়ারী ১৯৫৭।

যেখানে কীর্তনাদি হয় সেখানে সূক্ষ্ম-দেহধারীদের জন্য একখানা আসন রাখা ভাল।

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরে কবিরাজ মহাশয় গিয়া বসিয়াছেন। নারায়ণ স্বামী, অমূল্যদাদা, ডাঃ দাশগুপ্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন আজ উপস্থিত আছেন। তান্ত্রিক সাধনার বীজমন্ত্রের এত প্রাধান্য কেন —এই সম্পর্কে কবিরাজ মহাশয়ের সহিত নারায়ণ স্বামী নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় মা নাকি হঠাৎ কি বলিতে যাইয়া চুপ করিয়া গেলেন। প্রায় ২।৩ মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া মা নিজেই বলিলেন,—"একজন সাদা চুল ও দাড়িওয়ালা ঋষির ন্যায় পুরুষ এসেছিল। বাবা (কবিরাজ মহাশয়) ও নারায়ণের সম্মুখে এসে তাদের আড়াল করে বসেছিল।" একটু পরে বলিলেন,—"কাল থেকে এখানে যেন একটা আসন পেতে রাখা হয়।"

এই কথা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—"যেখানে কীর্তন ইত্যাদি হয় সেখানেও একখানা আসন পেতে রাখা ভালো।"

আগামী ২৩শে মা'র কলিকাতা রওনা হইবার কথা হইয়াছে। মা'র শরীর এখনো সুস্থ হয় নাই। কিন্তু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে মা এই শরীর লইয়াও কলিকাতার মত ভিড়ের মধ্যে যাইতেছেন।

কলিকাতার যতীশ গুহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ক্ষিতীশের জামাতা দ্বিজেন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। সে কিছুদিন পূর্বে যখন ইন্দোনেশিয়াতে ছিল তখন স্বপ্ন দেখে যে মা যেন আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন,—"তোমার বাড়ীর তেতালায় আমাকে নেবে না ?"

দ্বিজেন সম্প্রতি কলিকাতায় বালীগঞ্জে একটি নূতন বাড়ী ক্রয় করিয়াছে। স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী সে ঐ বাড়ীর তিন তলার ঘর মা'র জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তিন দিনের জন্য মাকে সে সেই বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছে। ইতিমধ্যে সে নিজেও এখানে আসিয়া মা'র চরণে নিবেদন জানাইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় চার দিন থাকিয়া ২৮শে রাত্রেই এখানে মা'র ফিরিয়া আসার কথা হইল।

২৩শে জনুয়ারী ১৯৫৭।

কলিকাতার পথে।

আজ বেলা ৩৷৹টায় মা কলিকাতা রওনা হইলেন। সঙ্গে নিলেন মাত্র পরমানন্দ স্বামী ও উদাসকে। গতকাল-ই বুনি, হেমিদি, কল্যাণী, হরপ্রসাদ প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৮শে মা এখানে ফিরিয়া আসিলে ৩১শে আমার ও মা'র বম্বে যাওয়ার কথা। ভাইয়া (শ্রীযুক্ত বি কে সাহ) মাকে ও আমাকে বম্বে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৭।

রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে মা আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম এই চার দিন দ্বিজেনের বাসাতেই বিরাট্‌ভাবে আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে তাহার পিতামাতাও আসিয়াছিলেন। দ্বিজেনের স্বপ্ন যে এইভাবে মা'র কৃপায় পূর্ণ হইল ইহা ভাবিয়াই যেন সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই চারদিন মা দ্বিজেনের বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও যান নাই।

গতকাল সকালে ৭॥৹টায় দ্বিজেনের বাসা হইতে বাহির হইয়া কয়েকটি স্থান ঘুরিয়া বেলা ১০টায় মা হাওড়া স্টেশনে আসেন। পরে তুফান এক্সপ্রেসে মোগলসরাই হইয়া কাশী আসেন।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৫৭।

আজ দুপুরবেলা ভাইয়া দিল্লী হইতে আসিলেন। তিনি মাকে লইয়া পরশু সকালে বম্বে রওনা হইবেন। মা'র থাকিবার জন্য বম্বেতে তাঁরই বাড়ীর বাগানের মধ্যে একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ারী করিয়াছেন। স্থানটি খুবই সুন্দর এবং একান্ত। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা মা কিছুদিন সেখানে একান্তে বিশ্রাম করেন।

সন্ধ্যাবেলা অম্বের রাজাসাহেব সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠিক করিয়া আসিয়াছেন যে মা'র নিকটে দিনকয়েক থাকিবেন, কিন্তু মা ত একদিন পরেই চলিয়া যাইতেছেন। এই সংবাদে তাঁহারা খুবই দুঃখিত হইলেন।

রাত্রিতে রাজাসাহেব মা'র সঙ্গে একান্তে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৭।

আজ সকালে বম্বে মেইলে মাকে লইয়া আমি, ভাইয়া, স্বামিজী, বুনি, উদাস, শোভা প্রভৃতি রওনা হইলাম। সঙ্গে অম্বের রাজা-রাণীও সপরিবারে চলিলেন। কলিকাতা হইতে কান্তিভাই এবং বিভূও আজই বম্বে রওনা হইতেছে। বম্বেতে মা'র ১০।১৫ দিন মাত্র থাকিবার কথা হইয়াছে; সেখান হইতে একবার আহমেদাবাদ যাইবেন।

বম্বের পথে মা।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ বেলা প্রায় ১টার পরে আমরা বম্বে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশনে লীলা বেন প্রমুখ বহু স্ত্রী-পুরুষ মা'র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা স্টেশনে নামিতেই মাকে ভাইয়ার গাড়ীতে করিয়া সোজা ভাইয়ার ভিলে পার্লের বাড়ীতে লইয়া আসা হইল। আম্বের রাজা-রাণী তাঁহাদের নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন।

ভাইয়ার বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম যে বাড়ীর পশ্চাদ্‌দিকে টেনিস কোর্টের উপর খুব সুন্দর ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরের ঢং-এ একটি বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছে। লীলা বেন নিজের পছন্দমত বাড়ীটিকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মা'র যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেজন্য ঘরের মধ্যে air conditioning machine বসান হইয়াছে। বাহিরের শব্দ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

বম্বেতে মা।

মা আজকাল সম্পূর্ণ বিশ্রামেই আছেন। স্থানীয় সকলকে মা'র আগমন-সংবাদ-ও দেওয়া হয় নাই। এই কারণে বিশেষ কোন ভীড়ও নাই। মা'র যাহাতে সর্বতোভাবে বিশ্রাম হয় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা ভাইয়া ও লীলা বেন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মা'র দিন-কয়টি বিশ্রামের মধ্যে-ই কাটিতেছে। কখনো মা বাগানের মধ্যে আপনভাবে পদচারণা করিয়া বেড়ান। কখনো ভাইয়া মোটরে করিয়া মাকে একটু বাহিরে ঘুরাইয়া আনেন। মা'র শরীর-ও পূর্বাপেক্ষা অনেকটা স্বাভাবিক মনে হইতেছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ মা প্রথম অল্পক্ষণের জন্য সাধুবেলা আশ্রমে গেলেন। সেখানে কী উৎসব হইতেছে। তাহারাই আসিয়া অনেক আগ্রহ করিয়া মাকে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে মা সন্ন্যাস আশ্রমে কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া আসিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে মা ইতিপূর্বেও কয়েকবার গিয়াছেন। দক্ষিণ-যাত্রা হইতে ফিরিবার সময় হরিবাবা প্রভৃতির সহিত মা সেখানে দিন-কয়েক ছিলেনও। সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী১০০৮ মহেশ্বরানন্দজীও মাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন।

মা'র শরীর ভাল না শুনিয়া একজন আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মা, আপনি চ্যবনপ্রাশ খাইলেও ত পারেন।" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—

"হ্যাঁ বাবা, চ্যবনপ্রাশ আর বলরাম-জল ত খাচ্ছিই।" ভদ্রলোকটি হয়ত মা'র কথার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

আগামী পরশু মা'র এখান হইতে আহমেদাবাদ যাইবার কথা হইয়াছে। সেখানে দুই-তিন দিন থাকিয়া জয়পুর, যোধপুর ও কুচামন প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়া ২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃন্দাবন পৌঁছিবার কথা হইয়াছে। ভাইয়ার বিশেষ আগ্রহ ছিল মা বেশ কিছুদিন এইখানেই একান্তে বিশ্রাম করেন। কিন্তু ওদিকে পূর্ব হইতেই শ্রীহরিবাবা ও অবধূতজীর সঙ্গে মা'র প্রোগ্রাম স্থির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এখানে মা'র আর অধিক দিন থাকা সম্ভব হইল না।

মা'র শরীরের বর্তমান যা অবস্থা তাহাতে মা'র এখন বেশ কিছুদিন বিশ্রামে থাকা একান্ত প্রয়োজন,—প্রত্যেক ডাক্তার-ই এই অভিমত দিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্রামের সুযোগ আসিতেছে না। আর মা ত সাধু-মহাত্মাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেনও না। অবশ্য নিজের যদি সেরূপ কোন খেয়াল হয় তবে ভিন্ন কথা। এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলেই মা বলেন,—"চলিতেছে চলুক। যাহা হইয়া যায়।" শুনিলাম গতবার হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময়ে মোদীনগরে বসিয়া অবধূতজীর সহিত ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির হইয়াছিল। তাহা ছাড়া জয়পুরের শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মাজী বহুদিন ধরিয়া মাকে একবার ওদিকে নিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কুচামনের রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিংহজী-ও মা এবং শ্রীহরিবাবাকে তাঁহার ওখানে নিয়া যাইবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি জানাইয়াছেন। যোধপুরেও শ্রীহরিবাবার ভক্তেরা তাঁহাকে এবং মাকে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এবার তাই এদিক্ হইতে ফিরিবার পথে ঐ কয়টি জায়গায় মা'র যাইবার কথা হইয়াছে। শ্রীহরিবাবাও অবধূতজীর সহিত উপস্থিত থাকিবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ রাত্রি ৯টায় গুজরাট মেলে মা আহমেদাবাদ রওনা হইলেন। স্টেশনে যাওয়ার পথে মা স্থানীয় ভক্ত শ্রীমূলজীভাই পেটেলের বাড়ীতে একটু সময় থাকিয়া গেলেন।

এই মূলজীভাই-এরা খুবই ভক্ত পরিবার। দিদিমার শিষ্য। পূর্বে অনেকবার মা সকলকে লইয়া মূলজীভাইয়ের বাসাতে ছিলেন। অধুনা বাড়ীর সংলগ্ন শিব-মন্দিরের সম্মুখে একটি বেশ বড় হলঘর নির্মিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে মায়ের জন্য একপ্রস্থ ঘরও নির্মিত হইয়াছে, মা যাহাতে ইচ্ছানুযায়ী যখন তখন আসিয়া থাকিতে পারেন। মূলজীভাইয়ের স্ত্রী মনি বেন এবং তাঁহার কন্যাগণ সকলেই খুব ভক্তিমতী।

আহমেদাবাদে মা।

আমি বম্বেতেই রহিয়া গেলাম। কথা হইল শরীর যদি একটু ভাল থাকে তবে পরে সোজা বৃন্দাবন যাইতে পারি। এবার পূর্বেই আমার বম্বে আসিবার কথা হইয়াছিল এবং তখনই কথা হইয়াছিল যে আর একবার X-Ray ইত্যাদি করিয়া যদি সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা যায় এবং চিকিৎসকবর্গ সম্মত হ'ন তবে আমার বেল্টটি খুলিয়া ফেলা হইবে।

১৯৫৫ সনে জুলাই মাসে এখানেই আমার প্লাষ্টার খোলা হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই ডাক্তারের নির্দেশক্রমে এই Abdominal Belt ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। গত বৎসর জুলাই মাসেও যখন এখানে আসিয়াছিলাম একবার বেল্ট খুলিবার কথা হইয়াছল।

যাহা হোক, মা চলিয়া যাওয়ার পরে স্থানীয় নানাবতী হাসপাতালে আমার X-Ray লওয়া হইয়াছে। কিন্তু Report আমাকে এখনো জানানো হয় নাই। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছি যে প্লেট লওয়ার পর হইতেই ভাইয়া ও লীলা কেমন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা

সর্বদা হাসিমুখে আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেন তাঁহারা অকস্মাৎ এইরূপ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হওয়ায় আমার সন্দেহ হইল যে রিপোর্ট বোধ হয় ভাল হয় নাই।

ডাঃ শেঠ বম্বের বাহিরে গিয়াছেন। তাই কথা হইল তিনি আসিয়া দেখিলে সব স্থির করা হইবে। মা-ও যাইবার সময়ে আমাকে কিছুই ইঙ্গিত দিয়া গেলেন না। প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা একেবারেই বুঝিতে পারিলাম না। যাক, মা'র যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আহমেদাবাদ হইতে বুনির পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। মা পরশু ভোর ৬টায় ওখানে পৌঁছিয়াছেন। স্টেশনে বহু ভক্ত মাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিয়াছিল। মাকে স্টেশন হইতে সোজা কান্তিভাই মুন্সার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে অন্যান্য বারের মত এবারও asbestos দিয়া খুব বড় করিয়া শ্রীমুন্সার বাগানের মধ্যে মা'র ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে।

মণ্ডির রাজা এবং রাণীসাহেবা ওখানে গিয়া মাকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের মেয়ে ইন্দিরাও সঙ্গে ছিল। রাজাসাহেব ব্রেজিলে ভারতের রাজদূত হইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। ভারতে গত জুলাই মাসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বম্বেতে গতবার আমার সঙ্গে রাণীসাহেবার দেখা হইয়াছিল। তিনি পরে কাশীতেও গিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা সাহেবের সঙ্গে ভারতে ফিরার পরে এই প্রথম দেখা হইল।

রাজাসাহেব মা'র নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন যে মা তাঁহাদের এত দূরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এতদিন মা'র দর্শনের কোন সুযোগই

তাঁহাদের ঘটে নাই। মা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"বাচ্চা খেলমে মস্ত হোকর মাকো ভুল যাতা হয়।" আবার বলিলেন,—"ইস শরীর কা তো ভুলনে কা কোই প্রশ্নই নাহি হয়। বাচ্চী তো পিতামাতাকে সাথ হী রহী।"

গতকাল সন্ধ্যায় কালুপুরে মহারাষ্ট্রী মেয়ে ডাক্তার বিধ্য মাকে তাহার নার্সিং হোমে লইয়া গিয়াছিল। ঐ বাড়ী লইয়া নাকি পূর্বে খুবই একটা গোলমাল চলিতেছিল। এইজন্য ডাঃ বিধ্য নাকি মা'র নিকট যাহাতে হাসপাতাল ভালমত চলে সেজন্য প্রার্থনাও জানাইয়াছিল। মা'র যাওয়ার পর হইতে নাকি সেইসব গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে—কোন গণ্ডগোলই আর নাই। তাহার ধারণা মা'র বিশেষ কৃপাতেই সমস্ত সুব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহার নার্সিং হোম-ও সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। মাকে নিয়া বিধ্য সেখানে মা'র আরতি করিয়াছে এবং প্রসাদও বিতরণ করিয়াছে।

আজ ভোরেই মা'র ট্রেনে জয়পুর রওনা হইবার কথা। মা'র সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বুনি, উদাস, শোভা প্রভৃতি কয়েকজন আছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

জয়পুর হইতে বুনির পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। পরশু রাত্রি প্রায় ১২॥টার সময় মা জয়পুর গিয়া পৌঁছিয়াছেন। স্টেশনে বহু স্ত্রী-পুরুষ মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিল। মাকে দাদুপন্থীদের একটি বিরাট্ আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। মা'র থাকিবার ব্যবস্থাও সেখানেই হইয়াছে। স্থানটি নাকি খুবই সুন্দর, বেশ প্রশস্ত আশ্রম—আশ্রমের বাগানটিও খুব সুন্দর এবং বড়।

জয়পুরে মা।

শ্রীহরিবাবা, অবধূতজী প্রভৃতি মদনমোহন বর্মার বাসাতেই আছেন। সঙ্গে রাস-পার্টিও আছে।

শ্রীযুক্ত বর্মা সস্ত্রীক মা'র দীর্ঘ দিনের পরিচিত ভক্ত। তিনি পূর্বে রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar ছিলেন; বর্তমানে রাজস্থান Public Service Commission-এর Member. তাঁহারই বাড়ীর আঙ্গিনায় সামিয়ানা লাগাইয়া সৎসঙ্গ ও রাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্মা সাহেব, মা এবং সঙ্গীয় কাহারও যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য স্বয়ংই সব খোঁজ-খবর নিতেছেন। মা'র বিশ্রামের দিকেও তাঁর বিশেষ লক্ষ্য।

জয়পুর যাইবার পথেই মা ট্রেন হইতেই আমাকে পত্র লিখাইয়াছেন। মা জানিতে চাহিয়াছেন,—"দিদি কেমন আছে? স্ফূর্তিতে যেন থাকে।" ইত্যাদি। মা'র কৃপা অসীম। কিভাবে আমি শীঘ্র সুস্থ হইব, সেদিকে মা'র খেয়াল সর্বদাই আছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

জয়পুরের গোবিন্দ-মন্দিরে মা।

আর চার দিন পরে মা'র সংবাদ পাওয়া গেল। জয়পুরে মা ১৮ই সকাল পর্যন্ত থাকিয়া কুচামন রওনা হইয়াছেন। ইহার পূর্বদিন দুপুরে সৎসঙ্গের পরে মাকে মিসেস্ সিংহার ছেলের বাড়ী এবং রাজুদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পরে বৈকালে আবার গান্ধীনগরে ডাক্তার গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় মাকে কিছু সময়ের জন্য নেওয়া হয়। তাঁহার স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ। নিজে আসিয়া মাকে দর্শন করিতে পারিবেন না। তাই মাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ডাঃ গুপ্তের বাসা হইতে মাকে জয়পুরের প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। গোবিন্দজী

খুবই জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকে বলে বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মূর্তিকেই নাকি মুসলমান আক্রমণের পরে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হইয়াছিল।

বৈকালে মা নাকি বহুক্ষণ "হে ভগবান্, হে ভগবান্" এবং "রাম রাম রাম রাম" এই নাম করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে রওনা হইবার পূর্বদিন সেখানে সৎসঙ্গও নাকি হইয়াছে।

একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মায়া কোথা হইতে আসে? মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, মায়ার মধ্যে থেকে মায়া কোথা থেকে আসে বোঝা কঠিন। তাঁকে জানতে চেষ্টা করা। নিজেকে জানা মানেই তাঁকে জানা। নিজেকে পেলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়। মায়ায় থাকতে মায়াকে জানা কঠিন, বাবা।"

মায়ার মধ্যে বাস করিয়া মায়াকে বোঝা কঠিন।

আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—"নিজেকে জানিবার উপায় কী?" মা তার উত্তর দিলেন,—"গুরু যে পথ বলেছেন, সেই পথে চলার চেষ্টা। বসে থাকা না। চলতে চেষ্টা করা। আর কর্ম যদি ভাল লাগে তবে তদ্ বুদ্ধিতে কর্ম করা। দেশ-সেবা, গৃহলক্ষ্মীর সেবা, বালগোপাল সেবা, পতিসেবা—তিনিই যে বহুরূপে। কেবল খাওয়া-শোওয়ায় সময় না কাটান। অমূল্য মনুষ্য-জন্ম বৃথা চিন্তায় নষ্ট না হয়। ধর্মশালায় আর বাস না করে নিজের ঘরে যেতে চেষ্টা কর।" এইরূপ মা নাকি অনেক কথা বলিয়াছেন।

জয়পুরে এই দুই-তিন দিনেই নাকি মা'র শরীর অনেক ভাল হইয়াছে। জায়গাটি খুব একান্ত এবং শুকনা। বুনি লিখিয়াছে, ওখানে মা'র আরও কয়েকটি দিন থাকা হইলে খুবই ভাল হইত।

পরশু মা মোটরে পৌনে নয়টায় কুচামন রওনা হ'ন। একটি মোটরে

মা, উদাস ও বুনি এবং স্বামিজী। রাজা প্রতাপ সিংহজী নিজে গাড়ী চালাইতেছিলেন। অন্য একটি মোটরে হরিবাবা, অবধূতজী প্রভৃতি। মায়ের সঙ্গীয় আর সকলকে ট্রেনে ও বাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কুচামনের পথে মা।

কুচামন রাজ্য জয়পুর হইতে ৯০ মাইল দূরে। কুচামনের প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর দুইটি দুর্গ দেখিয়া মা প্রতাপ সিংহ ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ দুর্গ কাহার?

প্রতাপ সিংহ ভাই মাকে তাহার ইতিহাস শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, ঐ দুর্গ তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষদের। এক সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় এক ভাই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহা ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তিনি ঐ পাহাড়ের ওপর ধূঁয়া দেখিতে পান। তিনি ঐ ধূঁয়ার নিকটে গিয়া এক বৃদ্ধ মহাত্মাকে দেখিতে পান। তিনি নিকটে যাইতেই মহাত্মা তাঁহার নাম ধরিয়া ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কিজন্য ঐখানে আসিয়াছেন। রাজাসাহেবের সেই পূর্ব-পুরুষ (নাম জালিম সিংহ) মহাত্মাকে বলেন যে তিনি রুটির খোঁজে আসিয়াছেন। যেখানে রুটি পাইবেন সেইখানেই থাকার ইচ্ছা। তখন সেই মহাত্মা তিন খানি পাথর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন ঐখানে তাহার কেল্লা বানাইতে। তাঁহার নির্দ্দেশমত জালিম সিংহ ঐখানেই ঐ দুর্গ বানাইয়াছেন। ইহাই নাকি কুচামন রাজ্যের উৎপত্তির প্রারম্ভিক কাহিনী।

কুচামন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

সেই মহাত্মা নাকি শিববিশ্বেশ্বরনাথ বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। এখনো ঐ মহাত্মার ব্যবহৃত খড়্গ, যোগদণ্ড প্রভৃতি নাকি ঐ কেল্লার ভিতরে সযত্নে রক্ষিত আছে। পরে ঐ দুর্গের ভিতরেই মন্দির স্থাপিত হয়। মহাত্মার দেহত্যাগ হইলে তাঁহাকে ঐস্থানেই সমাহিত করা হয়।

যাক, মা'র মোটর কুচামনের পথে চলিতে চলিতে বেলা প্রায় ১২৷৷০টায়

কুচামন রাজ্য হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আসিয়া থামিল। অদূরেই একটি নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী। তাহারই পার্শ্বে মা, হরিবাবা প্রভৃতির জন্য একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখানে সকলের জন্যই জল-যোগেরও আয়োজন ছিল।

ঐ স্থান হইতে মা ও শ্রীহরিবাবাকে সুসজ্জিত মোটরে বসাইয়া প্রসেশন করিয়া রাজ্যের ভিতরে নিয়া যাওয়া হয়। সুন্দর সে ব্যাপার! গাড়ীর ভিতরে মা, অবধূতজী এবং হরিবাবা। পরমানন্দ স্বামিজী বসিলেন সম্মুখে। মেয়েদের জন্য এক পৃথক্ গাড়ী দেওয়া হইল। মার গাড়ীর পিছনে রাজা প্রতাপ সিংহ স্বয়ং রাজপোষাকে সজ্জিত হইয়া মাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। আর অপর পার্শ্বে তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটি বহুমূল্য ছাতা মায়ের মাথার উপর ধরিয়া ছিলেন। অপূর্ব বিরাট্ সেই আয়োজন—পূর্ণাঙ্গীন রাজোচিত অভ্যর্থনা।

সেইসব ব্যাপার দেখিয়া পরমানন্দ স্বামী, বুনি প্রভৃতির মণ্ডির কথা মনে পড়িল। যেবার মণ্ডি রাজ্যের মহারাজা মাকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন সেবার সেখানেও তিনি এইরূপ বিরাট্ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাহা হৌক, প্রসেশন চলিয়াছে। কুচামন রাজ্যের ভিতরে সর্বত্র বড় বড় অক্ষরে 'জয় মা' 'জয় মা' লেখা হইয়াছে। কিয়দ্দূর পর পরই পুষ্প-পত্রের তোরণ। মা'র গাড়ী রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করিতেই মা'র সম্মানার্থ ৭টি কামান দাগান হইল। শত শত নরনারী কাতারে কাতারে আসিয়া মা ও মহাত্মাদের উপর পুষ্প-বর্ষণ করিয়া স্বাগত জানাইতে লাগিলেন। সেই প্রসেশন এত দীর্ঘ ও জনতার এত অত্যধিক ভিড় যে, বহু স্বেচ্ছা-সেবক এবং পুলিশের সাহায্য নিয়া পথ পরিষ্কার করাইয়া তবে মোটর চালাইতে হইতেছে। এইরূপ বিরাট অভ্যর্থনা নাকি ইতিপূর্বে সে-রাজ্যে আর কাহারো জন্য হয় নাই। মা'র থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল একটি

কুচামনে মায়ের সাদর অভ্যর্থনা।

প্রকাণ্ড মন্দিরের মধ্যে। প্রেমা (কুচামনের রাণী) তাঁর জন্য সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সেখানে বহু দাস-দাসী উপস্থিত, তথাপি প্রেমাই আপন হাতে সবই করিতেছিল। মা'র জন্য কাজ করিতে পাইয়া সে যেন নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছিল। মা'র যাহাতে কোনভাবে কোন প্রকারের অসুবিধা না হয় সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি।

প্রেমা রাজ্যের রাণী হইলেও তাহার স্বভাবটি খুবই মধুর এবং নিরভিমান। প্রেমার সহিত আমাদের পরিচয় বহু দিনের। তাহার পিতা রহওয়ার রাজা। তিনি এবং প্রেমার মাতা উভয়েই আমাদের পূর্বপরিচিত। তাঁহারা উভয়েই মা'র নিকটে বহুবারই আসিয়াছিলেন।

সংবাদ পাইলাম গত কাল মাকে পাল্কীতে বসাইয়া দুর্গ দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে রাজা প্রতাপ সিংহও ছিলেন। তিনিই মা'কে সেখানে যাবতীয় স্থান ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তিনি এবং রাণী উভয়েই পায়ে হাঁটিয়া মা'র পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানে বহু দ্রষ্টব্য আছে। সমগ্র মহলটি সোনার রং করা, তাহা এত সুন্দর যে মনে হয় যেন দুই-তিন দিন পূর্বেই রং করা হইয়াছে।

কুচামন মা'র জন্য এত বিরাট্ আয়োজন করিয়াছে। তাহাদের একান্ত ইচ্ছা যে মা যেন অন্ততঃ একটি সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া যান। রাজা-রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই একান্ত আগ্রহ। কিন্তু মা'র ত সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়াই যোধপুর চলিয়া যাইবার কথা। শ্রীহরিবাবাজী নাকি পূর্ব হইতেই ২০শে হইতে যোধপুরের প্রোগ্রাম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। মা'র আগমন উপলক্ষে রাজা প্রতাপ সিংহজীর অনুরোধে বৃন্দাবন হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং হৃষীকেশ হইতে শুকদেবানন্দজী প্রভৃতিও ঐখানে আসিয়াছেন। কিন্তু প্রোগ্রাম ত পূর্ব হইতেই স্থির। তবুও কথা হইল যে যোধপুর হইতে ফিরিবার পথে মা এক বেলা কুচামনে থাকিয়া যাইবেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ আবার বুনির পত্র পাইলাম। ১৯শে রাত্রি ৯টায় মা কুচামন হইতে ট্রেনে যোধপুর রওনা হইয়া ২০শে ভোরে সেখানে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীহরিবাবা প্রভৃতিও সেইদিনই মোটরে রওনা হন। কথা ছিল যে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে স্টেশন হইতে মাকে সঙ্গে লইয়া প্রসেশন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। তাঁহাদের পৌঁছিতে দেরী হওয়ায় মাকে স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই প্রায় তিন ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়। পরে মহাত্মারা আসিয়া পৌঁছিলে মা রওনা হ'ন।

যোধপুরে মা।

সেখানে মা'র থাকিবার জন্য যে বাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে সেরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থা না থাকায় পরে একটি স্কুলে মা'র থাকার ব্যবস্থা হয়।

মা'র শরীর নাকি বিশেষ ভাল নয়। দিনে দুইবার করিয়া সৎসঙ্গে যাইতেছেন। অবশিষ্ট সময় মা স্কুলেই থাকেন। বহু স্ত্রী-পুরুষ মা'র দর্শনের জন্য সর্বদাই আসে।

আজ রাত্রিতে আবার মা'র কুচামন রওনা হইবার কথা। পূর্ব-নির্দিষ্ট মত একটি বেলা সেখানে থাকিয়া আগামী কাল রাত্রিতে মা'র বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়ার কথা।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

বৃন্দাবন হইতে পত্র আসিয়াছে। মা পরশু সকালে বৃন্দাবন আশ্রমে ভালমত পৌঁছিয়াছেন। ভরতপুর ষ্টেশনে মথুরার ভার্গবজী মা'র জন্য

গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেখান হইতে মাকে মোটরেই বৃন্দাবন লইয়া আসা হয়।

মা যাইবার সময় ভাইয়াকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে ডাঃ বালিগাকে যেন আমার X-Ray Plate দেখান হয়। সেই অনুসারে ডাঃ বালিগাকে প্লেট দেখান হইয়াছে। তিনি পুনরায় Plate নিবার কথা বলিয়াছেন।

এবার নানাবতীর হাসপাতালের X-Ray মেসিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় স্থানীয় জার্মান ডাক্তারকে দিয়া আমার প্লেট তোলাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তার ক্রোনেনবার্গার একজন বিখ্যাত X-Ray Specialist. ইতিপূর্বেও দুই-তিনবার তিনি X-Ray Plate নিয়াছেন। হাসপাতালে X-Ray তোলার খরচা মাত্র ৪০৲ টাকা কিন্তু জার্মান ডাক্তার প্রতি প্লেটে ১৫০৲ টাকা করিয়া নেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ শিবরাত্রি। বুনির চিঠিতে জানিলাম বৃন্দাবন আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে 'গীতা-ভবন' এবং 'ভাগবত-ভবনের' গৃহপ্রবেশ হইবে।

বৃন্দাবনে গীতা-ভবন এবং ভাগবত-ভবন।

চারখারীর রাজমাতা তাঁহার স্বর্গীয় পতি মহারাজা অরিমর্দন সিংহের পুণ্য-স্মৃতিতে গীতা-ভবন নির্মাণকল্পে ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। আর সেই সঙ্গেই নেপালের রাজপরিবারের কন্যা এবং নেপালের ভূতপূর্ব রাজদূত, ৺রাজা বিজয় সামশের বাহাদুরের স্মৃতিতে শ্রীমদ্‌ভাগবত-ভবন নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনিও এই উদ্দেশ্যে ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-ভবন এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। সম্পূর্ণ হইতে আরো কয়েক সহস্র টাকার প্রয়োজন হইবে।

গত বৎসর শিবরাত্রিতে আশ্রমের শিবমন্দিরে পাঁচটি নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবার সেখানেই শিবরাত্রি মা'র উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হইবে এই সংবাদ পাইয়া মা যেদিন পৌঁছিয়াছেন সেইদিনই বৈকালে নানা স্থান হইতে অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশী হইতে দিদিমা, মৌনীমা, নারায়ণস্বামী, প্রভৃতিও সেইদিনই বৈকালে বৃন্দাবনে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমারও ১লা মার্চ মা'র নিকটে বৃন্দাবন যাওয়ার কথা।

বৃন্দাবনে মা'র উপস্থিতিতে শিবরাত্রি।

১লা মার্চ ১৯৫৭।

আজ আমার বৃন্দাবনে মা'র নিকটে যাওয়ার কথা। আমি যে বৃন্দাবনের এই উৎসবে এবার .যোগ দিতে পারিব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। করুণাময়ী মায়ের অসীম কৃপা আমাদের উপর ত সর্বদাই বর্ষিত হইতেছে।

জার্মান ডাক্তার দ্বারা আমার X-Ray লওয়া হইয়াছে। ডাঃ বালিগা প্রভৃতি Plate পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে এখন আমার আর কোনো রোগ নাই।

এখানে আসিয়াই নানাবতী হাসপাতালে যে Plate লওয়া হইয়াছিল সেই Plate দেখিয়া ডাঃ শেঠ প্রভৃতি সকলেই নাকি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ডাঃ শেঠের সহিত বরোদার Chief Medical Officer ডাঃ শিবমূর্তি এবং আর দুই-তিন জন বড় বড় চিকিৎসক আমার Plate-এ নূতন দাগ দেখিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে হাড়ে অন্য স্থানেও রোগের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। আমার যদিও জ্বর কিংবা অন্য কোন উপসর্গ-ই নাই।

যাহা হৌক, Plate দেখিয়া সকলেই একমত হইয়া স্থির করিলেন যে আমাকে পুনরায় সাত-আট মাস Plaster-এ থাকিতে হইবে।

এদিকে ভাইয়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে বড় সার্জন ডাঃ বালিগাকে দিয়া আমার Plate একবার দেখান হয়। মা-ও বম্বে হইতে যাইবার পূর্বে ঐ কথাই বলিয়াছেন যে দাগ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা গ্যাসের ছায়ার দাগ মাত্র। সুতরাং আবার নূতন করিয়া Plate লওয়া হইল। ডাঃ বালিগাই ঠিক বলিয়াছিলেন, এবার Plate-এ কোন দাগই নাই—একেবারে পরিষ্কার Plate উঠিয়াছে। সুতরাং এবার সকল ডাক্তারই একমত হইয়া বলিলেন যে পূর্বে যেস্থানে রোগ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা এখনো আছে। সুতরাং আরও কিছুদিন Spinal Beltটি ব্যবহার করিবার অভিমত তাঁহারা দিলেন। মায়ের কৃপায় আমি রোগমুক্ত হইলাম।

যাহা হৌক, আজ সন্ধ্যায় Frontier Mail-এ আমি মথুরা রওনা হইলাম। ভাইয়া, লীলা প্রভৃতি আরও অনেকে স্টেশনে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। আমার সঙ্গে মাখন, পারুল, তুলসী ও ঠাকুমা চলিল।

২রা মার্চ ১৯৫৭।

আজ বিকাল প্রায় ৫টায় বৃন্দাবন আশ্রমে মা'র নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। আসিয়া শুনিলাম শিবরাত্রির দিন গীতা-ভবন ও ভাগবত-ভবনের প্রবেশ-উৎসব খুব সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে।

সেদিন খুব ভোরেই মা শ্রীহরিবাবা, অবধূতজী প্রভৃতি মহাত্মাদের সঙ্গে লইয়া নারায়ণশিলা, পূর্ণমঙ্গল ঘট এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা-সহ ঐ দুইটি নবনির্মিত ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দুই স্থানেই বাস্তুপূজা ও হোমের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সেইদিন হইতেই গীতা-ভবনে প্রত্যহ সম্পূর্ণ গীতা পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ভাগবত-ভবনেও অখণ্ডরূপে ভাগবত-পাঠ চলিতেছে। পাঠ করিতেছেন—ব্রহ্মচারী কান্তিভাই, কুসুম, ভরদ্বাজ, শাশ্বতানন্দ স্বামী, শিবানন্দ, পদ্মদত্তজী, যোগেশদা এবং কলিকাতার ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম।

গীতা-ভবন এবং ভাগবত-ভবনের প্রবেশ-উৎসব।

মা একদিন ঘরে বসিয়াছিলেন, তখন মা'র নাকি হঠাৎ খেয়াল হইল যে নূতন ভাগবত-ভবনে অখণ্ড ভাগবত-পাঠ হইতে পারে কিনা। ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম মা'র নিকটেই বসিয়াছিলেন। মা'র মুখ হইতে এই কথা বাহির হওয়া মাত্রই তিনি রাজী হইয়া গেলেন। এইভাবে অখণ্ড পাঠ সুরু হইল।

শিবরাত্রির দিন পূজার সমস্ত আয়োজন মা স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যবস্থা করাইয়াছেন। মন্দিরের মধ্যে পূজা করিল কুসুম, ভরদ্বাজ, কান্তিভাই, হরপ্রসাদ এবং দেরাদূনের পরশুরামজী। আর বাহিরে নাট-মন্দিরে একপাশে পুরুষেরা এবং একপাশে স্ত্রীলোকেরা। সকলেই চার প্রহর পূজা করিয়াছে।

রাত্রি ১২টা পর্যন্ত নূতন ভাগবত-ভবনে রাসলীলা হইল। তাহার পর প্রতি প্রহরে পূজাসমাপ্তির পর নাম চলিতেছিল। মা-ও নাকি প্রায় দুই ঘণ্টা সময় মায়ের অননুকরণীয় সুরে নাম করাইয়াছেন। সমস্ত রাত্রি মা নিজেও মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে খুবই সুন্দরভাবে শিবরাত্রি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আজ তিন দিন ধরিয়া প্রত্যহ সকালে ৮টা হইতে ১১৷৹টা পর্যন্ত

ভাগবত-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা হইতেছে। শ্রীহরিবাবা প্রভৃতি মহাত্মাগণও রোজই আসিতেছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

আজ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ সুরু হইল। ভাগবত-ভবনের মধ্যে ব্যাসাসন খুব সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। সমগ্র আশ্রমটি বহুবিধ রংয়ের পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছে। গৌর-নিতাই মন্দির, শিব-মন্দির, গীতা-ভবন এবং ভাগবত-ভবনের উপরে বিচিত্র বর্ণের সিল্কের পতাকা উড্ডীয়মান। সমস্ত আশ্রমটী ঐ সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

সপ্তাহে মূল পাঠ করিলেন শ্রীনাথ শাস্ত্রিজী। ইতিপূর্বে কাশী আশ্রমে এবং অন্যত্রও ইনি মা'র উপস্থিতিতে ভাগবত সপ্তাহ করিয়াছেন। মূলধারক হইয়াছে ব্রহ্মচারী কান্তিভাই। সেইসঙ্গে আরও ১০৮ জন সমবেতভাবে ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক পাঠককে পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র এবং উত্তরীয়, আসন, পঞ্চপাত্র, মালা ইত্যাদি দেওয়া হইল।

বিকালে ব্যাখ্যাও শ্রীনাথজীই করেন। দুইবেলাই শ্রীহরিবাবাও আসিয়া পাঠের নিকটে বসিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত জগমোহন-মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি বসাইয়া 'রাম অর্চ্চনাও' আরম্ভ হইয়াছে। বৈকালে পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীহরিবাবা তাঁহার ভক্তগণ-সহ এখানে কীর্তন করেন। ভাগবত অনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে করান হইতেছে এবং ইহার সেবায় মহারতন ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছে।

গীতা-ভবনেও পৃথক্‌রূপে আর একটি শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ চলিতেছে। উহা করাইতেছেন ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম মহাশয়। তিনি কেন ইহা করাইতেছেন তাহার কারণ এই ঃ

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, তাঁহার একটি পুত্র কলিকাতার রাজপথের উপর মোটর চাপা পড়িয়া দেহত্যাগ করে। এই ভাগবত সপ্তাহ তাহারই আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে করান হইতেছে। ইহার মূল পাঠক শ্রীনিত্যানন্দ ভট্ট। শ্রোতা নলিনীদা নিজে, জাপক কাশীর বিশু, মহাবীর ত্রিবেদী এবং পাঠকের পুত্র।

গীতাভবনেও অনুরূপ রাম-অর্চা সুরু হইয়াছে। এইভাবে আশ্রমে যুগপৎ অনেকগুলি উৎসব চলিতেছে। তাই সমগ্র আশ্রমটিই কর্ম্মমুখর। মা-ও সর্বত্রই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাশোনা করিতেছেন।

৪ঠা মার্চ ১৯৫৭।

আজ মা'র শরীর অকস্মাৎ যেন বিশেষ খারাপ বোধ হইতেছে। গতকাল ত শরীরের উপর দিয়া অত্যধিক পরিশ্রম গিয়াছে। সুতরাং আজ সকালে আর মা গিয়া ভাগবত-পাঠের ওখানে বসেন নাই। অপরাহ্নে ভাগবত-ব্যাখ্যার সময় শ্রীহরিবাবা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ আসিয়া-ছিলেন; কিন্তু তথাপি মা'র যাওয়া সম্ভব হয় নাই। গলার টনসিল ফুলিয়া কণ্ঠনালী প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গলায় অসহ্য ব্যথা। কিছুই গলা দিয়া নামান সম্ভব হইতেছে না; শরীরে উত্তাপও রহিয়াছে কিছু।

জয়পুর হইতে ওখানকার Director of Health Dr. Sharman আসিয়াছেন। তিনিও মা'র গলা পরীক্ষা করিয়া ভীতির ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন অবিলম্বে Penicillin ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সৎসঙ্গের পর হরিবাবা প্রভৃতি অনেকেই মাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু মা'র কণ্ঠ দিয়া স্বর প্রায় বাহির না হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তাও

বলিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন মা শুইয়াই রহিলেন। পান, আহার সবই সম্পূর্ণ বন্ধ। মা'র শরীরের এই অবস্থাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কি কর্তব্য যেন কেহই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এদিকে মা'র শরীরের উপর কোন ঔষধ বা ইন্‌জেক্‌সন প্রয়োগ চলিবে না। মা নিজেই তুলসীপাতা, নিমপাতা, আদা, কাঁচা হলুদ এবং কয়েকটি লবঙ্গ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে কয়েকবার কুলকুচা করিলেন এবং গলা একটুকরা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। মা'র নিজের খেয়ালে তিনি যত শীঘ্র সুস্থ হইয়া ওঠেন ততই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

রাত্রি ৯টার পর Dr. Sharman পুনরায় দেখিতে আসিলেন। মা'র গলা ভাল করিয়া টর্চ দিয়া দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে প্রায় চমকিয়াই কহিলেন,

মায়ের লীলা বোঝা কঠিন।

—"ক্যা বাত হ্যয়! ইহ তো miracle মালুম পড়তা হ্যয়! সুবহ তো গলা কা হাল দেখ কর ম্যয় ভী ঘবড়া গিয়া থা। লেকিন অব দেখ রহা হু—টনসিল বিলকুল স্বাভাবিক—সুজন ভী নহি হ্যয়। কই ঘন্টেকে অন্দর ইতনা পরিবর্তন ক্যায়সে হো সকতা? মাতাজী কী লীলা মা হী বতা সকতী হ্যয়।"

এই বলিতে বলিতে তিনি মা'র চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমরা উপস্থিত সকলেও বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিলাম। মা'র অসীম অনন্ত লীলার পার কে পাইতে পারে!

৫ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ মা'র শরীরের অবস্থা গতকাল অপেক্ষা অনেকটা ভাল। আজ মা বৈকালে সৎসঙ্গেও উপস্থিত হইলেন। বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত

শ্রীনাথজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাহার পরে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাহারই সারমর্ম সংক্ষেপে বলেন। ডাঃ শর্মা জয়পুর হইতে সপ্তাহে যোগদানের নিমিত্তই আসিয়াছেন। মা আজ তাঁহাকে একটি তুলসীর মালা দিয়া বলিলেন,—"পিতাজী, মালা জপ করকে ইসকো (নিজের শরীরকে দেখাইয়া) লে লো।" এইরূপ কথা ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো মা'র মুখে শুনি নাই। মা কখন কি উদ্দেশ্যে কাহাকে কি বলেন তাহা আমাদের এই সামান্য বুদ্ধির অগোচর।

৬ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ প্রত্যুষেই মা উঠিয়া শয্যার উপরেই বসিয়া আছেন। ভক্তেরা আসিয়া কেহ কেহ আরতি করিতেছেন। মা-ও তাঁহাদিগের গলায় মালা দিয়া দিতেছেন। মা'র হাত হইতে প্রসাদী মালা পাইয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। আমি মা'র আদেশে, একপার্শ্বে থাকিয়া সকলকে মিষ্টি প্রসাদ দিতেছি।

বৃন্দাবনের যোগেনদাও ঐ সময় দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। মা তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতেই মা আমাকে বলিলেন,—

যোগেনদার ভাগ্য।

"দিদি, বাবার হাত ভরে দেও।" আমি তাঁহার দুই হাত ভরিয়া মিষ্টি দিলাম। তাঁহার দুই হাতে আর ধরিতেছে না, তবু তিনি বলিলেন,—"আউর দিজিয়ে।" মা হঠাৎ তাঁহাকে সম্মুখে ডাকিয়া তাঁহার দুই হাতের ওপর নিজের হাতখানি রাখিয়া বলিলেন,—"নেও বাবা, আমাকে নেও।" এই বলিয়া মা নিজেই খুব হাসিতে লাগিলেন, আমরা সকলে যোগেনদার ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না।

৯ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী শরণানন্দজী প্রভৃতি ৩০জন মহাত্মাকে মাল্য-চন্দন ও বস্ত্র দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করান হইল। মা-ও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

১০ই মার্চ ১৯৫৭।

ভাগবত-সপ্তাহ আজ সমাপ্ত হইল। বৈকালে ব্যাখ্যা সমাপ্তির পর উপস্থিত সকলে পাঠককে ভেট দিলেন। সর্বপ্রথমে মহারতন একখানি থালায় শীতবস্ত্র, রেশমী ধুতি-চাদর, ফল, স্বর্ণাঙ্গুরীয় এবং নগদ ১৫১৲ টাকা ভেট চড়াইল। আশ্রমের পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারী ভরদ্বাজ ফল ও নগদ ২৫৲ টাকা দিয়া আসিল। অন্যান্য উপস্থিত রাজরাণীগণ সকলেই আপন আপন ভক্তি অনুসারে শ্রীলালজীকে ভেট দিলেন। পরে শুনিলাম যে পাঠক সর্বসমেত নগদ টাকা প্রায় ১৩০০৲ পাইয়াছেন এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও প্রায় ৭০০/৮০০৲ টাকার হইবে।

গীতা-ভবনে নলিনীদার যে ভাগবত-সপ্তাহ হইতেছিল, তাহারও আজ পরিসমাপ্তি হইল। সেখানেও ভেট চড়াইবার পর পণ্ডিতজী নগদ প্রায় ২০০৲ টাকা এবং বস্ত্রাদিও পাইলেন।

১১ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহের সমাপ্তি উপলক্ষে যজ্ঞ হইয়া পূর্ণাহুতি হইয়া গেল। পূর্ণাহুতির সময় মা-ও উপস্থিত ছিলেন। ১০৮ জন পাঠক

প্রত্যেককে ২৯৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা, নিরীক্ষকদের ৩১৲ টাকা এবং আচার্যকে ৫১৲ টাকা দেওয়া হইল। ব্রতীদের সকলকেও সমাদরে ভোজন করাইয়া ২৲ টাকা হিসাবে দক্ষিণা দেওয়া হইল। ঐ সঙ্গে শ্রীহরিবাবার আশ্রমের ১৬ জন সাধু-ব্রহ্মচারীকেও আশ্রমে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে বস্ত্র দেওয়া হইল। সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, এইরূপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে এবং এইরূপ রাজসিকভাবে এই-সব অনুষ্ঠান আজ-কাল আর দেখা যায় না।

১২ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ তিনদিন হয় বৃন্দাবনধামের বিভিন্ন মন্দিরের গোস্বামিগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বক্তাগণ ভাগবৎ-ভবনে ভাগবত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীও ভাষণ দিলেন। সকল বক্তাদের রেশমী নামাবলী, ফল ও মিষ্টি দিয়া বিদায় দেওয়া হইল।

নিম্বার্ক আশ্রমের মোহান্ত প্রেমদাসজী, কাঠিয়াবাবার নূতন আশ্রমের মোহান্ত শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজী, মথুরার ভার্গবজীর গুরুদেব শ্রীকিশোরীলাল দাসজী, শ্রীচক্রপাণিজী প্রভৃতি কয়েকজনকে আজ আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান হইল এবং বস্ত্রও দেওয়া হইল। বৈকালে ভাগবত-ভবনে শ্রীহরিবাবা এবং মা'র উপস্থিতিতে ভক্তলীলা অভিনীত হইল। সকলেই লীলা দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলেন।

১৩ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ সকালে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী 'ভক্ত মহারাজ'

মা'র দর্শনের জন্য আসিলেন। তাঁহার সহিত মা'র বেশ কিছু সময় কথা-বার্তা হইল। যাইবার সময় তিনি মাকে মাটীতে প্রণাম করিয়া উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এবার ইনি মাতৃস্বরূপ ধারণ করে এসেছেন। এঁর মধ্যেই সকলে আপন আপন ইষ্টকে দর্শন করুন। মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ পাতান না,—জন্ম-জন্মান্তরের নিত্য সম্বন্ধ।"

ভক্ত মহারাজের মায়ের সম্বন্ধে উক্তি।

কুচামনের রাজা প্রতাপ সিংজী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে পরে দেখা করিতে গেলেন। তাঁহাদেরও সকলকে তিনি বলিলেন,—"মা'র কাছে শিশু হইয়া থাক, তিনিই সকলকে পার করিয়া দিবেন।"

ভক্তরাজজী এখানে কোনও ধর্মাশালায় উঠিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি পুনরায় অপর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে ভক্তলীলা দেখিতে আসিলেন। মহারাজের স্বভাবটী সত্যই খুব মধুর। মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তিও অনন্যসাধারণ।

শ্রীকিশোরীলাল দাস বাবাজীর শিষ্যা শ্রীমতী কস্তুরী দেবী আজ মাতৃ-দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে মা'র দর্শন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনিলাম।

একদিন রাত্রিতে তিনি খুব কাঁদিতে ছিলেন। তাঁহার দুঃখ প্রভুর কৃপা কিভাবে হইবে। সাধন-ভজন কিছুই হইতেছে না। পরে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে একটী শুভ্র বস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে গৈরিক বস্ত্র-পরিহিতা একটী কন্যা। সেই কন্যাটী তাহার হাত ধরিয়া বলিতেছে,—"তুমি কাঁদিতেছ কেন? এখানেই তোমার প্রভু আছেন। তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।"

একটী বিচিত্র ঘটনা।

এই স্বপ্ন পর পর দুইদিন সেই ভদ্রমহিলা দেখেন। তাহার পরে আজ দিন-কয়েক পূর্ব্বে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে বৃন্দাবনধামে মাতা আনন্দময়ী

নামে একজন দেবী আসিয়াছেন। তাই তিনি মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি যখন মা'র নিকট আসেন, সেই সময় উদাস বসিয়াছিল মায়ের নিকটেই। উদাসকে দেখিয়াই তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এই গৈরিক বস্ত্র-পরিহিতা মেয়েটিকেই ত তিনি পর পর দুই দিন স্বপ্নে দেখিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই তিনি মা'র দিকে খুব ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়াই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার স্বপ্নে দেখা সেই শ্বেত বস্ত্র-পরিহিতা মূর্তির সহিত ইঁহার হুবহু মিল রহিয়াছে। ইঁনিই তিনি। সব দেখিয়া তিনি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ইহার পর হইতেই ভদ্রমহিলার মা'র উপর অস্বাভাবিক আকর্ষণ হইয়াছে। অবশ্য হওয়াও ত স্বাভাবিকই। তখন হইতে তিনি যখনই সময় পান তখনই মা'র কাছে কাছে থাকিতে চেষ্টা করেন এবং খুব জপ করেন। জপ করিতে করিতে একদিন তিনি মাকে চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিতে দেখিতে পাইয়াছেন। আর একদিন মাকে শ্রীমূর্তিতেও দেখিয়াছেন। এইরূপ দর্শনের পূর্বে নাকি তাঁহার নিকট গোলাপ ও কস্তুরীর গন্ধ ভাসিয়া আসে। এইরূপ অনেক কথাই তিনি বলিলেন।

রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়াছে। মা'র ঘরে সামান্য কয়েকজন লোক আছে। মা অল্প অল্প কথা বলিতেছেন। এমন সময় নারায়ণ স্বামী ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "দিদি, একটা খবর শুনুন। সময়মত মাকেও একটু বলবেন।"

আমি বলিলাম,—"কেন? আপনিই বলুন না? মা ত বসেই আছেন"।

মা আমার এই কথা শুনিয়া নারায়ণ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "কি কথা? নারায়ণ!"

নারায়ণ স্বামিজী তখন মাকে বলিলেন,—"মা, আজ বিশু গোবিন্দ মন্দিরে গিয়া সেখান হইতে তুলসীর কণ্ঠী গলায় দিয়া আসিয়াছে। আজ সমস্ত দিন কিছু খায়ও নাই। খুব জপ করিয়াছে দেখিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া মা কুসুমকে বলিলেন,—"বিশুকে ডাক ত।"

কুসুম গিয়া বিশুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বিশু বলিল যে, প্রতি বৎসরই গোবিন্দ-দ্বাদশীর দিন যেখানেই থাকুক না কেন সে কোনও না কোন গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়া গোবিন্দ দর্শন করিয়া থাকে। এবার সে বৃন্দাবনধামে আছে, সেইজন্য আজ গোবিন্দ-জীউর মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিল।

মন্দিরে প্রণাম করিয়া যেই উঠিয়াছে এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাহার গলায় একটি কণ্ঠী বাঁধিয়া দিল। বিশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কী!" সে জবাব দিল,—"বাবা, মালাটি ধারণ কর না"। বিশু তখন বলিল,—"হাঁ, ধারণ করিতে পারি, কিন্তু ছিঁড়িয়া গেলে আর নিজে গাঁথিয়া গলায় দিব না।" তাহাতেই সেই লোকটি স্বীকৃত হইয়াছে।

এই ঘটনা শুনিয়া বাজিতপুরের একটি পুরানো ঘটনা মা'র খেয়ালে আসিল। মা বলিলেন,—বাজিতপুরে যখন এই শরীরটা ছিল, তখন ভোলানাথের quarter এর কাছে একজন জজ থাকিত। রেবতীবাবু তাঁর নাম। তাঁর ওখানে খুব হরেকৃষ্ণ নাম হত। বেশ জমজমে কীর্তন হত। এই বাড়ী থেকে সে কীর্তন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যেত। আর ঐ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরটা কেমন যেন এলাইয়া পড়িত। শরীরের এইরূপ অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে রেবতীবাবু নাকি ভোলানাথকে বলেছিলেন যে এই শরীরটার গলায় তুলসী-কণ্ঠী ধারণ করাতে। ভোলানাথ আমাকে এসে এই কথা বলল। আমি তাকে বলেছিলাম,—"তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর কোন্ কণ্ঠী ধারণ করতে হবে? অন্তরকণ্ঠী না বহির্কণ্ঠী?" এই কথা শুনতে পেয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন যে আর কণ্ঠী নেবার প্রয়োজন নেই।

বাজিতপুরের একটি পুরানো ঘটনা।

১৫ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ শ্রীহরিবাবার জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে আমাদের আশ্রমেও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সমগ্র বিশেষ আশ্রমটি পতাকা, মালা, আম-পাতার বন্ধনবারে সুশোভিত করা হইয়াছে। অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে আলপনার শোভা। সব মিলিয়া সমগ্র আশ্রমটীর শ্রী অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

হরিবাবার জন্ম-তিথিতে আশ্রমে তাঁহার সাদর সম্বর্ধনা।

বৈকাল ৩টা হইতেই ভাগবত-ভবনে ভক্তলীলা চলিতেছে। লোক-সমাগমও হইয়াছে বহু।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে হরিবাবার আসার কথা। সেইজন্য আশ্রমবাসীরা কীর্তনের বাদ্য-যন্ত্রাদি লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাণ্ডপার্টি আরও কিছুদূরে জয়পুর-মন্দিরের দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। ঠিক ৬টার সময় শ্রীহরিবাবা বাদ্যভাণ্ড-সহকারে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই মূর্তিসহ আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ করিল। কীর্তন আরম্ভ হইল। অপূর্ব বিরাট্ শোভাযাত্রা। প্রায় পাঁচ শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ শ্রীহরিবাবাকে আশ্রমের মূল ফটকের নিকটে নিয়া আসিল। সেখানে মা উপস্থিত ছিলেন। হরিবাবা আসিতেই মা স্বয়ং তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া আশ্রমের ভিতরে লইয়া আসিলেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ব্যাণ্ডপার্টি। তাহার পশ্চাতে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের মূর্তি। তাহার অব্যবহিত পরেই মা ও শ্রীহরিবাবা আসিলেন।

সর্বপ্রথম আশ্রম-মন্দিরে ঢুকিয়াই মা হরিবাবাকে শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে লইয়া গেলেন। হরিবাবাজী শ্রীবিগ্রহদ্বয়কে ফুলের এবং জরির মালা পরাইয়া দিলেন এবং নানা প্রকার ফল ও মিষ্টি ভোগ দিলেন। সেস্থানে একটু সময় কীর্তন করিয়া তিনি রাম-অর্চার স্থানে আসিলেন।

হলের দক্ষিণ দিকে আসন পাতিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ছবি সাজাইয়া রাম-অর্চার আয়োজন হইয়াছে। হরিবাবাজী সেখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণ-সহ রামনাম কীর্তন করিলেন।

একটু পরে আমি গিয়া হরিবাবাজীর গলায় জরি ও ফুলের মালা পরাইয়া দিলাম এবং তাঁহাকে একটি আলখাল্লা, চাদর এবং পাগড়ী দিয়া প্রণাম করিলাম। ইহার পরে এক এক করিয়া অনেকেই ভেট চড়াইলেন। বাবাজীর ভক্তশিষ্যগণ নানাভাবে তাঁহার 'বাধাই' গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত সাধু মহাত্মাদের রুমালে বাঁধিয়া মিষ্টি ও ফল দেওয়া হইল। সেইসঙ্গে অন্যান্য সকলকেও প্রসাদ দেওয়া হইল। সভা ভঙ্গ হইতে প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল।

সাড়ে-নয়টার পরে হলঘরেই টিহরীর মহারাজা মা'র জয়ন্তী উৎসবের সময় যে ফিল্ম লওয়া হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন। সব শেষ হইতে প্রায় রাত্রি ১১॥০টা বাজিয়া গেল। মা রাত্রিতে ভাগবত-ভবনেই শয়ন করিলেন।

১৬ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ দোলপূর্ণিমা। সকাল ৮টার মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী শরণানন্দজী প্রভৃতির উপস্থিতিতে চারখারির রাজমাতা তাঁহার স্বর্গীয় পতির ফটো-সহ নারায়ণশিলা ও গীতা লইয়া নবনির্মিত গীতা-ভবনে প্রবেশ করিলেন। মা ত সঙ্গেই ছিলেন। অপরদিকে রাণী সরলাদেবীও মাকে পুরোভাগে রাখিয়া তাঁহার ৺পতির ফটো এবং ভাগবত-সহ ভাগবত-ভবনে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণশিলাও সঙ্গে ছিল।

উভয় ভবনেই তাঁহাদের স্ব স্ব পতির ফটোও স্থাপন করা হইল। ভাগবত এবং গীতার ষোড়শোপচারে পূজা হইল। ভাগবত-ভবনে ইতি-পূর্বে ১০৮ ভাগবত-পাঠ হইয়া গিয়াছে। তাই আজ গীতা-ভবনেও ১০৮ গীতা-পাঠ সমবেতভাবে হইল।

সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড নাম-কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। অপরাহ্ণে মা নিজেও সকলের সঙ্গে মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিলেন। আজ দোলপূর্ণিমার শুভ দিনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সম্মুখে মাকে লইয়া কীর্তন করিতে ভক্তবৃন্দের মনে যে কী অসীম আনন্দ হইল, তাহা কে বর্ণনা করিবে।

হোলির উৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া মহীশূরের মহারাণী, সপরিবারে টিহরীর মহারাজা, লম্বাগ্রামের রাজ-পরিবার, রহুওয়ার রাজা এবং রাণী, আচরোলের রাজা ও রাণী, শেরকোটের রাণী সাহেবা, সপরিবারে অম্বের রাজা সাহেব, নিমখেজের রাজা ও রাণী, বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি কে শাহ, আহমদাবাদ হইতে মুকুন্দ ভাই প্রভৃতি অনেকেই আছেন। কুচামনের রাজা ও রাণী তো এখানে পূর্ব হইতেই আছেন। এই উপলক্ষে আজ রাত্রে স্থানীয় চারিটি রাসমণ্ডলী একত্র হইয়া মহারাস করিবে এইরূপ কথা হইতেছে। আগামীকালই মা'র এখান হইতে মোদীনগর চলিয়া যাইবার কথা। আমিও অন্যান্য অনেককে লইয়া দেরাদুন চলিয়া যাইব। ভাঙ্গিয়া যাইবে এই আনন্দমেলা।

১৭ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ সকাল হইতেই বৃন্দাবনের আনন্দ-হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিদিমা প্রভৃতি অনেকে তুফান মেলে কাশী চলিয়া গেলেন। আগত

ভক্তগণও আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। বিকাল ৩টায় মা শ্রীযুক্ত বর্মণের গাড়ীতে মোদীনগর রওনা হইলেন। ভরা উৎসবের স্মৃতি-সুধার পাত্রখান লইয়া আমিও দেরাদুনের পথে রওনা হইলাম।

মা শ্রীযুক্ত বর্মণের গাড়ীতে রওনা হইলেন। আমিও সেই গাড়ীতেই পরমানন্দ স্বামী, ভাইয়া এবং বুনিকে লইয়া চলিলাম। শ্রীযুক্ত বর্মণ Central Public Service Commissionএর সভ্য। দিল্লীতেই বর্তমানে থাকেন।

আমি মা'র মোটরেই দিল্লী পর্যন্ত যাইব। সেখান হইতে আজ রাত্রির গাড়ীতেই দেরাদুন চলিয়া যাইব। তাই মা আমাকে দিল্লী স্টেশনে নামাইয়া দিয়া সোজা মোদীনগর চলিয়া যাইবেন।

সন্ধ্যা প্রায় ৬টায় আমরা দিল্লী স্টেশনে পৌঁছিলাম। স্টেশনে বহু ভক্ত মা'র দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে নামাইয়া দিয়া মা মোদীনগর চলিয়া গেলেন। রাত্রির গাড়ীতে আমিও দেরাদুন চলিলাম।

১৮ই মার্চ ১৯৫৭।

আজ সকাল প্রায় ৮টার সময় দেরাদুন পৌঁছিলাম।

মোদীনগরে মা'র প্রায় ৬।৭ দিন থাকিবার কথা। অবধূতজী পূর্বেই সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। হরিবাবাজীও গতকাল মা'র সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়াছেন। সেখানে নাকি বিরাট এক সৎসঙ্গের আয়োজন হইয়াছে। বৃন্দাবন হইতে রাসপার্টি-ও আনান হইয়াছে।

মোদীনগরে মা।

মোদী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আজকাল ভারতের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাটানগরের ন্যায় মোদীনগর-ও একটী বিশিষ্ট জনপদে পরিণত

হইয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ডিরেক্টর শ্রীগুলজারমল মোদী অবধূতজীর বিশেষ ভক্ত। তাঁহার ব্যবস্থাতেই এই-সব আয়োজন হইয়াছে।

২০শে মার্চ ১৯৫৭।

বুনির পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। সেদিন প্রায় সন্ধ্যা ৭॥টায় মা গিয়া মোদীনগরে পৌঁছিয়াছেন। হরিবাবাজীর গাড়ী-ও সঙ্গেসঙ্গেই ছিল। অভ্যর্থনার জন্য নাকি বহু ব্যাণ্ডপার্টি-সহ বিরাট্ ব্যবস্থা ছিল। ওখানকার Summer House-এ মা'র থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইতলা বাড়ী Summer House—একেবারে নূতন। Electric এখনো সব লাগান হয় নাই। বর্মাজী ও ভাই সেই রাত্রিতেই আহারের পর দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছেন।

১৮ই প্রাতঃকাল হইতে অখণ্ড কীর্তন সুরু হইয়াছে। সপ্তাহব্যাপী অখণ্ড-ভাবে চলিবে। রাস-ও নিয়মিত সকালে হইতেছে। দিল্লী হইতে টেহরীর মহারাজা-মহারাণী এবং আরও অনেকে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। ভাইয়াও দিল্লী হইতে যাওয়া-আসা করিতেছেন।

মা'র শরীরটা নাকি ভাল নাই। যে ঘরে মা আছেন সেটি একেবারে নূতন ঘর বলিয়া খুবই ঠাণ্ডা। মা'র শরীরে নাকি বেশ ব্যথাও হইয়াছে। তা'ছাড়া কপালেও একটা ব্যথা আছে। শুধু দুধ-রুটি খাইতেছেন। বৃন্দাবনের প্রায় সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ উৎসবের পরেই আবার মোদীনগর গিয়াছেন। সেখানেও ত বিরাট্ উৎসব ও জনতার ভীড়। সুতরাং মা'র বিশ্রাম একটুও হইতেছে না। তবুও মা যথারীতি নিয়মিত সৎসঙ্গে যোগদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মোদী সস্ত্রীক মার বিশেষ খোঁজ-খবর লইতেছেন। অতি সুন্দর সেবার ভাব তাঁহাদের। মা'র সঙ্গে এই নূতন পরিচয়।

২২শে মার্চ ১৯৫৭।

আজ পত্রে জানিলাম ওখানে খুব বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। মা'র শরীরটাও তাই মোটেই ভাল যাইতেছে না। অখণ্ড কীর্তন যে প্যাণ্ডেলে হইতেছিল তাহা ভিজিয়া যাওয়ায় মা'র ঘরটিতে কীর্তন লইয়া আসা হইয়াছে। মা'কে পাশের একটি ছোট ঘরে নেওয়া হইয়াছে। হরিবাবাজী এই বাড়ীতেই উপর তলায় আছেন।

দিল্লীর পার্টির ওখানে যাইয়া রবিবার কীর্তনে যোগ দিবার কথা। স্থানটি যদিও খুবই একান্ত, শহর হইতে দূরে, তবুও মা'র আগমনে বহু লোকই যাওয়া-আসা করিতেছে। ঐ স্থানেই ত এই উৎসব প্রায় ২৫০/৩০০ লোক রহিয়াছে। এই সব প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও, ঐ অসুস্থ শরীর লইয়া মা কিভাবে সমস্ত ব্যবহার ঠিক ঠিকমত করিয়া যাইতেছেন, আমাদের বুদ্ধিতে তাহা বোঝা অসাধ্য।

প্রচণ্ড বৃষ্টি চলিতেছে। সৎসঙ্গের প্যাণ্ডেল ত পড়িয়া যাইবার উপক্রম। মা মোদীকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, শহরে কোনও বড় হ'লে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তিনি বেশ নিরাশভাবে মাকে বলিয়াছেন,—"ভগবানের মায়া বোঝা দায়।" এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্যোগ ও বৃষ্টিতে সমস্তই ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

গুরজারমলজী মা'র নিকটে তাঁহার আপন অতীত জীবনের কাহিনী বলিয়াছেন। কিভাবে তিনি প্রথমে ঐ অঞ্চলে যান, কিভাবে এই বিরাট্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তাঁহার বাল্যাবস্থায় কেন তিনি একবার সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—এই জাতীয় নানা কথা শিশুর মত সরলভাবে মা'র নিকট তিনি বলিয়াছেন। প্রতি বৎসর মা'র উপস্থিতিতে যাহাতে এইরূপ উৎসব হয় সেজন্য তিনি মা'র নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছেন।

২৫শে মার্চ ১৯৫৭।

আজ পরমানন্দ স্বামীর পত্র আসিয়াছে। মা'র শরীর এখনো ভাল না। বুকে সর্দি ও কফ বসিয়া গিয়াছে। আহার নাম-মাত্র চলিতেছে। খান সামান্য দুধ-রুটি, কিংবা ওট্ কিংবা কখনো একটু খিচুড়ি।

গত ২২শে সকালে মাকে প্রথমে মোদীর বাড়ী হইতে সহরের এক স্কুলে আনা হইয়াছে। মোদীর বাড়ীতে সকলে মিলিয়া মা'র আরতি ও কীর্তন করিয়াছে। গুলজারমলজী ও তাঁহার স্ত্রী মা'র সঙ্গেই মোটরে ছিলেন। তাঁহারা মাকে পথের উভয় পার্শ্বে সব দেখাইয়া দেখাইয়া যাইতেছিলেন। সহরে, বাজারের মধ্যে একটী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাও মাকে দেখান হইল।

সহরে মেয়েদের স্কুলে মা গিয়া পৌঁছিতেই, স্কুলের ছাত্রী-শিক্ষিকাগণ মাকে Guard of Honour দিয়া অভ্যর্থনা করিল। মা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে পাঁচটি অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিলেন। মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে ঐ অনুরোধ কয়টী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মা স্কুলে গিয়াছেন, সেই উপলক্ষে স্কুলের একদিন ছুটি দিবার প্রস্তাব হইল। সেই দিন সমস্ত স্কুলের ছাত্রীগণ রামলীলা দেখিতে আসিবে।

সেখান হইতে মাকে ছেলেদের College-এ নিয়া যাওয়া হয়। সেই College-এর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেনবাবু মা'র পূর্বপরিচিত। তিনিই সর্বপ্রথম মাকে দেরাদুনের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন, সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা। উপেনবাবু মা'র উপস্থিতিতে ছেলেদের নিকট একটু বক্তৃতাও দিলেন। ঐ স্কুল-কলেজ সবই মোদী-পরিবারের দ্বারাই সংস্থাপিত।

গুরজারমলজীর স্ত্রী দয়াবতী মোদীও বিশেষ স্বনামধন্যা। তিনি নিজেও অনেকগুলি সমাজ-হিতকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

মোদীরা বিরাট্ পরিবার। সকল ভাই এবং স্ত্রীরা মা'র নিকটে খুব

আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহারা সকলে মাকে পাইয়া যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এক এক করিয়া সকলেই মা'র সঙ্গে একান্তে আসিয়া নানা কথাবার্তা বলিয়া যান।

গতকাল অখণ্ড কীর্তন সমাপ্তির দিন ছিল। দিল্লী হইতে অনেকেই আসিয়া কীর্তনে যোগ দিয়াছে। শেষ দিনের উৎসব, এবং সেদিন রবিবার থাকায় সকালে রামলীলা দেখিতে প্রায় ১০।১২ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। কীর্তনে মা-ও কিছুক্ষণ হাত উপরে তুলিয়া সকলের সহিত কীর্তনে যোগ দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লী-মিরাট হইতে সর্বদাই বহু লোক আসা-যাওয়া করিতেছে। আগা সাহেব (বর্তমানে উত্তর রেলের Chief Security Officer) শ্রীবর্মণ, টিহরীর মহারাজা-মহারাণী প্রভৃতি অনেকেই মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছে। সোপোরী ভাই বর্তমানে সরকারী কাজে দিল্লী আছেন। তিনিও সস্ত্রীক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। এই স্থান হইতে আজই ভোরবেলা মা'র হাপুড় চলিয়া যাইবার কথা।

২৬শে মার্চ ১৯৫৭।

হাপুড়ে মা।

আজ সংবাদ পাইলাম, গতকালই মা মোটরে হাপুড় রওনা হইয়া গিয়াছেন। সেখানে মোদীর এক ভাই আছেন। তিনিই উৎসবের আয়োজন করিয়া মা, হরিবাবাজী প্রভৃতিকে লইয়া গিয়াছেন। একটী পাঠশালায় মা'র থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দয়াবতী মোদীও মা'র সঙ্গেই সেখানে গিয়াছেন।

কথা হইয়াছে, আজ অতি প্রত্যুষেই মা মোটরে দিল্লী আসিয়া দিল্লী মেলে বিন্ধ্যাচল রওনা হইবেন।

২৯শে মার্চ ১৯৫৭।

হাপুড় হইতে দিল্লী হইয়া মা'র বিন্ধ্যাচল আগমন।

আজ দুই দিন পরে পুনরায় মা'র সংবাদ পাওয়া গেল যে, মা ২৬শে রাত্রি প্রায় ১১টায় ভালমত বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন। সেদিন দিল্লী স্টেশনে বহু লোক মা'র দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পথে টুণ্ডলা, এটোয়া, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্টেশনেও বহু লোক আসিয়াছিল। মির্জাপুর স্টেশন হইতে মা তারাপদবাবুর গাড়ীতেই বিন্ধ্যাচল পৌঁছিয়াছেন।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বে কাশীতে ভাইয়ার Insurance কোম্পানীতে কাজ করিতেন। বর্তমানে মির্জাপুরে সরকারী Insurance-এর কাজে আছেন।

বিন্ধ্যাচলে মা'র সঙ্গে মাত্র স্বামী পরমানন্দ, কুসুম, প্রিয়রঞ্জন এবং রেণু সর্বাধিকারী আছেন। বুনি, উদাসকেও মা কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মোদীনগরের উৎসবের পরে ওখানে গিয়া মা'র যদি একটু বিশ্রাম হয়। কুসুমও লিখিয়াছে যে, বহুদিন পর্যন্ত মা'র শুইবার ভাবই নাই। আর সময়ের অভাব ত আছেই। বিন্ধ্যাচলে আসিয়া মা আপন খেয়ালমত উঠিতেছেন। তাই মা'র চেহারাটা কিছু ভাল দেখা যাইতেছে। বিন্ধ্যাচল আশ্রমটীও এখন একেবারেই খালি। লোকজন একেবারেই নাই।

পরশুদিন ওখানে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী এক মাদ্রাজী পরিবার মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারের সকলের ছবি মাকে দেখাইয়াছেন এবং মা'র সঙ্গে নিজেদের ছবিও নিয়া গিয়াছেন।

৩০শে মার্চ ১৯৫৭।

স্বামিজীর পত্রে জানিলাম মা নাকি আমাদের দেরাদুন (রাজপুরের)

আশ্রম পরিষ্কার করাইবার কথা লিখাইয়াছেন। ওখানে নাকি কাহারা আসিবে।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ সংবাদ পাইলাম, মা নাকি গত ১লা তারিখেই বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলে মা'র শরীর বেশ ভালই ছিল, কিন্তু কাশীতে আসিয়া আবার গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রিতে শুইবার ভাব নাই। বৃন্দাবনের মত টনসিলের ব্যথা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কানের শব্দও বেশী, সঙ্গেসঙ্গেই হার্টের palpitationও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

কাশীতে মা।

মা নূতন বাড়ীর 'অবধূত কুটিরে'ই আছেন। সেখানে মেয়েরা যাইতে পারে না। একমাত্র গোপালের মাকে মা সঙ্গে রাখিয়াছেন। সে ছাড়া কুসুম ও পরমানন্দ স্বামী সঙ্গে আছেন।

আগামী ৬ই ঐ আশ্রমে বাসন্তী-পূজা আরম্ভ হইবে। এবার অষ্টমী এবং নবমী পূজা এক দিনেই। মা'র নবমীর দিনই সকালে কাশী হইতে বারাবঙ্কী হইয়া এখানে আসার কথা। সুতরাং আমরা সকলে আশা করিতেছি মা ১০ই সকালে দেরাদুনে আসিয়া পৌঁছিবেন।

৬ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ এক পত্রে জানিলাম, মা'র শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল। মা'র সঙ্গে এবার এখানে বহু লোকের আসিবার কথা। কাশী হইতে যাহারা এবার আহমদাবাদে জন্মোৎসবে যাইবে তাহারা অনেকেই এইসঙ্গে এখানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই মাসের শেষ দিকেই মা'র ও আমাদের সকলের আহমদাবাদ রওনা হইবার কথা।

আহমদাবাদে জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় ৪।৫ শত ভক্ত উপস্থিত হইবেন, স্বামিজীর এই অনুমান। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন যেন সেখানে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করার জন্য দুই-তিনজন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী পাঠান হয়। ইতিমধ্যে স্বামিজী মুকুন্দ ভাইকে দিয়া ওখানকার স্থানীয় কলেজের হস্টেল ভিন্ন আরও ৪।৫টি বাড়ী বহিরাগতদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিবার চেষ্টা করাইতেছেন।

মা'র কাশী হইতে ৮ই সকালে বরাবঙ্কী যাওয়ার কথা। সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া, পরদিন লক্ষ্ণৌ থাকিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে দেরাদুন রওনা হইবার কথা।

দিল্লী হইতে শ্রীযুক্ত অমল সেন গত পরশু নাকি কাশী গিয়া পৌঁছিয়াছেন। কাশীতে থাকা-কালীন তিনি একবার পায়ে চোট পাইয়াছিলেন। সেজন্য মা'র নির্দেশে দিল্লীতে চিকিৎসার জন্য নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। নূতন আশ্রমে নীচের ঘরে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাশী আশ্রমের ঘাটের কাজও চলিতেছে। চুনার হইতে শত শত নৌকায় বড় বড় পাথর আনিয়া ঘাটের সম্মুখে ফেলা হইতেছে। পাথর দিয়া সম্পূর্ণ ঘাটটি নাকি ঢাল করিয়া বাঁধাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বর্ষারম্ভের পূর্বেই কাজ শেষ করার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৮ই এপ্রিল ১৯৫৭।

কাশী হইতে বরাবঙ্কী ও লক্ষ্ণৌ হইয়া মা'র দেরাদুন আগমন।

কাশীর পত্র পাইলাম। মা'র শরীর অনেকটা ভাল। গলার বেদনা আর নাই। মাথার শব্দও পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। দুই-তিনদিন যাবৎ একটু একটু শোওয়া-ও হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ-ই সন্ধ্যায় মায়ের নিকটে আসেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রকার কথাবার্তা হয়।

গত পরশু আশ্রমে বাসন্তী-পূজার জন্য বাসন্তীদেবীর মূর্তি আসিয়াছে। যথারীতি চণ্ডীমণ্ডপে পূজা আরম্ভ হইয়াছে। মা এবার উপস্থিত আছেন, সেজন্য সকলেরই বিশেষ আনন্দ। কাশীর Magistrate, Senior Supdt. of Police প্রভৃতিও মা'র দর্শন করিয়া প্রসাদ লইয়া গিয়াছেন। বর্মণজীও একবেলার জন্য মা'র দর্শন করিয়া গিয়াছেন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রভানজী মা'র দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। মা'র সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের উপমন্ত্রী রাওয়ৎ সাহেবও মা'র সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মা'কে বরাবঙ্কী পর্যন্ত আপন মোটরে লইয়া যান; কিন্তু মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল নহে, তদুপরি দুই স্থানের দূরত্বও অনেক, সুতরাং স্বামিজী ট্রেনে যাইবার কথাই স্থির করিলেন। তবে তিনি বলিলেন যে, তিনি ৯ই বৈকালে মাকে তাঁহার মোটরে বরাবঙ্কী হইতে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইবেন। তাহাই স্থির হইল। লক্ষ্ণৌতে তাঁহার বাসায় মা'র ঘণ্টা-কয়েক বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইবে; পরে সেখান হইতে মা দেরাদুন রওনা হইবেন।

মাকে কে একজন একটি বিরাট্ কদমা দিয়াছিল। সেইটি একদিন মা সৎসঙ্গে বসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহা লইয়া সেদিন সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল।

১০ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ মা সকাল ৯॥০টায় দেরাদুন পৌঁছিলেন। দেরাদুনে মা প্রথমে কল্যাণবনে সোজা চলিয়া গেলেন। এবার নাকি সেখানেই মা দিন-কয়েক থাকিবেন। কল্যাণবনে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা কিষণপুরে আসিলেন।

মা'র সঙ্গে দেখিলাম অনেকেই আসিয়াছে। কাশী হইতে সতী, বুবা, কুসুম, পানু, স্বামিজী, শোভাদি, বুনি, উদাস প্রভৃতি এবং কলিকাতা হইতে রেণুদি, কিরণবাবুর স্ত্রী প্রভৃতিও আসিয়াছে।

গত পরশুদিন মা কাশী হইতে রওনা হ'ন। সেই সকালেই মা বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে একবার গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে মা শঙ্করানন্দজী এবং ৺দরবেশজীর স্ত্রীকেও দেখিয়া আসিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌর পথে অযোধ্যা এবং ফয়জাবাদ ষ্টেশনে অনেকেই দেখা করিতে আসিয়াছিল। ফয়জাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিবেদীও মা'র একজন পুরাতন ভক্ত। তিনিও ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। বারাবঙ্কীর পথে গাড়ী কিছু বিকল হওয়ায় ২ ঘণ্টার ওপরে গাড়ী লেট্ আসে।

বারাবঙ্কী ষ্টেশনে বহু লোক মা'র অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছিল। মাকে ষ্টেশন হইতে কীর্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রা-সহকারে এক ধর্মশালায় লইয়া যাওয়া হয়। বম্বের স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী আজকাল ওখানেই আছেন। তিনি এখানে একটি বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন এবং সেই উপলক্ষেই মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একদিনের জন্য ওখানে লইয়া গিয়াছেন।

বারাবঙ্কীর উৎসবে মা।

ধর্মশালাটী নবনির্মিত। প্রকাণ্ড ধর্মশালা। চতুর্দিকে ঘর, মধ্যে বিরাট্ হল-ঘর। মা'র চারতলার ওপরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। মা'র সঙ্গীয় সকলেও সেই ধর্মশালাতেই রহিলেন।

কৃষ্ণানন্দ স্বামিজী এবং ব্যবস্থাপকবর্গের সকলেই মা'র অসুবিধা যাহাতে না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

সেইদিন রাত্রিতেই লক্ষ্ণৌ হইতে রাওয়ৎ সাহেব, Improvement Trust-এর সেক্রেটারী পাল মহাশয়, রহওয়ার রাজা-রাণী প্রভৃতি অনেক গণ্য-মান্য লোক মা'র সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

গতকাল সকালে মা প্রায় দুই ঘণ্টা ধর্মশালার সৎসঙ্গ-ভবনে উপস্থিত

ছিলেন। সহস্রাধিক স্ত্রী-পুরুষ ঐ উপলক্ষে ঐ সময় উপস্থিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর অনুরোধে মা কিছুক্ষণ গানও করিয়াছেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর মা বেলা ঠিক ৩টায় রাওয়াৎ সাহেবের মোটরে লক্ষ্ণৌ রওনা হন। পাল সাহেব এবং কৃপালের ভাই মহেন্দ্র সিং-ও পৃথক্ গাড়ী লইয়া মা'র সঙ্গে যান। রাওয়ৎ সাহেবের বাড়ী লক্ষ্ণৌতে বিধান-সভাগৃহের ঠিক সম্মুখে। তাঁহার বাড়ীর বাগানের মধ্যেই মা'র বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহারই গৃহ-সীমানার মধ্যে একটি নব-নির্মিত শিব-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। মা'কে সেইটাও তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন।

মা সন্ধ্যা প্রায় ৬টার পরে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছান। ষ্টেশনে শতাধিক ভক্ত মা'র দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নেপালে ভারতের রাজদূত ডাঃ ভগবান্ সহায়, উত্তর প্রদেশ State Museum-এর ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত নাগর, চন্দ্রভানজী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ঐ গাড়ীতেই কলিকাতা হইতে সাবিত্রী, গঙ্গা প্রভৃতি আসিতেছিল। লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া তাহারা মা'র দর্শন পাইল। উহারা পুরী আশ্রম হইতে আসিতেছে। এখন মা'র নির্দেশে রায়পুর আসিয়া থাকার কথা হইয়াছে।

আজ সকালে হরিদ্বার স্টেশনে যোগীভাই আসিয়া মা'র দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনিও বোধ হয় কাল এখানে আসিবেন।

কিষণপুর আশ্রমেই ভোগাদির পর মা কল্যাণবনে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে মা'র সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, কুসুম, ভরতভাই এবং গোপালের মা'র থাকার কথা।

বৈকাল ৫॥টার পরে আমিও একবার কল্যাণবনে গেলাম। কল্যাণবনে বাঁধান প্রাঙ্গণে মা অনেকক্ষণ বসিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। দেখিলাম মা'র বাহির-বারান্দায়ই শুইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমিও রাত্রিতে আবার কিষণপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

১১ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আগামী ১৩ই চৈত্র সংক্রান্তির দিন দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব পালিত হইবে। দিদিমাকে-ও সেজন্য এখানে আনা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টার সময় মা কিষণপুর আশ্রমে আসিয়া পড়িলেন। ভোগের পর প্রায় বেলা ২॥টায় পুনরায় কল্যাণবনে ফিরিয়া গেলেন।

বৈকালবেলা যোগী ভাই হরিদ্বার হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আশ্রমেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। তিনি মা'র নিকটে কল্যাণবনে গিয়া অনেকক্ষণ কথা-বার্তা কহিলেন।

রাত্রিতে মা আশ্রমস্থ সকল সাধু ব্রহ্মচারীদের ডাকাইয়া দিদিমার সন্ন্যাস উৎসবের কাজ-কর্মের বিধিব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কথা হইল প্রকাশানন্দজী আগামী কল্য হরিদ্বার গিয়া শ্রীবিষ্ণু দেবানন্দজী, শ্রীমহেশ্বরানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়া আসিবেন।

১২ই এপ্রিল ১৯৫৭।

সকালে পুরী আশ্রম হইতে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী আসিয়াছে। মা'র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সে বলিতেছে যে পুরীর পুরাতন ভক্ত দীনেশবাবু প্রভৃতি নাকি বলেন যে মা'র পূর্বে ভাব-সমাধি হইত, কিন্তু আজকাল আর ঐ-সব কিছুই দেখা যায় না। তাই নাকি অনেকে অনুমান করেন যে মা'র অবস্থার পতন হইয়াছে।

মা সব শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এই শরীরের কথা ছেড়ে দেও। অন্যক্ষেত্রেও এইরূপ সব অবস্থার পরেও ভাবাভাবের অতীত এইটাও

হতে পারে। যারা যা বুঝবে তারা ত তাই বলবে। এতে দোষের কথা কি আছে?"

কমলাকান্তকে মা বৃন্দাবন গিয়া পূজা-পাঠ ইত্যাদি সহ সাধন-ভজনের কথা বলিয়া দিলেন। শীঘ্রই সে চলিয়া যাইবে।

আজও প্রায় ১২টার সময় মা আশ্রমে আসিলেন। ভোগ ইত্যাদির পর. বিশ্রাম করিয়া কল্যাণবনে ফিরিয়া গেলেন। শুনিলাম কানের আওয়াজটা একটু বেশী অনুভব হইতেছে। কাশীতে মা গরম জলের ভাপ লইতেন। তাহাতে অনেকটা ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু পথে আসিবার সময় কিভাবে ফানেলটী হারাইয়া গিয়াছে; তাই কিভাবে ভাপ লওয়া হইবে, সকলেই তাই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মা নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। পেঁপে গাছের ডাটা কেটলীর মুখে লাগাইয়া মা ফানেলের কাজ চালাইয়া লইলেন।

১৩ই এপ্রেল ১৯৫৭।

গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব।

আজ দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব। প্রায় ৮টার সময় দিদিমাকে আশ্রম হইতে কল্যাণবনে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মা ও দিদিমাকে নূতন কাপড় পরাইয়া মোটরে বসাইয়া শোভাযাত্রা-সহকারে আশ্রমে লইয়া আসা হইল। একটি ছাদ-খোলা মোটরে মা ও দিদিমা বসিয়া আছেন। গাড়ী চালাইতেছেন অম্বের রাজা সাহেব। তাহার সম্মুখে চলিয়াছে পুলিশ ব্যাণ্ডপার্টি, তাহার পরে কীর্তন-দল, আর গাড়ীর দুই পার্শ্বে কেহ ছাতা ধরিয়া আছে, কিংবা কোন সাধু চামড় দুলাইতেছে। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা আশ্রমে আসিয়া

পৌঁছিলে শঙ্খ ও উলু-ধ্বনি-সহ মা এবং দিদিমাকে নিয়া হলঘরে আসনের উপরে বসান হইল। তখন আরম্ভ হইল সমবেতভাবে গীতা ও চণ্ডীপাঠ।

শ্রীঅবধূতজী আজ সকালে হরিদ্বার হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। কল্যাণবনে মা'র ঘরেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। মা আশ্রমের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধুদের অভ্যর্থনা ও সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোথায় তাঁহাদের বসান হইবে, কোথায় আহার করান হইবে, কিভাবে আসন পাতা হইবে ইত্যাদি যাবতীয় সব-কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মা দেখাইয়া ও বলিয়া দিতেছেন।

দশটার সময় ৺নারায়ণ-পূজার পর মা ও দিদিমার পূজা আরম্ভ হইল। একটু পরেই হৃষীকেশ পরমার্থ-নিকেতন হইতে শ্রীশুকদেবানন্দ স্বামিজী আসিয়া পৌঁছিলেন। পূজা সমাপ্তির পর তিনি সকলের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন।

ঠিক ১২টায় সাধু মহাত্মাদের ভোজন আরম্ভ হইল। মা-ও মধ্যে মধ্যে গিয়া সব পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাধু-ভোজনের পর মা ও দিদিমাকে ভোগে বসান হইল। ভোগের পরে প্রায় ৫।৬ শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন।

বৈকালে সৎসঙ্গ আরম্ভ হইলে অবধূতজী একটি ভাষণ দিলেন। পরে তিনি হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলেন। তাঁহার দিদিমা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। মৌন সমাপ্তির পরে আরম্ভ হইল অখণ্ড কীর্তন। ইহার সমাপ্তি হইবে আগামী কল্য সূর্যোদয়ে।

রাত্রি প্রায় ১০টার পরে মা কল্যাণবনে ফিরিয়া গেলেন। এইভাবে দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব উদ্‌যাপিত হইল।

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ ১লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। সকালবেলাই আমি মেয়েদের লইয়া গিয়া মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিলাম। মা শুইয়াই ছিলেন। পরে বেলা প্রায় ১১টায় মা উঠিলেন। ১২টার পরে মা আশ্রমে আসিলেন। মোদীনগর হইতে সস্ত্রীক মোদীজী এবং নারায়ণদাস বাজোরিয়া প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে— আর এ-বেলা কল্যাণবনে যাওয়া হইল না। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় ঘনাইয়া আসিল। মা তাঁহার উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

রাত্রিতে মা আর নীচে নামিলেন না। সকলে এক এক করিয়া আসিয়া মা'র ঘরেই মা'কে প্রণাম করিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে মা আশ্রমস্থ সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের ডাকাইলেন। গতকাল দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব সকলে মিলিয়া মিশিয়া সুন্দর করিয়া আনন্দের সঙ্গে করিয়াছে এই-সব কথা হইল।

তাহার পর কি প্রসঙ্গে কথা উঠিল যে গত বৎসর রায়পুর আশ্রমের জমি নিয়া গোলযোগের সময় স্বরূপানন্দকে কোর্টে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার যেন কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইত। মা-ও বলিলেন,—"সন্ন্যাসী তার আদর্শ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হওয়া না। তবে আশ্রমের কাজও যাহাতে নষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থাও অন্যদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করা।" মা আরও বলিলেন,—"এখন কথা, যে বিষয়ে অন্যকে বলিলে কোনও প্রতিকার হইবে না, সেই-সব কথা না বলাই ভাল,— এই শরীরের ত তাই মনে হয়।

আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের প্রতি মায়ের কয়েকটি উপদেশ।

একটু পরে ব্রহ্মচারী হরপ্রসাদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"মেয়েদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা না বলাই ভাল।" হরপ্রসাদের মনে এই কথা

শুনিয়া অভিমানে খুবই বোধ হয় আঘাত লাগিল। সে মা'র নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহিলে মা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"পড়ে থাকতে পারলেই ত ভাল কল্যাণের দিক। অন্য স্থানে মান প্রতিষ্ঠা অর্থ এই-সবই ত!" এইরূপ নানান্ কথা বলিয়া তাহার অভিমান দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য সকলকেই জপ-ধ্যানে বিশেষভাবে লাগিয়া যাইতে বলিলেন।

আজ মা'র পায়ের ব্যথা এবং ফুলা একটু বেশী মনে হইল। সেইজন্য আগামী কাল একবার দিল্লী গিয়া ডাঃ সন্তোষ সেন-কে দেখাইয়া আনার কথা হইল।

১৫ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ খুব ভোরেই কুসুমকে দিল্লী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সে পল্টুর সঙ্গে দেখা করিয়া ডাঃ সেনের সঙ্গে appointment করিবে। পল্টুর সহিত ডাঃ সেনের বিশেষ পরিচয় আছে। মা-ও আজ বৈকালে মোটরেই দিল্লী চলিয়া গেলেন, সঙ্গে গেল স্বামিজী আর বুনি।

১৬ই এপ্রিল ১৯৫৭।

মা সন্ধ্যার পরে মোটরেই দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় মোদীনগর হইয়া আসিয়াছেন।

শুনিলাম গতকাল কুসুম দিল্লীতে পৌঁছিয়া সন্তোষবাবুর সহিত কথাবার্তা বলিয়া সব স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সকাল ৭॥টায় তাঁহার বাসায়

মাকে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি সেখানেই মাকে পরীক্ষা করেন। হাঁটুর নীচে যে জায়গা ফুলিয়াছে তাহার ।ভতর হইতে পাম্প করিয়া জল বাহির করিয়া দিলে বেশ কিছুদিন আর কোন কষ্ট থাকিবে না বলিলেন। তারপর X-Ray লইবার কথা বলায় মাকে তাঁহার নার্সিং হোমে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে X-Ray করা শেষ হইলে আশ্রমে ফিরিয়া ভোগের পর বেলা ৩টায় মা দিল্লী হইতে রওনা হইয়া আসেন।

কুসুমকে দিল্লী হইতেই আহমদাবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবার আহমদাবাদে মায়ের জন্মোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু মা'র শরীরের ত এই অবস্থা। ডাক্তারও মাকে দীর্ঘ সময় বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই আহমদাবাদ গিয়া সৎসঙ্গাদিতে মা যদি বেশী সময় না বসেন, তবে ওখানকার সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইবে। এই-সব কথাই ওখানে মুকুন্দভাই ও কান্তিভাইকে বুঝাইয়া রাখিবার জন্যই কুসুমকে আহমদাবাদ পাঠান হইল। যদি তাহারা স্বীকৃত হয় তবে এবার মা'র জন্মোৎসব এখানেই হইতে পারে। মাকে লইয়া আর নাড়াচাড়ার প্রয়োজন হইবে না।

১৮ই এপ্রিল ১৯৫৭।

আহমদাবাদ হইতে মুকুন্দভাই-এর তার আসিয়াছে। কিন্তু পরিষ্কার কিছু লেখেন নাই কি স্থির হইল। তাই পুনরায় তাঁহার নিকট ফোন করা হইল। ফোনে মুকুন্দভাই বলিলেন যে মা আহমদাবাদে আসিলেই তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। মা যদি এখানে আসিয়া প্রোগ্রামে যোগ না-ও দেন তবুও তাঁহাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। সুতরাং ইহার পরে আর কি

আহমদাবাদে জন্মোৎসবের সূচনা।

করা! সুতরাং মা'র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আহমেদাবাদ যাওয়াই স্থির হইল। অবশ্য ইহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। কান্তিভাই মুনসা এবং মুকুন্দভাই প্রভৃতি বহুদিন পূর্ব হইতেই এবার ওখানে জন্মোৎসব করিবার জন্য বলিতেছেন। যদিও কান্তিভাই বর্তমানে ভারতের বাহিরে, কিন্তু তবুও কান্তিভাইয়ের স্ত্রী কুন্দনবেন ও অন্যান্য সকলেই তাঁহাদের বাসায় মা'র থাকিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মা'র উপস্থিতিতে মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতেও শ্রীমদ্‌ভাগবত-সপ্তাহ হইবার কথা হইয়াছে। নিমন্ত্রণ-পত্রাদিও ছাপা হইয়া বিলি করা হইতেছে। সুতরাং এইরূপ শেষ সময়ে ঐস্থানে উৎসব বন্ধ হইলে সকলের দুঃখিত হইবার কথাই। সুতরাং মা'র আহমেদাবাদ যাওয়াই স্থির হইল।

২১শে এপ্রিল ১৯৫৭।

কুসুম আজ সকালে আহমেদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার নিকট হইতে আহমদাবাদের জন্মোৎসব-সম্পর্কিত কথাবার্তা বিস্তারিত শোনা গেল।

বৈকালে মা একবার অনেক লোক নিয়া রায়পুর ঘুরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পরে আশ্রম-সংলগ্ন Free Finnish Mission হইতে ঐস্থানের কর্তৃপক্ষগণ মাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাহাদের ওখানে লইয়া গেল।

২২শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ আশ্রমে মিসেস্ সভরওয়াল মা'র ভোগ দিলেন। এই পরিবারটি বিশেষ ভক্তি ও সেবাভাবে পূর্ণ। ভদ্রমহিলার স্বামী পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব

Salt Commissioner ছিলেন। যদিও তিনি স্বামী রামতীর্থ মিশনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তথাপি আমাদের এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন এবং মা'র প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

বৈকালে মা একবার মোটরে করিয়া সহরের কয়েকটি বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন। অনেকেরই বহুদিনের বিশেষ ইচ্ছা ও প্রার্থনা ছিল যে মা যেন কখনো কৃপা করিয়া তাহাদের বাড়ীতে একটু পদধূলি দেন। আজ মা তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া আসিলেন।

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আজও আশ্রমে ৺মাধোরামজীর পুত্রবধূ হংসা দেবী মা'র ভোগ ও ভাণ্ডারা দিলেন। পুনরায় আজও বৈকালে মা পূর্বদিনের ন্যায় কয়েকটি বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন।

বৈজ্ঞানিক ও ঋষি।

মা'র সহিত কথা-প্রসঙ্গে একজন প্রশ্ন করিতেছিলেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের সব আবিষ্কৃত বস্তু যেমন সকলের মধ্যে প্রকাশিত করেন সেইরূপ প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরা তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যকে বহু জনের হিতের জন্য কেন দিতে পারেন নাই?

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"জাগতিক সুখ-সুবিধা ত অমৃত দিতে অক্ষম। ঋষিরা যে সনাতন পন্থা রেখেছেন, তাহাই এই-সব বৈজ্ঞানিক মতোপলব্ধির মূল উৎস। এক হিসাবে তাঁদেরই রক্ষিত ধন সকলে এখন ভোগ করছ।"

২৪শে এপ্রিল ১৯৫৭।

কলিকাতা হইতে স্যার রাজেন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ প্রভাদি আজ

কয়েকদিন হয় মা'র নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার মৃত পৌত্রের তিথি উপলক্ষে আজ আশ্রমস্থ সাধু-মহাত্মাদের ভাণ্ডারা হইল। সেই উপলক্ষে প্রত্যূষ হইতেই জপ ও কীর্তন চলিতেছে।

আগামী কল্য প্রভাতে মা'র এখান হইতে মোটরে হরিদ্বার যাইবার কথা। আর আমরা,—আমি, দিদিমা, মেয়েরা প্রভৃতি সকলেই বম্বে এক্স্প্রেসে আহমদাবাদ রওনা হইব। পরমানন্দ স্বামিজীও আমাদের সঙ্গে যাইবেন। মা-ও আগামী ৩০শে পর্যন্ত আহমদাবাদ পৌঁছিবেন, এইরূপ কথা হইল।

আহমদাবাদের পথে শ্রীশ্রীমায়ের হরিদ্বার ও বৃন্দাবন আগমন।

আজ এখানে এক আমেরিকান যুবক জ্যাক মা'র সঙ্গে প্রাইভেটে কথা-বার্তা বলিল। সে আজকাল মা'র নির্দেশে রায়পুর আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেছে।

২৫শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ সকাল প্রায় ১০টায় আমি, দিদিমা ও পরমানন্দ স্বামী মা'র সঙ্গেই মোটরে হরিদ্বার রওনা হইলাম। আর আমাদের সঙ্গীয় সকলে এখান হইতেই সোজা বম্বে এক্সপ্রেসে আহমদাবাদ রওনা হইল। পথে মা আমাদের হরিদ্বার স্টেশনে নামাইয়া দিয়া, যোগী-ভাইয়ের ওখানে চলিয়া গেলেন।

২৬শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আমরা গতকাল রাত্রি ১০টায় বরোদা পৌঁছিয়া প্রায় মধ্যরাত্রে আহমদাবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা সকলে কান্তিভাইয়ের বাড়ীতেই

আছি। দেখিলাম মা'র থাকিবার জন্য খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। স্বামিজীই সব দেখাশুনা করিয়া নিলেন।

২৯শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ বৃন্দাবনের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে মা হরিদ্বারে দুই রাত্রি থাকিয়া ২৭শে দ্বিপ্রহরে বম্বে একস্‌প্রেসে রওনা হইয়া মধ্যরাত্রিতে বৃন্দাবন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আজ সকালে শ্রীহরিবাবাজী-সহ সকলকে লইয়া মা'র ফ্রন্টিয়ার মেলে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৩টায় বরোদা পৌঁছিবার কথা। প্রথমে কথা হইয়াছিল মা ও হরিবাবাজীকে আহমদাবাদে মোটরেই লইয়া আসা হইবে, কিন্তু রাস্তা খারাপ বলিয়া ট্রেনে আনাই স্থির হইল।

পার্টি-সহ শ্রীহরিবাবার আহমদাবাদ জন্মোৎসবে আগমন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৫৭।

আজ মা হরিবাবাজী প্রভৃতি সহ সকাল প্রায় ৬৷৹টায় আহমেদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম হরিবাবাজী মথুরা স্টেশনে আসিয়া মা'র সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। মা'র সঙ্গে ১২ জন এবং হরিবাবার সঙ্গে ৬ জন— এই ১৮ জন আসিয়াছেন। উত্তর রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী কৌল সাহেব মা'র সঙ্গীয় সকলের জন্য একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে অছরোলের রাজা এবং রাণী ঐ গাড়ীতেই মথুরা আসিতে-

ছিলেন মা'র সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। তাঁহারা ভরতপুর পর্যন্ত মা'র গাড়ীতে গিয়া কথাবার্তা বলিয়া পুনরায় সেখান হইতে দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছেন। রাজা এবং রাণী উভয়েই পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ইয়োরোপ যাইতেছেন, সেজন্য মা'র আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

গাড়ীর মধ্যেই সন্ধ্যার পরে Conductor Guard-এর অনুমতি লইয়া হরিবাবাজীর সংকীর্তন সমাপ্ত হইল। অন্যান্য যাত্রীরা, বিশেষতঃ Air Conditioned Coach-এর যাত্রীরা ত বিস্ময়ে হতবাক্। সাধারণতঃ গাড়ীর মধ্যে ঐরূপ জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া কীর্তনে অনেকেরই আপত্তি হইবার কথা, কিন্তু বোধ হয় সাধু-মহাত্মা দেখিয়া কেহই আর আপত্তি করে নাই।

ভাইয়া, কানিয়াভাই এবং লীলাবেন গতকাল রাত্রিতেই বরোদা স্টেশনে আসিয়া মা'র সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই মা'র সঙ্গে গুজরাট মেলে একটি কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে মুকুন্দভাই প্রভৃতি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মাকে গুজরাট মেলের পূর্ববর্তী গাড়ী সৌরাষ্ট্র মেলে লইয়া আসিয়া এখানে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, এমনই যোগাযোগ হইল যে মা'র ফ্রন্টিয়ার মেল বরোদা স্টেশনে কিছু লেট্-এ আসিয়া পৌঁছিল। সৌরাষ্ট্র মেল তাহার পূর্বেই ছাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য মা'র গুজরাট মেলেই আসা হইল। কোন পক্ষেরই আর দুঃখিত হইবার অবকাশ মিলিল না। বম্বে হইতে ঐ গাড়ীতেই ভূতা সাহেবের স্ত্রী এবং সুশীলাবেনও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মাকে আনিতে স্টেশনে ঠাকুরভাই প্রভৃতি অনেকেই গিয়াছিল। মা স্টেশন হইতেই সোজা কান্তিভাইয়ের মেয়ে উর্মিলার শ্বশুরবাড়ীতে হরি-বাবাজীকে লইয়া গেলেন। সেখানেই তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাকে ও হরিবাবাজীকে বাড়ীর আঙ্গিনায় বসাইয়া আরতি ইত্যাদি করা

হইল। পরে হরিবাবাজী উপরে তাঁহার থাকিবার ঘরে চলিয়া গেলেন এবং মা কান্তিভাইয়ের বাসায় চলিয়া আসিলেন।

আজ বৈকাল হইতেই শ্রীহরিবাবাজীর সৎসঙ্গ কান্তিভাইয়ের বাসায় আরম্ভ হইল। সৎসঙ্গের পরে মা মোটরে করিয়া দুই-তিন বাসায় ঘুরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পরে হরিবাবাজীর কীর্তন মা'র ঘরের সম্মুখেই হইল।

১লা মে ১৯৫৭।

গতকাল সকালেই বৃন্দাবন হইতে রাস-পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ সকাল হইতে তাহাদের রাসলীলা আরম্ভ হইল।

বাগানে প্যাণ্ডেল করিয়া সৎসঙ্গের স্থান করা হইয়াছে। একদিকে রাসলীলা এবং সৎসঙ্গ হইতেছে। অপরদিকে, রাম-অর্চা আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরভাই মাকে লইয়া বাহিরে কোথায় গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে মা একটু পায়চারীও করিলেন। পরে মুকুন্দভাইয়ের বাসা হইয়া মা ফিরিয়া আসিলেন। ভাইয়া রাত্রিতে বম্বে ফিরিয়া গেল। লীলাবেন প্রভৃতি দুই-তিনদিন মা'র কাছে থাকিয়া যাইবে।

২রা মে ১৯৫৭।

আজ মা'র জন্মদিন। ১৯শে বৈশাখ। আজই রাত্রিতে মা'র প্রথম দিনের পূজা হইবে। কাল মা'র ৬১ বৎসর পূর্ণ হইল।

আহমদাবাদে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনের উৎসব।

মুকুন্দ ভাইয়ের বাসাতেও আজ সকাল হইতেই ভাগবত-সপ্তাহ আরম্ভ হইল। বাড়ীর পার্শ্বে-ই সুসজ্জিত বিস্তৃত প্যাণ্ডেল। মা'র বসিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে বসিবার স্থান করা হইয়াছে অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া।

সকাল ৭টায় মাকে লইয়া আমি, দিদিমা স্বামিজী সকলে স্থানীয় সারদা-মন্দিরে গেলাম। এই বিদ্যালয়টির জন্য ঠাকুরভাই বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এখনও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা'র শ্রীহস্তে এই বিদ্যালয়ের একটি নূতন প্রকোষ্ঠের ভিত্তি স্থাপন করা হোক, ইহাই ঠাকুরভাইয়ের বিশেষ ইচ্ছা। এইজন্যই মাকে আজ নিয়া আসা হইয়াছে। ইহার পর মাকে দিয়া উহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন।

ঐ কার্য সমাপনান্তে আমরা সকলে মুকুন্দভাইয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ তখনো আরম্ভ হয় নাই—মায়ের আগমনের জন্যই মুকুন্দভাই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ঐ শুভকার্য আরম্ভের পূর্বে মায়ের পূজা হইয়া যাক।

সজ্জিত পূজা প্যাণ্ডেল। প্যাণ্ডেলে স্বামী মাধব তীর্থজী প্রভৃতি মহাত্মাগণও উপস্থিত রহিয়াছেন। সকলের সম্মুখে প্যাণ্ডেলের মধ্যেই মা'র পূজার আসন রচিত হইয়াছে। পূজা আরম্ভ হয় হয়, ঠিক এই সময় মা হঠাৎ উঠিয়া পূজা-পাত্র হইতে কয়েকটি মালা স্বহস্তে উঠাইয়া মহাত্মাদের গলায় দিতে লাগিলেন। পরে আরো কয়েকটি মালা ছিঁড়িয়া উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ফুল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর বলিয়া উঠিলেন,—"এই শরীরের পূজা-টুজা আসে না।" বলিয়াই মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া সকলের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আমরা ত বিস্ময়ে হতবাক্।

ইহার পর মুকুন্দভাই ও তাঁহার স্ত্রী সুমিত্রাবেন মাকে আসনে বসাইয়া পঞ্চামৃত দ্বারা চরণ ধোয়াইয়া মালা, চন্দন, বস্ত্র, নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে বিধিমত মা'র পূজা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটী বেদপাঠী ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সব মিলিয়া পূজাস্থানে একটি অপূর্ব পূত ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি হইল।

ইতিমধ্যে মা নিকটে রক্ষিত একটি পুস্তক কোথা হইতে তুলিয়া লইলেন। পুস্তকখানি কোলের উপর সোজা অবস্থায় রাখিয়া মা স্থির হইয়া বসিলেন। দেখিলাম সেই পুস্তকটির উপরে রহিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের একটি রঙ্গীন চিত্র। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল পূজা যেন শ্রীকৃষ্ণের হইতেছে সম্মুখে রক্ষিত চিত্র-পটে। যতক্ষণ পূজা চলিল, মা ধীরভাবে নিশ্চল অবস্থায় নির্নিমেষ-নেত্রে বসিয়া রহিলেন। অনুপম এক দীপ্তিতে মা'র মুখখানি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। পূজার পরে আরতি সমাপ্ত হইবার অনেকক্ষণ পরে মা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরে ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা পৃথগ্‌-ভাবে হইয়াছে—পাঠ করিবেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ আর ব্যাখ্যা করিবেন স্থানীয় একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রী বিষ্ণু সাংক্লেশচর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

মা উঠিয়া কান্তিভাইয়ের বাসাতে চলিয়া আসিলেন। হরিবাবাজীর সৎসঙ্গ চলিতেছিল এখানে। মা সেখানে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন। তাহার পর হরিবাবাজীকে চণ্ডীপূজার ওখানে নিয়া যাওয়া হইল। আজ হইতেই চণ্ডীপূজা ও পাঠও আরম্ভ হইল। ইহা চলিবে তিথি-পূজার দিবস পর্যন্ত।

আজ অক্ষয়তৃতীয়া। এই দিনে স্ত্রীলোকেরা জলদান করে। ইহা বাংলার রীতি, কিন্তু দেখিলাম এই অঞ্চলেও ইহা প্রচলিত। কান্তিভাইয়ের স্ত্রী, ঠাকুরভাইয়ের স্ত্রী, বীণা, ঊর্মিলা প্রভৃতি মা এবং হরিবাবার সম্মুখে ব্রাহ্মণদের জলপূর্ণ জল-পাত্র, ফল এবং মিষ্টি দান করিল।

যে-কয়দিন ভাগবত-সপ্তাহ চলিবে, মুকুন্দভাইয়ের একান্ত আগ্রহ সে-কয়দিন মায়ের ভোগ তাঁহার ওখানেই হইবে। সুতরাং একটু পরেই মাকে মুকুন্দভাইয়ের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। ভোগের পরে মা সেখানেই বিশ্রাম করিবেন।

বৈকালে পুনরায় মা পাঠের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে আরতির পর মা বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রতি বৎসরই সকাল ও সন্ধ্যায় মা'র আরতি করা হয়। কিন্তু এবার দুই বাড়ীতে মা'র আসা-যাওয়া করিতে হইতেছে, সেইজন্য যেন ঠিক ঠিক সময়ে মা'কে পাওয়া যাইতেছে না। আজ সন্ধ্যার পরে মা ঘরে আসিয়া একটু বসিলে, সেখানেই মা'র আরতি করা হইল। মৌনের কিছু পূর্বে মা মুকুন্দ-ভাইয়ের বাসায় গিয়া প্রায় ১০টায় এখানে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রি ৩টায় মা'র পূজা আরম্ভ হয়। মা ঘরের বাহিরে লনে শুইয়া-ছিলেন। সেখানেই পূজার আয়োজন হইল। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রায় সকলেই আসিয়া সমবেত হইলেন। যথাসময়ে মায়ের পূজা কুসুম ব্রহ্মচারী আরম্ভ করিল। দীর্ঘ দিন হয় আমার ইচ্ছা অনুসারে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর এবং গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, মানস-সরোবরের জল বহু কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সিন্ধু নদের জলও পাকিস্থান হইতে প্লেনে করিয়া আনাইতে হইয়াছে। সেই জল দ্বারা আজ মায়ের চরণ ধোওয়ান হইল। তারপর পঞ্চামৃত দ্বারাও অভিষেক করান হইল। তাহার পর আরম্ভ হইল পূজা। যতক্ষণ পূজা চলিল মা একপাশ হইয়া শুইয়াই রহিলেন। পূজা, ভোগ, আরতি হইতে হইতে ভোর প্রায় ৫টা হইয়া গেল। পূজার পরে সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেলে মা'র মশারি ফেলিয়া দেওয়া হইল। মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একইভাবে শুইয়া রহিলেন। উঠিতে উঠিতে প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল।

৩রা মে ১৯৫৭।

মা উঠিলে মা'র ঘরেই আরতি করা হইল। ইহার পর মা কিছুক্ষণ

রাসলীলা এবং কিছুক্ষণ রাম-অর্চার নিকটে গিয়া বসিলেন। সৎসঙ্গ সমাপ্তির পর মা মুকুন্দভাইয়ের বাসাতে চলিয়া গেলেন। আজ মুকুন্দভাইয়ের ওখানে দিদিমা এবং আমিও প্রসাদ পাইলাম। আজ মা'র ভোগ ১৬ পদে দেওয়া হইয়াছিল।

আজিও সন্ধ্যার একটু পূর্বে আসিয়া মা মোটরে বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ হরিবাবাজীর কীর্তনে মুকুন্দভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেলেন। মৌনের পর প্রায় এক ঘণ্টা প্যাণ্ডেলেই মাতৃ-সৎসঙ্গ হইল। ১০টায় কান্তিভাইয়ের বাসায় মা ফিরিয়া আসিলে মা'র আরতি করা হইল।

৪ঠা মে ১৯৫৭।

আজ সকালে মা ৯টায় উঠিলেন। কোন প্রকারে মা'র আরতি শেষ করিতেই মা গিয়া রাসের নিকট বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় ১০॥০টায় রাম-অর্চার নিকটে গিয়া বসিলেন। রাম-অর্চার শেষে আজ মা বহুদিন পরে স্নান করিলেন। স্নান সারিয়া মা মুকুন্দ-ভাইয়ের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল প্রায় ৫॥০টায় মা হরিবাবাজীর সৎসঙ্গে গেলেন। সৎসঙ্গের শেষে ঠাকুরভাই মাকে কাঁকাড়িয়া তলাও লইয়া গেলেন। সঙ্গেও অনেক লোক গেল। সেখানে গিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মা বলিতে লাগিলেন,—"জাগতিক দিক্ দিয়ে কিছু খারাপ দেখা যাচ্ছে।" ইহার কি অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়াই মা মুকুন্দভাইয়ের বাসাতে চলিয়া গেলেন। সেখান

হইতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। আরতির পরেই মা বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

৫ই মে ১৯৫৭।

আজ পৌনে ৮টায় চন্দ্রকান্ত শেঠ আসিয়া মাকে ও আমাদের তাঁহার নূতন বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভাইয়াও মা'র সঙ্গে গেল।

সেখান হইতে ফিরিয়া মা কান্তিভাইয়ের বাড়ীতে কিছুক্ষণ রাসলীলা এবং কিছুক্ষণ রাম-অর্চায় বসিয়া মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে ভাগবত-সপ্তাহে চলিয়া গেলেন। আজ সন্ধ্যায় আর মা এখানে আসিলেন না। ঊর্মিলার শ্বশুর মহাশয়ের আজ জন্মদিন। হরিবাবাজী পার্টি-সহ তাঁহার বাড়ীতেই রহিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় সেইখানেই কীর্তন, রাম-অর্চা ইত্যাদি হইবার কথা। মা পৌনে ৬টায় মুকুন্দভাইয়ের বাড়ী হইতে সোজা সেখানে চলিয়া গেলেন। আমরাও সাত-আটখানা গাড়ী ভরিয়া অনেকে সেস্থানে গেলাম। সেখানে তাহারা মা, দিদিমা, আমাকে এবং উপস্থিত সাধু মহাত্মাদের সকলকেই বস্ত্রাদি দান করিলেন। ঊর্মিলার অনুরোধে সেখানে মা কিছুক্ষণ "হে ভগবান্, হে ভগবান্" কীর্তন করিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল।

সেখান হইতে ফিরিয়া মা আজ বসিয়া বসিয়া আমাদিগকে অনেক কথাই বলিলেন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাধু-সেবা কিভাবে করিতে হয়, সকলের সহিত কিভাবে বিনম্র এবং মিষ্ট ব্যবহার করিতে হয়, কিভাবে সর্বদাই সেবা-কার্য প্রফুল্ল অন্তরে করিতে হয়—এই জাতীয় নানা বিষয়ে মা আমাদিগকে উপদেশ দিলেন। মা'র শ্রীমুখ হইতে মা'র শরীরের ওপর সাধনার খেলারও ইতিকথা কিছু কিছু শোনা গেল। এইভাবে রাত্রি প্রায় ১টার পর মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। আমরাও একে একে চলিয়া আসিলাম।

৬ই মে ১৯৫৭।

আজও মা মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে ভোগে বসিয়া কুসুম, উদাস, বুনি, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কথা-প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন,—"পূর্বে একসময় ছিল যখন এই শরীরটা কারো কোনো কাজের দিকেই লক্ষ্য দিত না। তারপর এমন কিছুদিন ছিল যখন সকলের কাজ-কর্ম ব্যবহার দেখেও কিছু বলা হ'ত না। পরে আবার এমন সময় গেল যখন কাহারো কোন ব্যবহার দেখে তাহাকে প্রাইভেটে ডেকে বলা হ'ত যাতে সে নিজের স্বভাব সংশোধন করতে পারে। কিন্তু এখন যেন অন্য রকমটা। এখন দেখা যাচ্ছে শরীরটা সকলের মধ্যেই কারো কারো ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছে। এই যে ব্যবহার এটাও কিন্তু নিজেকে নিয়ে নিজে খেলার মতই। কেউ যেন মনে না করে, এই যে ব্যবহার এর দ্বারা অপরের দোষ দেখা হচ্ছে। এটা কিন্তু মোটেও সে-দিকের না। ইহা কেমন জান? যেমন নিজেই নিজের হাতে তালি বাজিয়ে আবার নিজেই তাহা শোনা। এই রকমটা আর কি? কাকেও জব্দ করার জন্যে কি অন্যের দোষ আলোচনার জন্য না। পৃথক্ বলে ত এই শরীরটার কোন খেয়ালই নেই। নিজেকে নিয়েই নিজের খেলা।"—এই জাতীয় আরও বহু কথা বলিয়াছেন।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চায়, এই প্রসঙ্গ নারায়ণ স্বামী মা'র নিকট উত্থাপন করিলে মা বলিলেন,—"বেশ ত, তোমরা সন্ন্যাস নিতে হলে কিভাবে চলা উচিত, কি নিয়ম পালন করা উচিত, এসব একেবারে লিখে রাখ না।"

মাদ্রাজী এক ভদ্রলোক, নাম পিল্লাই, মা'র সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ আছেন। তিনি এখনই সন্ন্যাস নিতে ইচ্ছুক। মা তাঁহাকে বলিলেন,—"বেশ ত একটা বছর সন্ন্যাসীদের যেভাবে চলা উচিত সেই ভাব পালন করে দেখ আগে।"

নারায়ণ স্বামী মাকে বলিলেন যে প্রতি বৎসর মা'র জন্মোৎসবের সময়

অন্ততঃ দুই-একজন ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস নেওয়া দরকার। মা'র সান্নিধ্যে থাকিয়া কাহার কিরূপ ত্যাগ বৈরাগ্য হইল এই-সব বিচার করিয়া সন্ন্যাস নেওয়া দরকার। কুসুম মাকে বলিল যে আশ্রমবাসী সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে পার্শী সাধু কেশবানন্দের বেশ ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা দেখা যায়।

সন্ধ্যার সময় মাকে স্থানীয় শ্রীঅদ্বৈতানন্দ সাগরাচার্যজীর মঠে নিয়া গেল। সেস্থানেও ভাগবত-সপ্তাহ হইতেছে। মাকে খুব সমাদর করিয়া একেবারে ব্যাসাসনের পার্শ্বে-ই বসাইলেন। মা কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া কান্তিভাইয়ের বাসাতে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে ভাগবত-সপ্তাহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিষয়ক অধ্যায় পাঠ করিবার সময় বিশেষভাবে আরতি আদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাখন ও মিশ্রি ভোগ দেওয়া হইল। পাঠক শ্রীবিষ্ণুদেবজী মা'কে আপন হাতে একটু মাখন-মিশ্রী খাওয়াইয়া দিলেন, তিনি নিজেও একটু প্রার্থনা করিলে মা তাঁহার মুখে একটু দিয়া দিলেন। তারপর উপস্থিত কয়েকজনের মুখেও মা একটু একটু করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী মাধবতীর্থ, পরমানন্দ স্বামী, আমি এবং আরো অনেকে ছিলাম।

৭ই মে ১৯৫৭।

আহমদাবাদে ভোলানাথজীর তিরোধান-দিবস।

আজ ভোলানাথজীর তিরোধান-তিথি। মা আজ সকালে উঠিয়াই মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে ভাগবৎ-পাঠে গেলেন, সেখান হইতে রাসলীলা-স্থলেও একটু সময়ের জন্য গেলেন।

ভোলানাথজীর তিথি উপলক্ষে এখানে সঙ্গীয় সকলকে, হরিবাবাজীর সঙ্গীয় সকলকে এবং সন্ন্যাস আশ্রম, গীতা-ভবন এবং অন্যান্য কতকগুলি মঠের সকল সাধু মহাত্মাদের নিমন্ত্রণ করা হইল। সকলকে মাল্য-চন্দন-সহকারে

অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে ভোজন করান হইল। হরিবাবাজীকে বিশেষভাবে আলখাল্লা, পাগড়ী ও চাদর পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সাধুদের ভোজনের সময় মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের আরতি করাইলেন। আজও মা নানা কথা বলিলেন,—"যদিও পূর্ব হতেই সব নির্ধারিত হয়ে আছে, তবুও তেমন শক্তিশালী পুরুষ হলে তাহাও বদলাইয়া দিতে পারেন। সাধারণ ক্ষেত্রে এমন হতে পারে, যেটা হবে সেটার জন্যেই তারা বলেন, কিন্তু এমনও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাহা নির্ধারিত নেই, তাঁরা তাহাও করতে পারেন। অবশ্য এমন লোক কোটির মধ্যে গুটি, মানে কোটির মধ্যে একটি।

৮ই মে ১৯৬৭।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে নানা বিষয়ক কথা।

গতকালও রাত্রিতে মা অনেক কথা বলিয়াছেন। পূর্বেই লিখা হইয়াছে যে একদিন মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"জাগতিক দিক্ দিয়ে খারাপ দেখা যাচ্ছে।" আবার মৃতদেহও দেখিতে পাইয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, মা যখনই এইরূপ কিছু বলেন বা দেখেন, তখনই কোনও না কোনও দুঃসংবাদ পাওয়া যায়। গতকাল রাত্রিতে সংবাদ পাওয়া গেল মোরভির বৃদ্ধ মহারাজা দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর গতকাল দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি মাকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। দুইবার তিনি মাকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। যাক্ একটি ত সংবাদ শোনা গেল—মা'র কৃপায় আবার নূতন কিছু সংবাদ না আসে!

যাহা হউক, আজ সকালে উঠিয়া মা প্রথমে রাসলীলায় গিয়া বসিলেন। রাম-অর্চা শেষ হইবার পরে মাকে চণ্ডীপাঠের ওখানে একটু বসান হয়। মা'র আরতিও আজ ঐখানেই হয়।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের রাধাবল্লভজীর মন্দিরের মোহন্ত শ্রীমুকুটবিহারীজী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া মা'র ঘরে বসিয়া আছেন। মা ঘরে ঢুকিবামাত্রই তিনি মা'র পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা'র সঙ্গে মোহন্তজীর কিছু কথা হইল ঃ

মোহন্তজী—"যে ছেলে দুধ খাও বলিলেই খায়, মা'র তার দিকে বিশেষ খেয়াল থাকে না। কিন্তু যে নটঘট করে মা তার দিকে খুব খেয়াল দেন।"

মা—"যদি সত্যিকারের মা হ'ন তবে তিনি এইসবের অপেক্ষা রাখেন না।"

মোহন্তজী—"ছেলে যখন দেখে যে মা'র তার দিকে খেয়াল নেই, তখন সে নটঘট সুরু করে। দেখে মা কী করেন ?"

মা—"যে ছেলে পরীক্ষা করতে চায় সে ঐ রকমই করে। ছেলেও হবে আবার পরীক্ষাও করবে"—এই বলিয়াই মা হাসিতে লাগিলেন।

আবার কথা-প্রসঙ্গে মোহন্তজী বলিলেন,—"ঠিক কথাই মা। তবে যে বাদল জল নিয়ে উপরে যায় সেই বাদলই জল নিয়ে নীচে আসে। যে বাদল বারি বর্ষণ করে না, সে বাদল ত বাদলই না। তবে বিরহে-ই........

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মা বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, বিরহে-ই সংযোগ, দুই-ই একই স্থানে।"

মোহন্তজী আবার বলিলেন,—"মা, সকলে এখানে আসে কিন্তু বাসন সঙ্গে আনে না। তাই এক বিন্দুও জল পায় না।"

মা—"আবার বাসন আনে কিন্তু উল্টা করে রাখে।"

মোহন্তজী—"ঠিক কথাই মা। বাসন উল্টা করে রাখা মানে ঘরের দিকে খেয়াল রাখা। কৃপা-বারি নেওয়ার জন্য বাসন দীনতায় তৈরী করতে হয়।"

মা—"পিতাজী, দীনতায় উল্টা বাসন সিধাও হয়ে যায়।"

আজ রাত্রিতে মুকুন্দভাইয়ের বাসায় সৎসঙ্গে তাঁহাকে কিছু বলিতে

অনুরোধ জানান হইল। মুকুন্দভাই মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। মা বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, বৃন্দাবনের মত যেন নটঘট না হয়।"

গতবার বৃন্দাবনে ভাগবত-সপ্তাহের সময় তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল এবং তিনি ভাষণ দিতে স্বীকৃত হইয়াও নাকি বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেইজন্যই মা উল্লিখিত কথা বলিলেন। তিনি মা'র কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"না, মা, বৃন্দাবন হচ্ছে ব্রজভূমি, সেখানে নটঘটই হয়। কিন্তু এটা হচ্ছে প্রদেশ। এখানে মা'র আদেশ রক্ষা করাই কর্তব্য।"

তিনি চলিয়া গেলে মা প্রায় ১১৷৷০টায় মুকুন্দভাইয়ের বাসায় আসিলেন।

দ্বিপ্রহরে জয়পুর হইতে মহীশূরের মহারাণী এবং সঙ্গে আরও দুই-তিনজন আসিবার কথা। কুসুমকে তাই তাহাদিগকে লইয়া আসার জন্য স্টেশনে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা মা'র ওখানে আহার সমাপ্ত করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন।

আজ ভাগবত-পাঠ শেষ হইলে মা পাঠকের অনুরোধে প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল খুব সুন্দর কীর্তন করাইলেন। কীর্তন সমাপ্তির পর প্যাণ্ডেলের মধ্যেই মা'র আরতি হইল।

সেখান হইতে মা মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও মা কিছুক্ষণ কীর্তন করাইলেন। ফিরিতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল।

৯ই মে ১৯৫৭।

আজ সকালে উঠিয়াই মা মুকুন্দভাইয়ের বাসাতে চলিয়া গেলেন। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য এখানে আসিয়া পুনরায় তাঁহার বাসাতেই চলিয়া গেলেন।

আজ সকাল হইতেই মা'র ভাবটি যেন খুব গম্ভীর দেখা যাইতেছে। কথাবার্তাও খুব কম বলিতেছেন। ভোরবেলা মুখ ধুইতে বসিয়া আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন,—"আমার সকল হবে, সকল হবে, সকল হবে তুমি।"

আজ বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ শেষ হইল। আমরা প্রায় সকলেই আজ মুকুন্দভাইয়ের বাসাতেই প্রসাদ পাইলাম। পাঠ সমাপ্তির পর কুসুমকে দিয়া আশ্রমের পক্ষ হইতে কিছু ফল ও টাকা ভেট দেওয়া হইল। পরে ভাগবত এবং মা'র আরতি করা হইলে মা কিছুক্ষণ নামও করাইলেন।

সন্ধ্যায় মা'র আরতি কান্তিভাইয়ের বাগানেই করা হইল। পরে মা হরিবাবাজীর কীর্তনে গিয়া ফিরিলেন প্রায় রাত্রি ১১টায়।

মহীশূরের মহারাণী প্রভৃতি খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাইবার সময় মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা তাঁহাদের লইয়া হঠাৎ মোটরে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেলেন,—"উড়া পাখীর আসা যাওয়া।" সঙ্গে আর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিলেন। মা'র ভাবটিও খুব গম্ভীর—কী জানি কোথায় যান, কি করেন। আমরা তাই একটু চিন্তিতই রহিলাম। মা ফিরিলেন প্রায় ১২॥০টায়। শুনিলাম মহারাণীদের নামাইয়া দিয়া মুকুন্দভাইয়ের বাসাতে গিয়াছিলেন। শুইতে শুইতে মা'র প্রায় ১॥০টা বাজিয়া গেল।

১০ই মে ১৯৫৭।

আজ সকালে রাসলীলা প্রভৃতি মুকুন্দভাইয়ের বাড়ীতে হওয়া স্থির হইয়াছে। মা সেজন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওখানে চলিয়া গেলেন। ওখানে সাড়ে ৯টায় রাসলীলা সমাপ্ত হইলে, মা রাম-অর্চায় গেলেন। তাহার পর

প্রায় ১॥০ ঘন্টা সমবেতভাবে সমগ্র গীতা-পাঠ হইল। মা প্রায় শেষ পর্যন্ত ঐস্থানেই বসিয়া রহিলেন।

আজ মুকুন্দভাই নারায়ণ শেষ উপলক্ষে সকলের ভাণ্ডারা দিয়াছেন। মা আজ ভোগের পরে মুকুন্দভাইয়ের অনুরোধে তাঁহার ও-স্থানেই বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে বৈকাল ৬টায় এখানে আসিলেন।

এখানে সৎসঙ্গ শেষ হইলে মাকে লইয়া মুকুন্দভাই ও তাঁহার স্ত্রী সুমিত্রা-বেন শ্রীমদ্‌ভাগবত পুস্তকখানি পাঠকের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এদেশে নাকি এইরূপই রীতি।

আগামী কাল হইতে সমস্ত প্রোগ্রাম কান্তিভাইয়ের বাসাতেই হইবে। কান্তিভাই যদিও অনুপস্থিত, কিন্তু তবুও কুন্দন, লীলা, ঠাকুরভাই প্রভৃতি মিলিয়া মা'র উৎসব এবং সৎসঙ্গের সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। বিশেষ করিয়া উর্মিলার স্বামী মধুকান্ত ত খুবই পরিশ্রম করিতেছে। ঠাকুরভাইয়ের মেয়ে বীণা এবং শক্তি দিন-রাত পরিশ্রম করিয়া প্যাণ্ডেল এবং মা'র ঘর সাজাইতেছে। মা'র যাহাতে গরম না লাগে সেজন্য ঘরের চতুর্দিকে খস্‌খস্‌ দিয়া পাম্প লাগাইয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিস্তৃত বিশাল প্যাণ্ডেলটির বাহিরেও খস্‌খস্‌ দিয়া ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এত বিস্তারিত-ভাবে আয়োজন করিয়াও, মা তাহাদের ওখানে বিশেষ থাকিতে পারিতেছেন না, এবং প্রোগ্রামও সব ওখানে হইতেছে না, এই কারণে ওখানে সকলেই মনে মনে দুঃখিত ছিল, কিন্তু আগামী কাল হইতে এখানেই যাবতীয় প্রোগ্রাম হইবে শুনিয়া বাসায় সকলেই যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কান্তিভাইয়ের বাসাতে উৎসব।

১১ই মে ১৯৫৭।

আজ সকালে গোপীভাইয়ের দিল্লী হইতে আসিবার কথা। মধুকান্ত এবং

উর্মিলা সেজন্য নিজেরাই আগ্রহ করিয়া যোগীভাইকে আনিতে মোটর লইয়া বরোদা চলিয়া গিয়াছে। যোগীভাইয়ের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইলাম। প্রায় ১টার সময় উর্মিলা যোগীভাইকে লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম বরোদা হইতে আসিবার পথে অপর একটি গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া মধুকান্তের গাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সকলেই মা'র অসীম কৃপায় প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। মধুকান্ত এবং যোগীভাইয়ের লোকজন সেখানেই রহিয়া াগয়াছে। উর্মিলা কোনও ভাবে অপর একটি গাড়ী করিয়া যোগীভাইকে বাসায় লইয়া আসিয়াছে।

মধুকান্ত এবং রাজা সাহেবের সেক্রেটারী প্রায় বৈকাল ৪টার সময় থানা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল শুনিলাম, তাহাতে কাহারও বাঁ।চবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মা'র কৃপাবলেই আজ উহাদের একটি বিশেষ ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

১২ই মে ১৯৫৭।

আজ সকালে ১০৮ কুমারী ভোজন করান হইল। প্রত্যেক কুমারীকে জরির চাদর গায়ে দিয়া মালা-চন্দনে সাজাইয়া আরতি করা হইল। ঐ-সঙ্গে পাঁচজন বটুকও ছিল। একজন কুমারী অর্ধেক ভোজন করিয়া উঠিয়া গিয়াছে। মা তাড়াতাড়ি সেই পাতাটি নিজের হাতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "আমার মুখে একটু দিয়ে দেও ত। তারপর মা আপন হাতেই সেই কুমারীর প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

বৈকাল প্রায় ৪ ঘটিকার সময় মা গিয়া হরিবাবাজীর সৎসঙ্গে বসিলেন। ঘণ্টাখানেক বসিয়া পরে উঠিয়া আসিয়া নিজের ঘরে একটু শুইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে ঠাকুরভাইয়ের গাড়ীতে একটু বেড়াইতে গেলেন। সঙ্গে মুকুন্দ-

ভাইয়ের গাড়ীতে মেয়েরাও গেল। অজিতভাইয়ের বাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই হরিবাবাজীর সৎসঙ্গে গিয়া বসিলেন।

রাত্রিতে যোগীভাইয়ের সঙ্গে মা'র পরবর্তী প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিছু কথা-বার্তা হইল। জয়পুরের মদনমোহন বর্মার বিশেষ আগ্রহ মা মাউণ্ট আবুতে গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন। ভাইয়া পুনাতে মা'র জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। আবার কেহ কেহ দেরাদুন বা সোলনের কথা বলিতেছেন।

যোগীভাই চলিয়া গেলে মা আমাদের উদ্দেশ করিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। দিন-কয়েক পূর্বে কয়েকটি ব্রহ্মচারীর মধ্যে কি বিষয় নিয়া একটু বাদানুবাদ হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়াই মা বলিতেছেন,—"এই শরীরটা ইহাও তো পারে যে তোমরা যে যা ইচ্ছা করে যাও। কিন্তু আবার খেয়াল হয় যে ওরা যা করছে তা ওদের পক্ষে মঙ্গলকরও নয়। তাই কিছু কিছু বলা হয়। তবে এ শরীরের পক্ষে সবই সমান।"

আমি মা'কে নিবেদন করিলাম,—"মা, আমাদের সকলের সংশোধনও ত দরকার। মা বলিলেন—"হ্যাঁ, কিন্তু বললে ত দেখা যায় অনেকের মন খারাপ হয়। এখন অনেক সময় মনে হয় কিছু না বলে এই শরীরটার উপর দিয়েই ত যাক্, বা এই শরীরটাই তোমাদের কাছ থেকে সরে পড়ুক।"

কল্যাণময়ী মায়ের আর-ও উপদেশ।

আবার বলিতেছেন,—"যা বলা হয় তাও ওদের মঙ্গলের জন্যই। অসন্তোষ বা রাগের কোন প্রশ্নই নেই। বেশ পরস্পর মিলে মিশে থাকা, সহ্যশক্তি বৃদ্ধি করা। উত্তেজিতভাবে কথা না বলা। এই পথে যখন এসেছ তখন সেই ভাব নিয়েই চলবার চেষ্টা করা।" মা'র এই-সব কথা শুনিয়া যাহাদের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহারা সকলেই অনুতপ্ত হইয়া মা'র চরণে ভাল হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

আজ শুইতে মা'র প্রায় রাত্রি ১॥৹টা বাজিয়া গেল।

১৩ই মে ১৯৫৭।

গতকাল রাত্রিতে ২॥০টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত মা প্যাণ্ডেলে কীর্তনের নিকটে বসিয়াছিলেন। বেশ সুন্দর নাম সারারাত্রি হইয়াছে। মা-ও মধ্যে মধ্যে যোগ দিয়াছেন। সকালে বম্বে হইতে ভাইয়া, কানিয়া, লীলা বেন, সুনয়না প্রভৃতি আসিয়াছে।

সৎসঙ্গ শেষ হইলে মা একবার চিনুভাইয়ের বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন। সেখানে নবচণ্ডী-পাঠ চলিতেছে।

আজ কয়দিন যাবৎ-ই মা'র পায়ে একটা ব্যথা চলিতেছে। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। তাহা নিয়াই ত মা এই ঘোরাঘুরি করিয়া চলিয়াছেন।

দিন-কয়েক পূর্বে মাকে চন্দ্রকান্ত শেঠের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে আজ মাকে দুপুরে সেই বাড়ীতে বিশ্রামের জন্য লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে গেল পরমানন্দ স্বামিজী, উর্মিলা এবং উষা।

সেখান হইতে প্রায় ৪টার সময় ফিরিয়া আসিয়াই মা সৎসঙ্গে গিয়া বসিলেন। সৎসঙ্গ সমাপ্ত হইলে মা, হরিবাবাজী প্রভৃতি সকলেই চিনু-ভাইয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। রাত্রিতে সৎসঙ্গের পরে জয়ন্তী-মহোৎসবের এবং বৃন্দাবনে ভাগবত-সপ্তাহের ফিল্ম সকলকে দেখান হইল। মা-ও প্রায় ১২টা পর্যন্ত প্যাণ্ডেলেই বসিয়া রহিলেন।

রাত্রিতে মা'র পরবর্তী প্রোগ্রাম স্থির হইল। মা ১৮ই এখান হইতে বম্বে যাইবেন। সেখানে দুই-তিন দিন থাকিয়া পুনা যাওয়া হইবে। লীলা বেন প্রভৃতি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, মা যেন কৃপা করিয়া আরও পাঁচ-সাত দিন থাকিয়া যান।

১৫ই মে ১৯৫৭।

আজ মা সকালে উঠিয়াই প্যাণ্ডেলে গিয়া বসিলেন। রাম-অর্চা শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ মা প্যাণ্ডেলে ছিলেন।

পুনরায় বিকালে ৪।৽টার সময় মা হরিবাবাজীর প্রোগ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া পরে মোটরে একটু বেড়াইয়া আসিলেন। আজিও ৯।৷৽টার পর জয়ন্তীর ফিল্ম দেখান হইল।

১৬ই মে ১৯৫৭।

আজ রাত্রিতে মায়ের জন্মতিথি পূজা। সকালে মা উঠিতেই শোভা মাকে বস্ত্র, মুকুট প্রভৃতি দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজাইল। বম্বে হইতে লীলা বেনও অনেক জরির মালা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছে। ঐ-সব মুকুট, জরির মালা এবং আরও ৮০ গজ লং-ক্লথ কাপড় মা আমাকে দিয়া রাসলীলার দলকে দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

আহমদাবাদে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা।

রাত্রিতে মৌন শেষ হইলে, সকলে মিলিয়া পূজার কাজে লাগিয়া গেল। বিশেষ করিয়া মধুকর ও শক্তি খুবই পরিশ্রম করিতে লাগিল। পূজার স্থান প্যাণ্ডেলের ভিতরেই হইতেছে, নতুবা এত লোকের বসিবার স্থান অন্য কোথাও হওয়া অসম্ভব। মা'র চৌকি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করিয়া ঠিক প্যাণ্ডেলের মধ্যে রাখা হইল। ফুলমালা, মখমলের উপর জরির কাজ-করা অতীব মূল্যবান্ চাদর প্রভৃতি দ্বারা মা'র চৌকি অপূর্ব সুন্দর করিয়া সাজান হইল। এক পাশে সাধু-সন্ন্যাসী-মহাত্মাদের বসিবার জন্য পৃথক্‌ভাবে তিনখানি চৌকির উপর গালিচা পাতিয়া আসন করা হইয়াছে। অপর পাশে

বেদপাঠীদের বসিবার স্থান। সম্মুখে পুরুষ এবং স্ত্রীদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুইটি স্থান সংরক্ষিত রাখা হইল। মধ্যে উভয় পার্শ্বে দড়ি বাঁধিয়া আসা-যাওয়ার জন্য রাস্তা রাখা হইয়াছে। সব-ভাবেই ব্যবস্থাটা বেশ ভাল হইয়াছে।

মা'র ঠিক চৌকির সম্মুখেই পূজার আয়োজন। দুই পার্শ্বে ত্রিপদীর উপরে ১২০ প্রকারের বিভিন্ন ফল এবং বিভিন্ন মিষ্টি রাখা হইয়াছে। আর পূজকের আসনের পার্শ্বে পূজার জন্য প্রচুর ফুল ও মালা। এইসব গুছাইয়া স্থির করিয়া নিতে নিতেই রাত্রি প্রায় ২॥০টা বাজিয়া গেল। রাত্রি ঠিক ৩টার সময় ঠাকুরভাই, মুকুন্দভাই, যোগীভাই এবং ভাইয়া মাকে পূজা-মণ্ডপে নিয়া আসিলেন। মুকুন্দভাই মাকে শুইয়া পড়িতে বলায় মা শুইয়া পড়িলেন। যোগীভাই মা'র জন্য একটি বহুমূল্য সিল্কের শাড়ী আনিয়াছিলেন। তাহা পরাইয়াই মাকে পূজা-মণ্ডপে আনা হইয়াছিল। এখানে লীলা এবং কুন্দন বেনও পছন্দ করিয়া খুব মূল্যবান্ একটি বেনারসী শাড়ী আনিয়াছে; তাহা মায়ের গায়ের উপরে চাদরের আকারে খুলিয়া দেওয়া হইল।

ব্রহ্মচারী কুসুম মায়ের পূজা আরম্ভ করিল। পূজকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই উপস্থিত মহিলাগণের উলুধ্বনিতে এবং শঙ্খনাদে বিশাল প্যাণ্ডেল মুখরিত হইয়া উঠিল। ধূপ-ধূনার সুগন্ধে সমগ্র পরিবেশটি আমোদিত। প্রায় পাঁচ শতাধিক নরনারী মায়ের শুভ তিথি-পূজা দেখিবার জন্য ভক্তিভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে। অদূরে ভক্তগণের কণ্ঠে মধুর-স্বরে ধ্বনিত হইতেছে 'মা মা' নাম-কীর্তন। কী যে অপূর্ব এক আনন্দ-ভাবলোকের সৃষ্টি সর্বসমন্বয়ে হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীহরিবাবাজী, যোগেশ ব্রহ্মচারিজী, মাধবানন্দ স্বামিজী প্রভৃতি অনেক মহাত্মা আপন আপন আসনে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। সকলকেই ললাটে চন্দন এবং গলায় মালা দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে।

পূজা আরম্ভ হইয়াছে। পবিত্র তীর্থবারি দ্বারা মায়ের চরণ দু'খানি

ধোয়াইয়া, পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করা হইল। যথাবিধানে ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া মায়ের চতুর্দিকে ১০৮ পদ্মের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। পরে ভোগ-আদি নিবেদন করিয়া আরতি সমাপ্ত করিতেই ৫টা বাজিয়া গেল। অতঃপর উপস্থিত সকলে একে একে শৃঙ্খলার সহিত মাকে প্রণাম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরভাই, চিনুভাই, মুকুন্দভাই প্রভৃতি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রণাম শেষ হইতে প্রায় ৬৷৷০টা বাজিয়া গেল।

ধীরে ধীরে মাকে মণ্ডপ হইতে উঠাইয়া নিজের ঘরে আনিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। মা'র তখন অপূর্ব এক ভাববিহ্বলতা। দু'নয়নে আবেশ, বদনে এক অপূর্ব স্বর্গীয় দীপ্তি। মা যে আমাদেরই, এই মর্ত্যদেহধারী, ইহা কোনক্রমেই তখন বিশ্বাস করিতে পারা যাইতেছিল না। মনে হইতেছিল যেন কোন এক দিব্যধাম হইতে করুণাঘন এক দেবীমূর্তি এই মর্ত্যলোকে সদ্য আবির্ভূতা হইয়াছেন।

কোন প্রকারে মা'র সেই ভাববিবশ দেহকে ধরিয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। আমরা সন্তর্পণে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

১৭ই মে ১৯৫৭।

আজ মা প্রায় ১০টায় উঠিলেন। কিন্তু তখনো যেন স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন নাই। তবুও হাত-মুখ ধোয়াইয়া সামান্য একটু কিছু দিয়া দেওয়া হইল। মা ধীরে ধীরে গিয়া রাসলীলার নিকট বসিলেন। আজ রাসলীলা বিদায় হইবে। দক্ষিণা, বস্ত্র, মালা প্রভৃতি আমি তাঁহাদিগকে দিলাম।

প্রায় ১১৷৷০টায় মা প্যাণ্ডেল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মা আসিলে

রাজা প্রতাপসিংজী মা'র পূজা করিলেন। বৈকালে ভাইয়া এবং লীলা মা'র পূজা করিল। তাহারা আজ রাত্রেই বম্বে চলিয়া যাইবে।

মৈনপুরী হইতে নাগেশ্বরীপ্রসাদজী ও তাঁহার স্ত্রী সুশীলা আসিয়াছেন। সুশীলা মাকে স্বপ্নে শিবের বেশে দর্শন করিয়াছেন। তাই তিনি আজ মাকে ত্রিশূল, ডম্বরু, কুণ্ডল, মস্তকে অর্ধচন্দ্র, বাঘাম্বর, বসিবার মৃগচর্ম এবং রূপার খড়্গ ইত্যাদি দিয়া শিবরূপে সাজাইয়াছেন। মাকে শিবরূপে দর্শন করিবার পর হইতেই এই বাসনা তাঁহার দীর্ঘ দিনের। আজ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সাজান সম্পূর্ণ হইলে মা বলিলেন,—"তোমাদের বহুরূপী সাজান শেষ হ'ল?" বলিয়াই নিজেই সব খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বৈকালেও মা প্রায় যাবতীয় প্রোগ্রামেই যোগদান করিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঠাকুরভাই আজ মাকে চন্দোলী সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীশ্রীবিদ্যানন্দ স্বামিজীর সহিত দেখা হইল। মা'র সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। স্বামিজীর বয়স হইয়াছে, শরীরও তেমন ভাল নয়। কিন্তু তথাপি গতকল্য বৈকালে কান্তিভাইয়ের বাসায় সৎসঙ্গে আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে শ্রীহরিবাবাজীর সৎসঙ্গ যথারীতি হইল। মা-ও উপস্থিত ছিলেন। মৌনের পর শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারিজীর অনুরোধে মা একটু কীর্তনও করিলেন।

আগামী কল্য মা'র এখান হইতে চলিয়া যাইবার কথা। আজই অনেকে মা'র নিকট বিদায় লইয়া গেল। মা-ও তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন।

১৮ই মে ১৯৫৭।

আজ আহমদাবাদ উৎসবের শেষ দিন। কান্তিভাইয়ের বাসায় সকলেই দুঃখিত-চিত্ত—মা আজই চলিয়া যাইতেছেন। কান্তিভাই-ই ছিলেন এই

উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা, অথচ কার্যোপলক্ষে তিনিই অনুপস্থিত। তিনি ভারতের বাহিরে। আমরাও তাঁহার অনুপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে সর্বদাই অনুভব করিয়াছি। অবশ্য তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, ঠাকুরভাই, কন্যা বীণা, কান্তিভাইয়ের স্ত্রী কুন্দন, কন্যা ঊর্মিলা, জামাতা মধুকান্ত প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বেশ সুব্যবস্থাই করিয়াছে। তাহাদের আতিথেয়তায় সমাগত সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

আহমদাবাদে উৎসবের পরিসমাপ্তি ও শ্রীশ্রীমায়ের আহমদাবাদ ত্যাগ।

হরিবাবাজী আজ রাত্রে দ্বারকা রওনা হইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে মাত্র দুই-তিন জন। পথে ব্যবস্থা করিবার জন্য মা ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। সে রাজকোট পর্যন্ত গিয়া বাবাকে গাড়ীতে উঠাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার পার্টির অন্যান্য সকলে এবং রাসলীলামণ্ডলী বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেল।

আশ্রমের ব্রহ্মচারী কয়েকজনকে—কুসুম, ভরদ্বাজ, গৌরাঙ্গ, হরপ্রসাদ ও কান্তিভাইকে—মা স্থানীয় উৎকণ্ঠেশ্বরের মন্দিরে গিয়া কিছুদিন সাধন-ভজন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। উৎকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির, এখান হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে। কান্তিভাইয়ের সাহায্যেই সেখানে একটি আশ্রম নির্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী কমলও কিছুদিন সেখানে মা'র নির্দেশে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিল। কান্তিভাইয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মা এবং সকলকে উৎসবের পরে একবার সেখানে লইয়া গিয়া কিছুদিন রাখেন। কিন্তু এবার সে সুযোগ হইল না—কারণ তিনি রহিয়াছেন ভারতের বাহিরে। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে কান্তিভাই ফিরিয়া আসেন তবে হয়ত একবার মা ওখানে যাইতেও পারেন। যাহা হউক, মা'র ত এখন যাওয়া হইল না, তাই ব্রহ্মচারী কয়জনকে এখানেই রাখিয়া যাওয়া স্থির হইল।

যাহা হউক, এখানে আনন্দমেলার এবার পরিসমাপ্তি ঘটিল। মা রাত্রি ৯-৪০টায় গুজরাট মেলে বম্বে রওনা হইয়া গেলেন। কান্তিভাইয়ের

উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন সকলে, মুকুন্দভাই, চিনুভাই, অজিতভাই প্রভৃতি শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ মাকে উঠাইয়া দিতে স্টেশনে আসিলেন। গাড়ীর গার্ডের সিটি বাজিয়া উঠিল, অশ্রুছলছল চোখে সমস্ত স্টেশনখানি মায়ের কামরার দিকে অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল—রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে গাড়ীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

দিদিমা, আমি, পরমানন্দ স্বামী, নারায়ণ স্বামী, বুনি, উদাস, বিমলা, সতী, বুবা, নীলিমা, মিস্ পাঠক প্রভৃতি আমরা অনেকেই মা'র সঙ্গে চলিয়াছি। যোগীভাই সোলন যাইতেছেন, তিনি বরোদা স্টেশন পর্যন্ত মা'র গাড়ীতে আসিয়া সেখানে নামিয়া গেলেন। পানুও দিল্লী হইয়া কলিকাতা যাইতেছে। সেও বরোদা স্টেশনে নামিয়া গেল।

১৯শে মে ১৯৫৭।

বম্বেতে মা।

সকাল প্রায় ৮টায় আমরা বম্বেতে আসিয়া পৌঁছিলাম। মাকে নিয়া যাইবার জন্য বম্বে স্টেশনে সপরিবারে ভাইয়া, কানিয়াভাই, মুলজীভাই, সস্ত্রীক সুপারী সাহেব, জীতেন দত্ত প্রভৃতি বহু লোক, মোটর লইয়া উপস্থিত দেখিলাম। মাকে স্টেশন হইতে সোজা ভাইয়ার বাসায় লইয়া যাওয়া হইল; আমরা আশ্রমের কয়েকজনও ভাইয়ার বাসাতেই রহিলাম। অন্যান্য সকলের জন্য একটি পৃথক্ বাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসেও মা আসিয়া নূতন মন্দিরে থাকিয়া গিয়াছেন। মা আসিয়াই বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল ৫॥০টার পর কিছুক্ষণ মা'র ঘরের সম্মুখে কিছু সময় রামচরিত-

মানস ও মা'র উপদেশ-সংগ্রহ পাঠ করা হইল। পাঠের পরে মা একটু বেড়াইয়া আসিলেন।

অনেকদিন হইতেই কথা হইতেছিল যে জন্মোৎসবের পর মাকে কোনও একান্ত স্থানে কিছুদিন রাখার চেষ্টা করা হইবে। ভাইয়া আমাকেও কয়েকবার মাকে লইয়া পুনা যাইয়া থাকিবার কথা গত বৎসরও বলিয়াছে। মা গিয়া এখন কিছুদিন পুনাতে থাকুন, ভাইয়া মা'র নিকট সেই প্রার্থনা করিয়াছে। পুনাতে ভাইয়ার বিশিষ্ট বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভুতা সাহেবের নূতন একখানা বাড়ীও আছে। সেখানেই মাকে রাখিবার কথা হইয়াছে। মা'র থাকিবার জন্য কি কি ব্যবস্থার দরকার তাহা দেখিবার জন্য আজ দুপুরেই পরমানন্দ স্বামী এবং কানিয়াভাই পুনা রওনা হইয়া গেলেন। আগামী কালই ফিরিয়া আসিবার কথা।

২০শে মে ১৯৫৭।

মায়ের পায়ের হাঁটুর পিছনে একটি cyst-এর মত হইয়াছে। উহাতে খুবই ব্যথা এবং চলাফেরা করিতে খুবই অসুবিধা হইতেছে। আজ ভাইয়ার ইচ্ছামত নানাবতী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ শেঠকে দিয়া মা'র পাটি দেখান হইল। তিনি দেখিয়া বলিলেন যে চিন্তার কোন কারণ নাই। মা দিন-কয়েক বিশ্রাম করিলেই উহা ভাল হইয়া যাইবে।

সকালে মা'র ঘরের সম্মুখে সমবেতভাবে গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি পাঠ হইতেছে। এমন সময় পরমানন্দ স্বামী আসিয়া উপস্থিত। তিনি পুনা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত ভুতা সাহেবের বাড়ীটি অপূর্ব সুন্দর। স্থানটিও খুবই একান্ত। তবে ভুতা সাহেব কয়েকদিন ঐ বাড়ীতে বাস করিয়াছেন, তাই মূল বাড়ীতে মা'র থাকা হইবে না।

সম্মুখের মোটর গ্যারেজে মা'র থাকিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। মা'র জন্য যাহা-কিছু করিতে হইবে স্বামিজী তাহার নির্দেশ দিয়া আসিয়াছেন। নূতন একটি পায়খানা, বাথরুম ও রান্নাঘর বানাইতে হইবে। উহা তৈয়ারী হইতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগিবে। কাজেই এই চার-পাঁচ দিন মা এখানেই বিশ্রাম করিবেন।

মা আজকাল এখানে বেশ বিশ্রামেই আছেন। আপন ইচ্ছামত চলা-ফেরা করেন,—প্রোগ্রামের কোন বাঁধাবাঁধি নাই।

একদিন সুভাষচন্দ্রের ছোট ভাই সস্ত্রীক মা'র দর্শনের জন্য আসিলেন। পূর্বে তিনি আহমদাবাদে কোনও একটি মিলে কাজ করিতেন। বর্তমানে বম্বেতে বিজলীর তার তৈয়ারী করিবার একটি নূতন কারখানা খুলিয়াছেন বলিলেন। ইহার পরে আবার একদিন আসিয়া মাকে কারখানা দেখাইতে লইয়া গেলেন। মা'র সঙ্গে আমরাও কয়েকজন গেলাম। দেখিলাম, বাহির হইতে তার আনিয়া এখানে রবার জড়াইয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। কারখানার মধ্যেই মাকে বসাইয়া পূজা করা হইল। কারখানার লোকেরা এক এক করিয়া মাকে প্রণাম করিতে লাগিল। মা-ও তাহাদের মধ্যে ফল আদি বিতরণ করিয়া দিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ভক্ত-গণের মায়ের নিকট আগমন।

প্রত্যহ বৈকালে জিতেন দত্ত সপরিবারে, সুপারী সাহেব সস্ত্রীক, ধীরেন বাবু প্রভৃতি মা'র দর্শনের জন্য আসেন। জিতেন দত্ত আজকাল বম্বেতে ভারত সরকারের Tariff Commission-এর সভ্য। এখন চার-পাঁচ বৎসর বম্বেতেই থাকার কথা। সুপারী সাহেবও ভারতের সর্বপ্রধান সিমেণ্ট কারবারী Associated Cement Company-র Deputy General Manager পদে গত কয়েক বৎসর যাবৎ-ই কাজ করিতেছেন।

একদিন জয়পুর হইতে একটি কাশ্মীরী মহিলা মা'কে তাঁহার স্বপ্নের

বৃত্তান্ত শুনাইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, মা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন,—“তুমি আমাকে প্রণাম কর।” তিনি মায়ের কথা-মত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, মা তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিলেন। সেই অবধি ভদ্রমহিলা সেই মন্ত্রই জপ করিয়া আসিতেছেন। আমরা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই খুবই অবাক্ হইয়া গেলাম এবং ঐ ভদ্র-মহিলাটির অপূর্ব সৌভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কত শত শত লোক মা'র নিকট দীক্ষা-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিন্তু মা সাধারণ-ভাবে কাহাকেও কখনও দীক্ষা দেন না। তাই সকলে নিরাশ হইয়া যায়; আর এইরূপ অযাচিতভাবে কত ভাগ্যবান্ স্ত্রী-পুরুষ মা'র কৃপা লাভ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে রাখিবে।

একটি ঘটনা।

২৪শে মে ১৯৫৭।

আজ আমরা প্রায় বেলা ৩টায় পুনা রওনা হইলাম। আমরা মাকে লইয়া মোটরে রওনা হইলাম। আর সঙ্গীয় সকলে ট্রেনে রওনা হইয়া গেল। মা'র জন্য একটি air conditioned মোটর ঠিক করা হইয়াছে। বম্বে হইতে পুনা মোটরপথে প্রায় ১২০ মাইল। কিছুটা পাহাড়ী পথও আছে। পুনা গিয়া পৌঁছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা ৬॥০টা বাজিয়া গেল।

পুনাতে মা।

শ্রীভুতা সাহেবের বাড়ীটি পুনার প্রসিদ্ধ গণেশ খিন্দ রোডের উপর অবস্থিত। নিকটে বৃটিশ-যুগের সমস্ত I.C.S. Officerদের কলোনী। Governor House-ও সন্নিকটেই। ভুতা সাহেব ও কানিয়াভাই মাকে স্বাগত করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। যাহারা রেলে আসিয়াছে, দেখিলাম তাহারা পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছে।

একটি বড় বটগাছের নীচে, মোটর গ্যারেজে মা'র থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘরটি এমন সুন্দরভাবে রং ইত্যাদি করিয়া সাজান হইয়াছে যে গ্যারেজ বলিয়া আর চিনিবার উপায় নাই। ঘরের দুই দিকে দুইটি জানালা তৈয়ারী করাইয়া পর্দা টানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার পাশেই মায়ের রান্নাঘর এবং বাথরুম। দূরে পৃথক্ বাথরুম ও পায়খানাও আছে। আমরা রান্নাঘরের সংলগ্ন বাথরুমটিকেই মা'র ভোগের ঘর হিসাবে ব্যবহার করিব স্থির করিয়া নিলাম।

শ্রীযুক্ত ভুতা সাহেবের বাড়ীটি দেখিলাম একেবারে ছবির মত সাজান—আধুনিক ফ্যাসানের আসবাবপত্রে ভরা। ঐ বাড়ীতেই আমার দিদিমা এবং কয়েকটি মেয়েকে লইয়া থাকা স্থির হইল। অন্যান্য সকলের কিছু দূরে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। ঐ বাড়ীটি শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জি মহাশয়ের। তিনি Hindusthan Construction Company-র ডিরেক্টর।

২৬শে মে ১৯৫৭।

আজ সন্ধ্যার সময় মা সম্মুখের লনে পদচারণা করিতেছেন, এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"কোহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়া ঢুকিব কিনা তাই ভাবিয়া বাহিরে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম।" মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"এই শরীরটার কাছে আসবার হলে কোনও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই বাবা। সকলেই আসতে পারে।"

তিনি বলিলেন যে, মা'র সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলাম যে মা কোথায় আছেন তিনি জানেন কিনা?

তাঁহার নিকট শুনিলাম আমাদের বাসার খুব কাছেই দিলীপ রায় আছেন। কানিয়াভাইয়ের শ্বশুর স্তর চুণীলাল মেহতার বাড়িতেই বর্তমানে তিনি আছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কানিয়াভাইয়ের নিকট হইতে তিনি অবশ্যই সংবাদ পাইয়াছেন। কিন্তু এখন জানা গেল তিনি মা'র সংবাদ পান নাই। তাই আমি ধীরেনবাবু ও তপন এই দুইজনকে তৎক্ষণাৎ দিলীপ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

শুনিলাম তিনি নাকি প্রত্যহই সন্ধ্যা ৭টা হইতে এক ঘণ্টা ভজন করেন। সেই সময় স্থানীয় অনেকেই উহাতে যোগদান করেন। ধীরেনদা ও তপন ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম যে তিনি যখন ভজনে বসিতে যাইতেছিলেন এমন সময় তাহারা গিয়া মা'র আগমনবার্তা জানাইয়াছেন। ভুতা সাহেবও নাকি তাঁহার বিশেষ পরিচিত। যদি সময় পান তবে আজ রাত্রেই মা'র সঙ্গে আসিয়া দেখা করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা রাত্রিতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম কিন্তু তিনি আসিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নাম জানা নাই, এমন শিক্ষিত লোক বোধ হয় আজ ভারতে নাই। বিদেশেও বহু স্থানেই তিনি বহু লোকের নিকট পরিচিত। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তিনি বহুদিন ছিলেন। বর্তমানে কিছুদিন যাবৎ তিনি পুনাতে আছেন। ইতিপূর্বেও তিনি বহুবার আসিয়া মাকে ভজন শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভজন-সঙ্গীত আশ্চর্যরকম সুন্দর ও ভাবময়।

২৭শে মে ১৯৫৭।

আজ সকালে ১১টার পর আমরা কয়েকজন মা'র ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার তাঁহার কয়েকজন ভক্ত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া

মা'র দর্শনের জন্য আসিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন। মস্তকে পীত রংয়ের টুপি। একখানা সিল্কের নামাবলী গায়ে জড়ান। কপালে নূতন ধরনের তিলক। সৌম্য-প্রসন্ন মূর্তি। এবার বেশ কয়েক বৎসর পরে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই দেখিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দিলীপকুমার রায় এবং ইন্দিরা দেবী।

তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরাও আসিয়াছেন। দিলীপকুমারই মা'র সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। —"মা, ইনি আপনার দেরাদুনের ভক্ত কৃপারামজীর কন্যা। ইনি আমার এখানেই থাকেন। প্রকৃত নাম জনককুমারী। আমি নাম রাখিয়াছি ইন্দিরা। ইহার দুইটি সন্তান। বড়টি বম্বেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে। আর ছোট ছেলেটি মা'র নিকটে থাকিয়াই লেখা-পড়া করে। ইহার স্বামীও ইঞ্জিনিয়ার। মধ্যে মধ্যে এখানে আশ্রমে আসেন।"

শ্রীমতী ইন্দিরার নাম আমরা ইতিপূর্বেও শুনিয়াছি। তাঁহার পরিধানে পীত রংয়ের শাড়ী। সর্বদাই মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। তিনিও মা'র নিকট নত হইয়া প্রণাম করিয়া মা'র পায়ের কাছে বসিলেন।

দিলীপকুমার মাকে বলিলেন,—"মা, আমাদের ওখানে আপনার একদিন যেতে হবে।"

মা—"বাবা, তুমি-ত জানই যে অনেকদিন হয় এ শরীরটা কোন গৃহস্থ-বাড়ী যায় না।"

দিলীপকুমার—"মা, ওখানে বিগ্রহ আছেন। সেখানে যেতে দোষ কি?"

মা—"বাবা, দোষ তো কিছু নেই। কিন্তু অনেকদিন হয় এই শরীরের এইরকমই চলে আসছে। সকলেই জানে।"

গৃহস্থ-বাড়ী শুনিয়া ইন্দিরার বোধ হয় মনে আঘাত লাগিল। তিনি দিলীপকুমারকে ইংরাজিতে বলিয়া উঠিলেন,—"দাদা, ওটা তো গৃহস্থের বাড়ী না। আপনিও ওখানে থাকেন।"

মা কথার ভাব বুঝিয়া দিলীপকুমারকে বলিলেন—"বাবা, এখন এখানে গৃহস্থ না বাস করতে পারেন, কিন্তু আগে তো ওখানে কেউ ছিল। আবার তুমি ওখান থেকে চলে গেলে কেউ বাস করবে।" একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন,—"তবে আজকাল মাঝে মাঝে এমন হয় যে, আগে হয়ত কোন গৃহস্থের বাড়ী ছিল, কিন্তু পরে সেখানে কোনও মন্দির কি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সেখানে যদি কেউ আর গৃহস্থভাবে ভবিষ্যতে বাস না করে তবে এ শরীরটাকে সেখানে নিয়ে যায় অনেক সময়।"

দিলীপবাবু আপত্তির সুরে বলিলেন,—"আমি কিন্তু কলকাতায় আপনাকে গৃহস্থের বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"না, বাবা, কলকাতায় এমন বাড়ী আছে যেখানে তারা আদর করে এই শরীরটার জন্য পৃথক্ ঘর বানিয়ে রেখেছে। সেই ঘরে গৃহস্থভাবে কেউ কখনো থাকে না, আর সেই ঘরে যেতে হলে বাড়ীর মধ্য দিয়েও যেতে হয় না। এইরকম কোন বাড়ীতেই তুমি আমাকে দেখেছ বাবা।"

এইরূপ আরো দুই-চারিটি কথা হইলে এই প্রসঙ্গ চাপা পড়িল। মা তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবা, তোমার এমন সুন্দর গলা। আমাদের একটু গান শোনাবে না?"

দিলীপকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আজকাল বিগ্রহের সম্মুখে ভিন্ন বিশেষ কোথাও গান করেন না। কিন্তু মা নিজে তাঁহাকে গান করিতে বলিয়াছেন, তাই শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাদের নিত্যকার ভজন আজ সন্ধ্যার সময় মায়ের সম্মুখেই হইবে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে দিলীপকুমারের বাসায় গাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

তিনি আসিয়া ঠিক ৭॥৹টার সময় ভজন সুরু করিলেন। প্রথমে গুরু-প্রণাম করিয়া নির্বাণাষ্টক স্তোত্র ও ভবান্যষ্টক স্তব অতি সুললিত কণ্ঠে গান করিয়া শুনাইলেন। তাহার পরে তাঁহার স্বরচিত অতি সুন্দর কৃষ্ণলীলা-সঙ্গীত গান করিলেন। মৌনের ঠিক পূর্বে ভজন শেষ করিয়া মায়ের পায়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন। বালসুলভভাবে বলিলেন,—"এই সময়টুকু মায়ের পায়ের কাছেই একটু বসি।"

মৌনের পরে তিনি ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের দেখাইয়া মাকে বলিলেন—"এঁরা সব ইন্দিরার শিষ্য। ইন্দিরার সঙ্গেই এঁরা ভজন করেন।"

তাঁহাদের পুনরায় মোটরেই পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। দিলীপকুমারের ব্যবহারে সকলেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হইল।

৩১শে মে ১৯৫৭।

আজ বৈকালে মা লনে'র উপর বেড়াইতেছেন। সাঙলীর রাজা সাহেব সস্ত্রীক আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তিনি পূর্বেও মাকে দর্শন করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরে বসিয়া কথাবার্তা হইতেছে। যোগীভাই নর্মদা হইতে কয়েকটি শিবলিঙ্গ আনাইয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে একটি হরিদ্বার শিবমন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনটি শিবলিঙ্গ গত বৎসর বৃন্দাবনে স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক সূক্ষ্মদেহধারী মহাত্মার কথাও উঠিল। তিনি, মা যখন দক্ষিণে ছিলেন তখন রামেশ্বরে আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এবং পরে দ্বারকায় তাঁহার মহামিলন ঘটিয়াছে।

এই-সব কথা হইতেছে এমন সময়ে তার আসিয়া পৌঁছিল যে যোগী-

ভাইয়ের বিমাতা সোলনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা শুনিয়া বলিলেন,—"দেখ দিদি, ঐ যে সূক্ষ্মশরীরধারী মহাত্মার সঙ্গে দক্ষিণ-যাত্রার সময় দেখা হইয়াছিল, সে ছিল চিদাম্বরম্ মন্দিরের পূজারীর ছেলে। যোগীভাইয়ের ১৫।১৬ পুরুষ পূর্বে নাকি কেউ ঐ পূজারীর বংশে জন্ম নিয়েছিল।"

এক সূক্ষ্মদেহধারী মহাত্মার কথা।

মা এইটুকু বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন। আমার মনে হইল, কে জানে ঐ সূক্ষ্মদেহী মহাত্মার সঙ্গে যোগীভাইয়ের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না। মা-ও সব সময় সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। সময় হইলে হয়ত আবার কথা প্রকাশও হইয়া যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে আর একদিন মা শুইয়া আছেন, আমি নিকটেই বসিয়া মাকে হাওয়া করিতেছি, মা একটু চোখ খুলিয়া আমাকে বলিতেছেন,—"দেখ দিদি, দেখা যাচ্ছে খুব বড় একটা জায়গা। সেখানে অনেকগুলি ঘর। ঐসব ঘরগুলিতে অসুখ হয়ে লোকেরা থাকে। মাঝখানে খুব বড় একটা হল-ঘর যেন বানান হবে, তাই পরমানন্দকে ডেকে পাঠান হ'ল। পরমানন্দ একটা খাতা হাতে করে এসে হাজির।" এইটুকু বলিয়াই মা চুপ করিলেন। আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবটা রহস্যই রহিয়া গেল।

আর একদিন মা চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে অনেকেই আছেন। কানিয়াভাই মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"মা, গৃহস্থাশ্রমে কিভাবে সংসারযাত্রা পালন করা উচিত?"

মা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"এক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অভাবেই আর সমস্ত আশ্রমগুলির নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয় না। বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ী করা চলে না। আশ্রম মানে যেখানে শ্রম নেই। আবার ভগবান্‌কে বাদ দিলে সবই ত শ্রম। বিশ্রাম তবে কোথায়? গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি তদ্‌জ্ঞানে সেবা করা যায় তবে ঠিক ঠিক আশ্রম-বাস

গৃহস্থ আশ্রমে কি ভাবে সংসারযাত্রা পালন করা উচিত।

হয়। পতিকে পরম পতি জ্ঞানে সেবা, পুত্রকে বালগোপাল জ্ঞানে সেবা, স্ত্রীকে মহামায়ার অংশভাবে সেবা। তোমরাই ত বলে থাক,— 'যত্র জীব, তত্র শিব'। 'যত্র নারী তত্র গৌরী'। চাই এই সংসারের মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকা। মালিক হলেই যত গণ্ডগোল। মালী হ'তে পারলে আর কোনই ঝগড়া নেই। ব্যস! তেমনই এই সংসারটা ভগবানের। আমি সেবক মাত্র। তাঁহার নির্দেশমত আমি শুধু সেবা করে যাব। এই ভাবটা সর্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমেও থাকা যায় তবু আর কোন নূতন বন্ধন সৃষ্ট হয় না। কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে যাওয়া মাত্র। এই কথা সব সময় মনে রেখে যদি সংসার করা যায়, তবে আর ভয় কি? তিনিই সব ঠিক করে নেবেন।"

২রা জুন ১৯৫৭।

আজ সকালে পাঠ সমাপ্ত হইলে পরে তপন মাকে জিজ্ঞাসা করিল,— "মা, আমাদের কল্যাণ কিসে হবে? এমন কিছু বলুন।"

মা বলিলেন,—"নিজেকে জানতে চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। নিজেকে জানাই ভগবান্‌কে জানা। আর ভগবানকে জানা মানেই নিজেকে জানা। ভগবান্‌কে না পাওয়া পর্যন্ত দুঃখ যায় না। ভগবান্‌কে পেতে হলে কেবল তাঁর জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজা, তাঁর নাম কীর্তন, এ ছাড়া আর কল্যাণের কোনও পথ নাই। সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠও এই পথের অনুকূল। আর এই শরীর প্রায়ই একটা কথা বলে থাকে, বিষয় মানে বিষ হয়। বিষয়-ভোগে ধীরে ধীরে মৃত্যু— slow poison যাকে বল। আর কিনা Return Ticket কিনে ফিরে

কল্যাণের পথে।

আসার ব্যবস্থা করে রাখা। তাই এই শরীর সব সময়ই বলে যে যত বেশী সময় তাঁকে নিয়ে থাকতে পার তার চেষ্টা। সময় ত চলে যাচ্ছে।"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার, ইন্দিরা দেবী ও একজন মিলিটারী অফিসার সস্ত্রীক আসিয়া মা'র নিকটে বসিলেন। আজ দিলীপকুমার ও তাঁহার সঙ্গীয় কয়েকজনকে এখানে প্রসাদ পাইবার কথা বলা হইয়াছিল।

ভোজন করিতে বসিয়া বহুদিন পরে নানা প্রকার বাঙ্গালী ব্যঞ্জনাদি খাইয়া দিলীপকুমার খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সকলে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

মা'র আগমন-সংবাদ এই কয়দিনে এখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটি দলে দলে মা'র দর্শনের জন্য আসিতেছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক পূর্বপরিচিতও বাহির হইতেছে। কলিকাতার হেরম্ব ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা গীতা স্বামীকে লইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার ডাক্তার সুধীন মজুমদারের বোন কল্যাণীও সপরিবারে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছে।

৩রা জুন ১৯৫৭।

আজকাল একটি কথা প্রায়ই মা'র মুখ হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আজও কি কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"দুর্লভ মানুষ-জন্ম পেয়েছ, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছ-পালা, পশু-পাখী কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নতুন গাছ-পালা, পশু-পাখী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি কেবল তাই করলে তবে আর প্রভেদ রইল কি? যাতে আর Return Ticket কাটতে

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম।

না হয় তার জন্য চেষ্টা কর সকলে। কিছুর অপেক্ষা রেখে সুখ,—তার অভাব হলেই দুঃখ। জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী। এই যে সুখ তাও এই আছে এই নাই। নিত্য-সুখ অনন্ত সুখ পেতে হলে নিত্য-বস্তুকে লাভ করতে হবে।"

আজকাল মা অনেককেই সংযম পালন করিতে বলিয়া থাকেন। মা বলেন যে সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন, না পারিলে অন্ততঃ মাসে একটি দিন সংযতভাবে জীবন-যাপন করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। আশ্রমেও ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ মাসে এক এক সপ্তাহ করিয়া মৌন থাকিয়া সংযমের নিয়ম পালন করিতেছে। আবার কেহ কেহ এক মাস করিয়া সংযম পালন করিতেছে। পরমানন্দ স্বামী ত গত জন্ম উৎসবের সময় হইতেই সংযমের আহারের নিয়ম পালন করিতেছে। দিনে মাত্র একবার বিনা নুনের সিদ্ধভাত এবং রাত্রে একটু দুধ। সমস্ত দিনে আর কিছুই খান না। স্বামিজী এইভাবে বৃদ্ধ বয়সেও নিজে সংযম পালন করিয়া অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন।

ইহা ছাড়া মা যেখানে যেখানে যান সেখানেও আজকাল প্রায়ই অখণ্ডভাবে ১২ কিংবা ২৪ ঘণ্টা জপের আয়োজন করা হয়। মা সর্বদাই বলেন,—"তাঁকে নিয়ে থাকবার চেষ্টা। বৃথা সময় যেন না যায়।"

৫ই জুন ১৯৫৭।

মা'র নির্দেশমত আজকাল নারায়ণ স্বামিজী এখানে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। আজ দুই-তিন দিন হয় শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-লীলা পাঠ হইতেছে।

মা বোধ হয় সেই কথা খেয়াল করিয়াই বলিতেছেন,—"রামচন্দ্রের জন্ম

হ'ল। পার ত তোমরা এখানে অখণ্ড রামায়ণ-পাঠ লাগিয়ে দিতে পার।" দেরাদুনের লক্ষ্মীজী আমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি ত এই কথা শুনিয়া খুবই উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, কবে হইতে সুরু হইবে?"

মা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"যো কাল করো সো আজ করো, আউর যো আজ করোগে সো অভী করো।" একটু পরেই আবার বলিলেন,—"যদি সম্ভব হয় তবে এই ১২টা থেকেই আরম্ভ করো না।"

তখন ১১৷৷৹টা প্রায় বাজে। কে আরম্ভ করিবে কথা হওয়ায় নারায়ণ স্বামী বলিলেন যে, তিনি তখনও কিছু খান নাই, তাই মা'র অনুমতি হইলে তিনি আরম্ভ করিতে পারেন।

মা বলিলেন,—"বেশ ত। নারায়ণ আরম্ভ করে দিক্। তারপর তোমরা সকলে মিলে ভাল করে পাঠ কর।"

মা'র কাজ এইভাবে হইয়া যায় সর্বদাই দেখিয়াছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেল। পাঠের স্থান ঠিক হইয়া গেল। কে কে পাঠ করিবে তাহার লিষ্টও তৈয়ার হইয়া গেল। ঠিক ১২টার সময় নারায়ণ স্বামী বিধিমত ভোগ আরতি করিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

৬ই জুন ১৯৫৭।

আজ বৈকালে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী দুই জনেই বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে হাসিয়া বলিতেছেন,—"দিদি, আপনি ত আমার জপের মালা হয়ে রইলেন। আজ দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য কত জিনিস তৈয়ারী করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ-সব কি সহজে ভুলতে পারা যাবে?" আজ দ্বিপ্রহরে মালপোয়া, পায়স প্রভৃতি কয়েক প্রকারের মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়া-

ছিলাম। সেই কথাই তিনি বলিলেন। আজ সন্ধ্যায় মাকে লইয়া আমাদের তাঁহার ওখানে যাইবার কথা হইয়াছে, পুনরায় তাহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা ঠিক ৭॥০টার সময় মাকে লইয়া আমরা অনেকেই গেলাম। দেখিলাম বাড়ীর বাহিরে সিঁড়ির উপরে মা'র জন্য স্বতন্ত্র আসন পাতা হইয়াছে। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোকদের তিনি মা'র দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাধু টি. এল. ভাস্বানীর আসিবার কথা ছিল। কিন্তু শরীর ভাল না বলিয়া শেষ পর্যন্ত আসিতে পারিলেন না। সাধু ভাস্বানী পূর্বেও মাকে কাশীতে নাকি দেখিয়াছেন। এই অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যত্রও তাঁহার খুব নাম।

ভাস্বানীজীর অপেক্ষায় প্রোগ্রাম আরম্ভ করিতে বোধ হয় একটু দেরী হইয়া গেল। পরে ইন্দিরা দেবী আসিয়া বসিলে দিলীপকুমার ভজন আরম্ভ করিলেন। গুরু-প্রণাম করিয়া প্রথমে কৃষ্ণের একটি সঙ্গীত, তাহার পর শিবের এবং আবার একটি কৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিয়া ইন্দিরা দেবী-রচিত একটি হিন্দী ভজন গাহিলেন। দিলীপকুমার পরে তাহা বাঙলায় অনুবাদ করিয়াও গাহিলেন। যেমন ভাষা, ভাব, তেমনই সুর, তাল, ইহার তুলনা হয় না। পরে পাঁচ মিনিট নাম-কীর্তন করিয়া ঠাকুরের আরতি হইল।

ইহার পর দিলীপকুমার মা'র বিষয়ে সকলের সমক্ষে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন ইংরাজীতে। তিনি বলিলেন, মা আজ ভারতে

দিলীপ রায়ের শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ।

এবং ভারতের বাহিরেও বহু স্থানে সুপরিচিতা। তাঁহার চরণে আশ্রয় নিয়া বহু নরনারী শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন। গত ১৯২৪ সনে যখন তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের নিকট যান, তখনই তাঁহার মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে সাধন-ভজন করিয়া উচ্চ স্তর লাভ করিয়া অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই আনন্দ অপরকে দিতে পারেন না। সেই শান্তি অপরকে দান করিতে পারেন না।

যাঁহারা পারেন তাঁহারা এ জগতে দুর্লভ। এই জাতীয় অতিমানবদের (superman) মধ্যে মা অন্যতমা।

এইভাবে তিনি তাঁহার সুললিত ভাষায় প্রায় ১৫ মিনিটকাল মা'র সম্বন্ধে বলিলেন। তাহার পর মৌন শেষ হইলে, ইন্দিরা দেবী মাকে আরতি করিতে সুরু করিলেন। মা দিলীপকুমারকে দেখাইয়া বলিলেন,—"গুরুকে কর।" কিন্তু তিনি সে-কথা না শুনিয়া বেশ ভক্তিভরে মা'রই আরতি করিতে লাগিলেন।

আসিবার সময় আমি ইন্দিরা দেবীকে বলিয়া আসিলাম—"তোমার গান কিন্তু শোনা হইল না।" এই কথার উত্তরে দিলীপকুমার তাঁহাকে বলিলেন, —"হ্যাঁ, গান শুনিও। দিদি সন্দেশ খাওয়াবেন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহারা মাকে মোটরে তুলিয়া দিলেন।

৭ই জুন ১৯৫৭।

সকালে পাঠ হইয়া যাওয়ার পর মা'র নিকটে অনেকে আসিয়া বসিয়াছে। দূরে ৺মনোজবাবুর পুত্র গোপালু (বুবার ভাই) দাঁড়াইয়া আছে। গোপালু বম্বে হইতে আসিয়াছে। ইতিমধ্যে এখানে আসিয়া তাহার জ্বর হইয়াছিল। জ্বরের মধ্যে সে নাকি বিকারের রোগীর মত অনেক কিছুই বলিয়াছে। মা-ও তাহা শুনিয়াছেন।

আজ তাহাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে, কেমন আছিস্?"

গোপালু জবাব দিল—"এখনও বড় দুর্বল।"

এই কথার উপরে মা বলিতে লাগিলেন—"দেখা যায় কেউ কেউ চা, সিগারেট প্রভৃতি খেয়ে তার নেশায় বেশ কাজকর্ম করে। কিন্তু অসুখ হলে দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ-সব খাওয়ার ফলে শরীরে ও মনে দুর্বলতা এসে

গেছে।" আবার বলিতেছেন,—"যারা চা, সিগারেট এই-সব খায় তারা ইচ্ছা করলেই ঐ-সব ছাড়তে পারে, কিন্তু যাদের চা ও সিগারেট খায় তারা ছাড়তে পারে না সহজে।" মা'র কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

মা গোপালুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, তুমিও ঐ-সব খাও নাকি?"

গোপালু অগত্যা মা'র নিকট স্বীকার করিল। কিন্তু সে মা'র নিকট কথা দিল যে সে আর ভবিষ্যতে খাইবে না।

নারায়ণ স্বামী ইহার উপর বলিলেন,—"কাশীর ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত ভয়ানক সিগারেট খেতেন। তাঁর মুখে সিগারেট কখনো প্রায় নিভতই না। কিন্তু তিনি মা'র এক দিনের কথায় এত দিনের প্রবল নেশা এক মুহূর্তে ত্যাগ করে দিলেন।"

মায়ের কথায় সাধারণ ইচ্ছাশক্তি জাগরণের দৃষ্টান্ত।

মা-ও বলিলেন,—"হ্যাঁ, এই শরীরটা তখন কাশীর অপর পারে নৌকাতে ছিল। শরীরটা ভাল ছিল না, তাই নারায়ণ গিয়ে গোপালবাবাকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাবার মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ খুবই আসছিল শরীরটাকে দেখে বাবা যখন যাচ্ছে তখন আমি বললাম,—'বাবা, সিগারেট তোমাকে খেয়েছে, না, তুমি সিগারেট খেয়েছ?' বাবা বুদ্ধিমান মানুষ। গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে করতে চলে গেল। যাবার সময় নাকি গঙ্গার মধ্যে সিগারেটের বাক্স ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরল। তারপর থেকে আর সিগারেট ছোঁয় নি।"

মা'র এইরূপ কথায় চা কিংবা সিগারেট ছাড়িবার দৃষ্টান্ত আরও আছে। সারা জীবনের অভ্যাস এক মিনিটে ছাড়িয়া দেওয়াটা কি কম ত্যাগের বিষয়!

মা আমাকে বলিতেছিলেন,—"দেখ দিদি, কাল রাত্রে শুয়ে আছি আর দেখছি সমুদ্রের মধ্যে একটা লঞ্চ খুব জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর দূরে

একটা বড় জাহাজ ধীরে ধীরে যেন ডুবে যাচ্ছে। আবার বাঁচবারও যেন একটা দিক্ আছে। ঐ জাহাজে দেখা গেল পরিচিত লোকও অনেক আছে।" এই বলিয়া পরমানন্দ স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ তো পরমানন্দ, তোমাদের খবরের কাগজে কোনও জাহাজডুবি-টুবির কথা আছে কিনা।"

৮ই জুন ১৯৫৭।

অখণ্ড রামায়ণ সেদিন যাহা সুরু হইয়াছিল তাহা পরদিবস সন্ধ্যায় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ দুপুর হইতে আবার রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড সম্পুটিত করিয়া পাঠ সুরু হইয়াছে। সন্ধ্যায় সমাপ্ত হইলে আরতি করিয়া তাহাও সমাপ্ত হইল।

আজ রাত্রি হইতে কাল সকাল ৮টা পর্যন্ত স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা মিলিয়া অখণ্ড কীর্তন করিবেন। দিলীপকুমার এবং ইন্দিরা দেবীও কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া কীর্তনে কিছু সময় যোগদান করিয়া গিয়াছেন। মা-ও পরে মাঝে মাঝে গিয়া তাঁহাদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

মা আজ আবার বলিতেছেন,—"দেখছি, এই শরীরটা কোথাও গেছে। একজন অসুস্থ। আমি বললাম যে আমার ঘরের উপরের ঘরে নিয়ে রাখতে পার। কিন্তু পরমানন্দ এসে যেন বলল—দরকার নেই। যা হবার ব্যবস্থা একটা হবেই। একটু পরে পরমানন্দ আমাকে যেন বসা অবস্থাতেই পিছন দিক্ থেকে এসে উঠিয়ে নিয়ে সেই অসুস্থ লোকটীর কাছে নিয়ে বসিয়ে দিল। সেই লোকটি এই দেখে খুব ক্ষমা চাইতে লাগল। কিন্তু এই শরীর যেমন বলে থাকে,—'না না, এই শরীরের কাছে আবার অন্যায় কি?'—এইরূপ বলতে লাগল।" এই পর্যন্ত বলিয়াই মা চুপ করিলেন। আর কিছু জানা গেল না।

৯ই জুন ১৯৫৭।

সকাল ৮টা পর্যন্ত অখণ্ড কীর্তন চলিয়াছে। শেষ সময়ের একটু আগে মা-ও গিয়া যোগ দিলেন। খুব আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে নাম শেষ হইল।

যাঁহারা কীর্তন করিলেন, তাঁহাদের আজ এখানে প্রসাদ নিতে বলা হইয়াছে। দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবীও আসিলেন। মা'র ঘরের পাশে বটগাছতলায় পাক করা হইল। সকলে দশ পাদ সহকারে পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ পাইয়া, মা'র নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া, বেলা প্রায় ২টার সময় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১০ই জুন ১৯৫৭।

আজ বৈকালে মা আমাকে মেয়েদের দিয়া দিলীপকুমারের শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আমরা দর্শন করিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর দিলীপকুমার, ইন্দিরা দেবী ও তাঁহাদের শিষ্য-ভক্তেরা মা'র নিকটে আসিয়া ভজন গান করিলেন। "তুমি না জানালে পরে, কে তোমারে জানতে পারে"—এই গানটি দিলীপকুমার প্রায় এক ঘণ্টা নানাভাবে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাহিলেন। পরে সকলে মৌন করিয়া বিদায় লইলেন। মৌনের পরে কানিয়াভাইয়ের স্ত্রী জয়া বেনও মাকে দুইটি ভজন শুনাইলেন। খুবই সুন্দর গলা তাঁর।

১১ই জুন ১৯৫৭।

আজ সকালে মা'র নির্দেশে দিদিমা, নারায়ণ স্বামী, বিমলা, সতী ও

তাহাকে বম্বে হইয়া দেরাদুন পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মিস্ পাঠক, নীলিমা এবং বুবাও রওনা হইয়া গেল। তাহারা এলাহাবাদ চলিয়া যাইবে। খুব ভোরে উঠিয়া মা লনে বেড়াইতেছেন এমন সময় সকলে প্রণাম করিয়া রওনা হইলেন। মা'র গলায় কে একজন একছড়া সুন্দর বেলফুলের মালা দিয়াছেন। মা সেই মালাটি দিদিমাকে পরাইয়া দিলেন এবং মাটিতে নত হইয়া পায়ে প্রণাম করিলেন। আমাদের সঙ্গীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। বুঝিলাম মা'র-ও এবার এখানকার হাট ভাঙ্গার সময় ঘনাইয়াছে।

দিলীপকুমার প্রাতর্ভ্রমণ সমাপনান্তে ফিরিতেছিলেন। মাকে দেখিয়া তিনিও নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর একটু কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন।

১৩ই জুন ১৯৫৭।

আজ সকালে মা'র ঘরে আমরা সকলে বসিয়া আছি। পণ্ডিচেরী আশ্রমে মা ও মাদারের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কথা উঠিল। ব্রহ্মচারী ভরদ্বাজ কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিচেরী গিয়া কিছুদিন ছিল। সেও উপস্থিত। তাহার মুখে শোনা গেল যে, ওখানে গিয়া ছতুভাইকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে মা'র সঙ্গে মাদারের যখন দেখা হয় তখন মাদারের কিছু অনুভূতি হইয়াছিল কি না। ছতুভাই বলিয়াছিল যে মাদার যখন মাকে প্রথম দেখিলেন তখন প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের জ্যোতির মত দেখিতে পান। আর তাহার দুই পাশে কিছু কিছু কালো মেঘের মত। ঐ কালো মেঘ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাকি বলিয়াছেন যে উহা বাধার রূপ হইতে পারে।

মা ও পণ্ডিচেরীর মাদারের সাক্ষাৎকার বিষয়ক কথা।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীনলিনী সেন মহাশয়ের ভগিনীপতি অধ্যাপক

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্তও এই সময়ে মা'র নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমিও পণ্ডিচেরী গিয়াছিলাম। বেঙ্গলদা বলিলেন, 'মাদার নাকি একদৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়াছিলেন, আর তুমি সেই দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলে না, চোখ নামাইয়া নিলে'।" এইজাতীয় কথা তিনি মাকে আরও গুটিকয়েক বলিলেন।

মা এই-সব কথা শুনিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মা আর মেয়েতে! ইহার ভিতর আবার কি কথা?"

তখন আমি, তপন এবং উপস্থিত আরও কয়েকজন মাকে বলিলাম,—"সত্য ব্যাপারটা কি তাহা প্রকাশ হওয়া কি উচিত না? বিশেষতঃ সাধু-মহাত্মাদের সম্বন্ধে কথা।" এই বলিয়া মা'র মুখ হইতে প্রকৃত কথাটি জানিবার জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হরিবাবা এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে যাত্রায় গিয়েছিলো ত। তেমনই ঠিক মায়ের কাছে। পাওয়া-দেওয়ার দিক্ নিয়ে মায়ের কাছে যাওয়া না কিন্তু। মায়ের কাছে মেয়ে, সহজ সরলভাবেই ত। জানই ত এই শরীরটার এলোমেলো ভাব। এখানে ত শক্তি আদান-প্রদানের প্রশ্নই নেই। যা হয়ে যায়। তোমাদের কাছে এই শরীরটা এখন যেভাবে, ওখানে যাওয়াও ঠিক তাই। এই শরীর, মা আর তোমরা কি ভিন্ন? বেশ, তোমরা শুনতে চাও শোন। মা যখন এই শরীরের কাছে এসে দাঁড়াল না, এই শরীর তো আপন খেয়ালে যেমন তোমাদের সকলকে দেখে মা'র দৃষ্টিতে একটু দৃষ্টি মিলিয়ে সঙ্গীয় সাধুরা সব দাঁড়িয়ে ছিল ত! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এই খেয়ালটা আসায় ক্ষণিকের জন্যে তাদের দিকে তাকিয়ে তারপর এই শরীরের দিকে মা'র অপলক দৃষ্টি থাকায় মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাবার দিক্‌টা পূরণের জন্য এই শরীরটার খেয়াল হ'ল। তাই এই শরীর আপন ভাবেই দীর্ঘ সময় দৃষ্টি মিলিয়ে রইল ত। পরে মা-ই নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে এই শরীরের হাতে ফুল দিলেন। ফুলের আদান-প্রদান হ'ল।"

পুনরায় আমার দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন,—"তুমি, পরমানন্দ উপস্থিত আরও অনেকেই সেখানে দেখেছিলে ত। মায়ের দৃষ্টিতে তীব্র জ্যোতিঃ ত ছিল না অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৃষ্টিতে রেখে দেওয়া তাও না। এই হ'ল খাঁটি সত্য কথা। বেঙ্গল বাবা কিছুই ধরতে পারে নি। তাই এই-সব বৃথা কথা।"

একটু পরে আবার বলিলেন,—"কয়েক বছর আগে ছতুভাইয়ের সঙ্গে এই শরীরের যখন দেখা হয় তখন মাদারের বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে ছতুভাই বলেছিল যে মাদারের দর্শনে গেলে তিনি সকলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তখনই এই শরীরটার খেয়াল হয়েছিল যে বেশ ত, এই শরীরটার সঙ্গে যদি মায়ের দেখা হবার যোগাযোগ হয় তবে এ শরীর কিন্তু সহজ সরল যেমন খেয়াল হয় তেমনই থাকবে। যা হয়ে যায়।

আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—"প্রথম থেকেই মা'র দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে রাখতে হবে এই ওখানকার নিয়ম, কেউ একথা বললে কিন্তু এ শরীর সেই খেয়ালই করত। স্থান অস্থান যেখানে যেরূপ ঐ ত। সেইখানে খেয়াল আসলে স্থানোপযোগী যতটা হয় এই শরীরের ক্রিয়া হয়েই যেত। যেখানে থাকতে দিলে থাকা। যখন যেখানে দেখা করার জন্য নিয়ে গেল সেই সময়মত যাওয়া। আবার যতক্ষণ যেখানে নিয়ম বসা দাঁড়ান এই-সব করা হয়েছে তো, যা যা ওখানকার নিয়ম। আরে, তোমাদের জগৎ-দৃষ্টিতে নানাভাবের কথা বলবার দিক্ আছেই। যেমন বেঙ্গল বাবা একভাবের কথা বলল। আবার যদি প্রথম থেকেই এই শরীরের দৃষ্টি স্থির থাকত তবে হয়ত তোমাদের আবার বলবার দিক্ ছিল,—মাদার মায়ের দৃষ্টি এমন আকর্ষণ করে রাখলেন যে মাকে চোখ ফিরাতেই দিলেন না।"

এই কথা বলিয়াই মা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে আবার বলিলেন,—"কি করবে? সর্বরূপে তো একমাত্র ভগবানেরই বিভূতি। এক এক সময় এক এক রূপ প্রকাশ হয়।"

এই সম্পর্কে আমার মনে হইল যে, মা ত আমাদের প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—"মহাপুরুষ সাধু-সন্তরা কখন কিভাবে থাকেন এবং কি কারণে কি করেন তাহা ত তোমাদের সব জানা থাকে না। তাই তোমরা কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে বৃথা কথা আলোচনা ক'রো না। অবশ্য সাধু-সন্তদের ত স্তুতি নিন্দা সবই সমান। তবে তোমাদের কর্তব্য যথাশক্তি আদেশ পালন।"

তবে পণ্ডিচেরী আশ্রমের কেহ না কেহ এই জাতীয় কথা কিন্তু মাকে মাঝে মাঝেই বলিয়া যান। আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু এ যাবৎ মা এই-সব কথা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। আজ আমাদের বিশেষ আগ্রহে মা'র মুখ হইতে এত সব কথা প্রকাশ পাইল।

মায়ের আদর্শ হইতেছে কাহারো বিষয়ে বা কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে সমালোচনা না করা। কারণ মা'র মুখে অনেক সময়ই শুনিতে পাই, —"তোমাদের গুরু যিনি, জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি, তোমাদের গুরু তিনি। তাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অ-প্রকাশ গুরু-ইষ্ট-মন্ত্ররূপে ঐ-ই ত। যেখানে মন-প্রাণ সেখানে বিশ্বব্যাপক এক আত্মাই ত। নিজকে নিয়ে নিজেতে নিজে। সেই স্বরূপ প্রকাশের জন্যই এই ধরায় নানা ধারা। আবার ধরা নিজকে নিজে ধরে আছেন। আবার ধরা অ-ধরার প্রশ্নই নেই। সেই প্রকাশই ত চাই। সাধু-সন্ত মহাপুরুষ বলে যাদের সঙ্গে তোমরা মিলে শ্রেয়ঃ গ্রহণ প্রেয় ত্যাগের দিকে চলা সেখানে কোনও মহাপুরুষের ক্রিয়াতে কোনও বিচারের দিক্ গ্রহণ না। যা বলেন তাই গ্রহণীয়। তাঁদের বিষয়ে মিথ্যা ভুল আলোচনায় কিন্তু তোমাদের অপরাধ হয়। ক্ষতির দিক্। যাঁহারই সম্বন্ধে যেভাবের আলোচনা কর সবাই ত তোমার নিজ জন। নিজ জনকেই বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ স্বরূপ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেরই আত্মা, সকলেতেই সেই একমাত্র ভগবান্ এই ভাব রাখার চেষ্টা। শ্রেয়ঃ গ্রহণ প্রেয় ত্যাগ। এক

ইষ্ট-গুষ্টিই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময়। তাই কর্তব্য যারা সত্যলাভের জন্য বের হ'তে পেরেছে তারা সাধু-সন্তদের সত্যানুসন্ধান ক্রিয়াটি সর্বদা নিজ নিজ ইষ্ট-গুরুরই নানা প্রকাশ এই বুদ্ধিতে গ্রহণীয়। তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, সখা, সবই একাধারে যেখানে, সেখানে বিশ্বব্যাপক একখানিই ত আশ্রম। সেখানে কোন সীমার প্রশ্ন নাই—অসীম। সব একেরই—একই। দুইয়েতেই দ্বন্দ্ব। যেখানে আবরণ—সেইখানেই অন্ধ।"

আজ এই-সব কথায় বহু পূর্বের একটি স্মৃতি আমার মনে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। হয়ত ২৫।৩০ বৎসরেরও বেশী দিনের কথা হইবে। ঢাকাতে আমার স্বর্গীয় পিতার (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) বাসাতে একবার শতাধিক লোকের মধ্যে মা'র এমন অপলক দৃষ্টি হইল যে দুই-তিন ঘণ্টা একই ভাবে কাটিয়া গেল। একেবারে পাথরের মূর্তির মত। তাহার পর যখন আমরা মাকে ধরাধরি করিয়া অপর একটি বাড়ীতে লইয়া গেলাম, তখনও দেখি মা'র সেই একই ভাবের দৃষ্টি। আমরা তখন প্রথম প্রথম এইরূপ দেখিতেছি। তাই ভয় পাইয়া গেলাম যে মা'র শরীরের কিছু না হয়। সেই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই ইহা দেখিয়াছেন। আজিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি পুরাতন ঘটনা।

আরও একবার কাশীধামে—ইহাও বহু বৎসর পূর্বের কথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের উপস্থিতিতে মা'র নানা প্রকারের স্থির দৃষ্টি এবং ত্রাটক হইয়াছিল। এই রকমটা ত আরও অনেকবার দেখা গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সেই সময়ের ছবিও নিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে মা'র সঙ্গে তাঁহার এই বিষয় লইয়া আলোচনাও হইয়াছিল। মা বলিয়াছিলেন, —"দৃষ্টির অনন্ত ধারা।"

আজ সকালের আর একটি ঘটনা। মা ভোরবেলা একটু বেড়াইয়া আসিয়া ঘরের সম্মুখে একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। কি কথায় কথায়

একজন বলিল,—"বুধবার গেল, আজ বৃহস্পতিবার।" মা-ও এই কথা ধরিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন,—"বুধ গেল, ভূত গেল।" "বুধ গেল, ভূত গেল।" দুই-তিন বার বলিয়া নিজেই ছেলেমানুষের মত খুব হাসিতে লাগিলেন।

সামনে যাহারা ছিল তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা ভূতকে ভয় কর কি-না?" অনেকেই ভয় পায় বলিল। মা আর কিছু বলিলেন না। পরে আমি মাকে অনেক জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন,—"ব্রহ্ম রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য ঐ-রকম একজন। এ শরীরটা শুয়েছিল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখা করে গেল।"

আমি মাকে বলিলাম,—"মা, তোমার দর্শন পেয়ে তো এরকম অনেকেরই মুক্তি হয়ে যায়, ওর কি হ'ল?"

বার বার জিজ্ঞাসা করার পর মা গম্ভীর হইয়া শুধু বলিলেন,—"অবস্থার পরিবর্তন।"

আজ বৈকালে কলিকাতা হইতে ডাঃ অনিল মৈত্রের টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে পানুর operation ভালভাবে হইয়া গিয়াছে। অনিল আজকাল টালিগঞ্জের সরকারী হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। সে-ই সকল ব্যবস্থা করিয়াছে। পূর্বেও আশ্রমবাসী অনেকেরই জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী অনেক-কিছুই করিয়াছে। উভয়েরই স্বভাব খুব মধুর এবং ভক্তিপূর্ণ।

১৫ই জুন ১৯৫৭।

বৈকালবেলা বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশজী মা'র দর্শনের জন্য

আসিলেন। সকালে তাঁহার পুত্রবধূ আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিল। শ্রীপ্রকাশজী কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ভগবান্‌দাসজীর পুত্র। তাঁহাদের পরিবারের প্রায় সকলেই মা'র নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু কেবল শ্রীপ্রকাশজীরই এতদিন পরে মা'র কাছে আসিবার যোগাযোগ হইল। তিনিও মাকে এই কথাই বলিলেন। মা'র সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলিলেন। উঠিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতাজী, আপনার সঙ্গে এত লোক যাওয়া আসা করে, কিন্তু তাদের সব ব্যবস্থা কিভাবে হয়?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আগে থেকে ত পিতাজী এখানে কোন ব্যবস্থা করা হয় না। এ শরীরের কথা, কি হয়ে যায়।"

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশজী।

কিছুক্ষণ পরে তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

১৬ই জুন ১৯৫৭।

আজিও মা ভোরবেলা হাঁটিয়া আসিয়া ঘরের বাহিরে চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমিও গিয়া মায়ের নিকট দাঁড়াইলাম। দেখিলাম মা'র দুইটি হাতই মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। যে মা'র নিকটে আসে তাহাকেই মা জিজ্ঞাসা করেন,—"বল ত, আমার হাতে কি আছে?" মায়ের এই শিশু-সুলভ ব্যবহারে বড়ই আশ্চর্য লাগে!

আমি আসিতেই মা আমাকেও ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,—"রাস্তায় তোমাকে কেউ কিছু দিয়াছে বোধ হয়।" মা তখন হাত দুইটি খুলিয়া সকলকে দেখাইলেন। দেখিলাম এক হাতে রহিয়াছে ফুল, আর অপর হাতে তিলের দানা। দুইটি মহারাষ্ট্রীয় কন্যা, পথে মাকে দেখিয়া

মা'র দুই হাতে উহা দিয়া গিয়াছে। এদেশে ইহাও নাকি পূজার এক ধরন। কন্যা দুইটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা। পথে যাইতেছিল। মাকে দেখিয়া উহাদের কী খেয়াল হইল কে জানে, দুই হাতে ঐ-সব দিয়া গেল। তাহারা মা'র মধ্যে কিছু দেখিয়াছে কিনা কে জানে!

কথায় কথায় মা বলিতেছেন,—"দেখা গেল একজন কালো টুপি পরা লোক এই ঘরের সামনেই বসে আছে। তার সামনে একজন টেরা চোখওয়ালা লোক।" ইহার পর আর কি হইল কিছু বলিলেন না। একটু পরে আবার বলিতেছেন,—"ভূপতি বাবা এসে বলছে,—কীর্তনের সময় কেবল ঘুম পায়।" ইহার ব্যাপারও ঠিক পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। ঢাকার পুরাতন ভক্ত ভূপতি মিত্র মহাশয় ত আজকাল কাশীতে নব-নির্মিত আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন।

ইহার পরে মা আসিয়া ঘরের ভিতরে শুইলেন। চোখ বন্ধ করিয়াই বলিতেছেন,—"একটা গভীর জঙ্গল। বাঘ-ভালুক আছে। তোরা ত সব সঙ্গে সঙ্গে-ই আছিস্। সব যেন হাঁটতে হাঁটতে কোনও দিকে যাচ্ছে। এ শরীরটা আগে আগে চলেছে। আর সবাই পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে। তাই এই শরীরটা আবার পিছনে ফিরে তোদের কাছেই আসল।"

আবার একটু পরে বলিতেছেন,—"একজন কানের কাছে এসে বলে গেল (নিজকে দেখিয়ে) আমি পাশ করেছি। হাজারের মধ্যে একজন।"

বুনি ও উদাস ত ঘরেই ছিল। তাহারা মা'র এই কথা নাকি পরিষ্কার শুনিয়াছে। কিন্তু আমি পাশে থাকিয়াও যেন শুনিলাম,—"পরীক্ষার কথা, পাশের কথা না।" সুতরাং আমি মাকে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, —"পরীক্ষার কথা কি বলে গেল মা?" কিন্তু মা বুঝিলেন যে আমি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাই কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন,—"এখন বলা হবে না।"

বুনি মা'র কথা শুনিয়াই ধরিয়া লইল নিশ্চয়ই তপনের পাশের কথা।

কারণ তপন এবার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। পরীক্ষার ফল এখনও জানিতে না পারায় বড়ই চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আছে। অথচ আশ্চর্য, মা'র মুখে এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়াও বুনির তপনকে এই কথা বলিবার কোন খেয়ালই হইল না।

তপন আলমোড়া বিদ্যাপীঠ হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া যোগীভাইয়ের নিকট সোলনে চার বৎসর ছিল। সেখানে পড়াশুনা করিয়া বিশারদ ও শাস্ত্রী পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। সেই সঙ্গেসঙ্গেই আই. এ. পাশ করিয়া এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। স্বভাবটি খুবই সুন্দর। মা'রও উহার উপর যেন একটু বিশেষ কৃপাদৃষ্টি। বাড়ীতে তাহার বাবা মা ভাই প্রভৃতি সকলেই তাহাকে কলিকাতা গিয়া চাকুরী করিবার উপদেশ দিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি মা'র কথাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়া, মা যাহা বলিতেছেন তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছে।

১৭ই জুন ১৯৫৭।

আজ সোলন হইতে যোগীভাইয়ের টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তপন বি. এ. পরীক্ষা খুব ভালভাবে পাশ করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"গতকাল দু'বার করে বললাম যে পাশের খবর দিয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য, দিদি একথাটা শুনলই না। তখন খেয়াল হ'ল যে, এখন আর বলা না। পরিষ্কার দেখা গেল তপন এসে নিজেকে দেখিয়ে আমার কানে কানে বলল,—"আমি পাশ করেছি। হাজারের মধ্যে একজন।"

মা'র কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া ভবিতে লাগিলাম। মা'র কী লীলাখেলা। সব জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না। সব বলিয়াও

আবার কিছুই বলেন না। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমরা সব সময় সব কথা ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারি না।

আজ সন্ধ্যার সময় মা নিজে অনেকক্ষণ কীর্তন করিলেন,—"হে নাথ বিশ্বনাথ, স্বয়ম্ভু বিশ্বনাথ।" আবার বাংলায় "ধর লও ধর লও কিশোরীর প্রেম" গানটিও খুব সুন্দরভাবে গাহিলেন। মা'র মুখে এই গানটি শুনিয়া এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা খুবই আনন্দ লাভ করিল।

স্থানীয় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কণ্ট্রাক্‌টার শ্রীসোমপ্রকাশ নন্দা—তিনি সস্ত্রীক মায়ের নিকট প্রায় প্রত্যহই আসেন। ইতিমধ্যে একদিন মাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়াছিলেন। খুব সুন্দর করিয়া প্যাণ্ডেল ইত্যাদি সাজাইয়াছিলেন। মা'র বসিবার জন্য একটি খাটও খুব রুচির সহিত ফুল দিয়া সাজান হইয়াছিল। মাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া, পঞ্চামৃত ইত্যাদির দ্বারা ভক্তি-সহকারে স্বামী-স্ত্রী মা'র পূজা করিলেন। আরতির সময় একটি ছেলে খুব সুন্দর করিয়া আরতির গান গাহিয়াছিল।

আজ সেই ছেলেটি আসিয়া মাকে চার-পাঁচটি গান শুনাইল। গানগুলি খুবই সুন্দর। মা-ও লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

১। দেখা অজব খিলাড়ী সাধু
দেখা অজব খিলাড়ী রে।
মিট্টিকে প্রভু খেল বনাওয়ে,
তিন্‌মে পবন পসারী রে।
বোলত, চালত, ফিরত নিরন্তর
কাম করে বলশরীরে॥ দেখা......
একখণ্ডকে দোটুক কিনে
এক পুরুষ এক নারীরে।
দেব দৈত্য নর পশু পক্ষিগণ
রূপ অনেক বিহারী রে॥ দেখা......

আপ বনাওয়ে আপ সাজাওয়ে
আপ করে তৈয়ারী রে।
আপ হী ভোগে আপ ভুলাওয়ে
ভুবন চতুঃদশচারী রে॥ দেখা......
গুপ্ত রূপ মে প্রকট হোয়ে
নটবর মূরতধারী রে।
ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত ফির হোয়ে
মহিমা অচরজ ভারী রে॥ দেখা......

২। দো দিনকা জগমে মেলা
সব চলাচলীকা খেলা। (২ বার)
কোই চলা গয়া কোই যাওয়ে
কোই খড়া হ্যয় গড্ডী বাঁধে
কোই খড়া তৈয়ার অকেলা জী॥ সব......
পাপ-কপটকে মায়া জোড়ী
ধন লাখ-কড়োর কমায়া জী
সঙ্গ চলে না এক অধেলা॥ সব......
মাতা পিতা সুনো মেরে ভাইয়োঁ
অন্তকা কোই সাথী নহী জী
কিউ ভরে ফির পাপকা ঠেলা॥ সব.......

৩। শিব শিব শিব শিব
শিব শিব শিব শিব
নাম সিমর লে নাম সিমর লে
জনম সম্বর লে।

রাবণ নাম লিও তুর মনমে
সকল দেব আজ্ঞা শিরধারী
সকল মনোরথ পূরণকারী ॥ শিব……
অঙ্গে বিভূতি গলে মুণ্ডমালা
শীষে জটাজাল গঙ্গা-বিলাসী
সকল জগতকে পালনকারী ॥ শিব……
করে ত্রিশূল, পহিরে মৃগছালা
সঙ্গ বসে গিরিজা নিত দাসী
সকল মনোরথ পূরণকারী ॥ শিব……
চন্দ্রকলা মস্তক পর সোহে
তিন নয়ন ত্রৈলোক্য বিকাসী
সকল জগতকে পালনকারী ॥ শিব……
ব্রহ্মানন্দ করো করুণা প্রভু
ভক্তি দান দিব্যো ত্রিপুরারী
সকল মনোরথ পূরণকারী ॥ শিব……

৪। মাকি সঙ্গত মে হরিগুণ গায়ীরে।
মাকি সঙ্গত কা লাভ ঘনেরা
মিটে জনম জনম কা অঁধেরা
পরমেশ্বরকো দর্শন পায়ী রে ॥ মাকি……
সৎ সঙ্গত কী মহিমা অতি ভারী
ঋষি-মুনি পুরাণ পুকারী
ঈশ্বর গান সদা মন লায়ী রে ॥ মাকি……
করে হজার কোশিশ কোই
মাকি সঙ্গত বিনা জ্ঞান ন হোই
মা কা নাম সিমর গুঞ্জরাই রে ॥ মাকি……

আজ রাত্রে মা ঘরের সম্মুখে খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১১॥০টা বাজিয়া গিয়াছে। মা আপন মনে গান ধরিলেন—

"মা ডাক শোনে না কথা কয় না
মা বুঝি আমার বেঁচে নাই।"

নিজের খেয়ালে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই গানটিই গাহিতে লাগিলেন।

১৯শে জুন ১৯৫৭।

বিকালে প্রতাপগড়ের রাজার বাড়ীতে মাকে লইয়া গেলেন। রাজমাতা নিজে আরও তিন-চার জনের সহিত মিলিয়া বেশ সুন্দরভাবে দেবীর স্তবপাঠ ও কীর্তন করিলেন। সকলেই শুনিয়া বেশ আনন্দ পাইল। সেখান হইতে মাকে মোরভীর রাণীসাহেবা তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। রাজা-সাহেব আজকাল বিলাতে আছেন। বৃদ্ধ মহারাজা এই অল্প কিছুদিন হয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। মোরভীর রাজপরিবারস্থ সকলেই প্রায় মা'র প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধাশীল।

প্রায় রাত্রি ৮॥০টায় মা ফিরিয়া আসিলেন। আগামী কালই মা'র পুনা হইতে রওনা হইবার কথা হইয়াছে। সকলে আশা করিয়াছিল যে মা হয়ত এখানে আরও কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু মা'র আর থাকা হইল না। আমাকে অবশ্য মা উপস্থিত এখানেই রাখিয়া যাইতেছেন। আরও মাসখানেক থাকিয়া পরে রওনা হইবার কথা মা বলিলেন।

২০শে জুন ১৯৫৭।

মা'র পুনা ত্যাগ ও বিভিন্ন স্থানে গমন।

আজ সকালে ৭॥০টার সময় Deccan Queen-এ মা বম্বে রওনা হইলেন। সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বুনি, উদাস ও ভরদ্বাজ। লীলা বেন এবং লক্ষ্মীজীও সঙ্গেই আছেন।

আমি এখানেই থাকিয়া গেলাম। ভূতা সাহেব সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমার সঙ্গে তিন-চারজন থাকিয়া গেল। তাহা ছাড়া কাশী হইতে মনোমোহনদা'র বড় ছেলে সরোজ আসিয়াছিল। মা তাহাকেও আমার কাছে রাখিয়া গেলেন।

২২শে জুন ১৯৫৭।

বম্বে হইতে বুনির পত্র পাইলাম। মা পরশু প্রায় সকাল ১১টায় ভাইয়ার বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আগামী ২৪শে তাঁহার দিল্লী রওনা হইবার কথা।

২৩শে জুন ১৯৫৭।

বম্বের পত্রে জানিলাম মা'র শরীর একপ্রকার ভালোই আছে। গতকাল হইতে মা'র নির্দেশমত ভাইয়ার বাড়ীতে অখণ্ড রামায়ণ-পাঠ সুরু হইয়াছে। লীলা বেন ও লক্ষ্মীজী খুব উৎসাহের সহিত পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন।

২৫শে জুন ১৯৫৭।

চিঠি আসিয়াছে গত পরশু মা বিকালে একবার সন্ন্যাস আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে সাধুদের অনুরোধে মা একটু কীর্তনও করিয়াছেন। তাহার পর সেখান হইতে হরিবাবাজীর ভক্ত রাম সিংজী মায়ের সম্মুখে গিয়া একটু ঘুরিয়া আসিয়াছেন। গতকাল সন্ধ্যায় ফ্রন্টিয়ার মেলে মা রওনা হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সুনয়না এবং ঠাকুরভাইয়ের মেয়ে বীণাও যাইতেছে। পথে বরোদাতে উৎকণ্ঠেশ্বর হইতে ব্রহ্মচারী কুসুম, কান্তিভাই, হরপ্রসাদ প্রভৃতির আসিয়া মা'র সঙ্গে মিলিবার কথা।

২৮শে জুন ১৯৫৭।

দিল্লী হইতে সংবাদ পাইলাম যে মা গত ২৫শে সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ষ্টেশনে মাকে স্বাগত করিবার জন্য বহু লোক আসিয়াছিল। দিল্লী আশ্রমে ভক্তদের প্রার্থনায় মা দুই রাত্রি থাকিয়া গতকাল ২৭শে রাত্রে হরিদ্বার রওনা হইয়া গিয়াছেন। দিল্লীতে মা'র উপস্থিতিতে ওখানকার ভক্তেরা মিলিয়া খুব উৎসাহের সহিত কীর্তন করিয়াছে। ঠাকুরভাইয়ের মেয়ে বীণা এই প্রথম দিল্লী আশ্রম দেখিল। আশ্রমে এখনো বিজলী আসে নাই দেখিয়া সে স্বামিজীকে বলিয়াছে যে সে ঐ বাবদ ২০০০৲ টাকা দিবে। আশ্রমে যাহাতে তাড়াতাড়ি লাইট আসে তাহাই তাহার ইচ্ছা।

এবার দিল্লী আশ্রমেই সংযম-সপ্তাহ হইবার কথা হইয়াছে; আগামী ২২শে নভেম্বর হইতে ২৮শে পর্যন্ত। শ্রীযুক্ত আগা সাহেবই এইবার এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। আশ্রমটি গত কয়েক বৎসর যাবৎ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে। সকলেই আশা করিতেছে যে এবার সংযমব্রত উপলক্ষে হয়ত অন্ততঃ হল-ঘরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

২রা জুলাই ১৯৫৭।

আজ দেরাদুন হইতে চিঠি পাইলাম। মা গত ২৮শে ভোরে পরমানন্দ স্বামী, উদাস ও কুসুমকে লইয়া হরিদ্বারে নামিয়া গিয়াছিলেন। বুনি অন্যান্য সকলকে লইয়া সোজা দেরাদুন চলিয়া গিয়াছিল।

যোগীভাই এখন সোলনে আছেন। সেজন্য হরিদ্বার স্টেশনে টিহরীর মহারাজা মা'র জন্য গাড়ী তৈয়ার রাখিয়াছিলেন। মা সেই গাড়ীতে করিয়া সোজা বাঘাট হাউসে চলিয়া যান।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা মোটরেই সপ্তর্ষি আশ্রমে হরিবাবার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হরিবাবা কিছুদিন হয় নাকি ওখানেই আছেন এবং প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃক্ষতলে থাকিয়াই পাঠ সৎসঙ্গ ইত্যাদি নিয়মিত করিয়া আসিতেছেন।

ওখানে হরিবাবার সঙ্গে দেখা করিয়া মা সেই মোটরেই দেরাদুন রওনা হইয়া যান। সন্ধ্যা প্রায় ৬৷৷৹টায় গিয়া কল্যাণবনে পৌঁছিয়াছেন।

ইতিপূর্বেই পুনা হইতে দিদিমা, নারায়ণ স্বামী এবং মেয়েদের অনেককে দেরাদুন পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে কিষনপুরেই আছেন। মা দেরাদুন যাইতেছেন, এবং সেখানে হয়ত কিছুদিন থাকা হইতে পারে এই সংবাদ পাইয়া ইতিমধ্যেই অনেক ভক্ত ওখানে গিয়া সমবেত হইয়াছেন।

মা কল্যাণবনেই আছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আসিয়া কিষনপুর আশ্রমে ঘুরিয়া যান। ওখানে গিয়া মা নাকি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এবার বম্বেতে ভাইয়ার বাসায় যখন অখণ্ড রামায়ণপাঠ হইতেছিল তখন দুইটি মূর্তি (একটি স্ত্রী ও অপরটি পুরুষ) আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া সেখানেই মিলাইয়া গেলেন। উভয় ব্যক্তি সাদা কাপড় পরা এবং ভাবটিও খুব সৎ ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে মা'র মুখ হইতে আর অধিক কিছু শুনিবার এখনো সুযোগ হয় নাই।

৫ই জুলাই ১৯৫৭।

নারায়ণ স্বামিজী এবং বুনির পত্র পাইলাম। মা'র শরীর একপ্রকার আছে। তবে শরীরে এখনও ব্যথা ব্যথা ভাব আছে। মা কিষনপুর আশ্রমেই আছেন। বিকালের দিকে প্রত্যহ একবার কল্যাণবনে সকলকে লইয়া বেড়াইয়া আসেন।

গত ১লা দুপুরে টিহরীর মহারাজা সপরিবারে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। বিকালে আবার নরেন্দ্রনগর ফিরিয়া গিয়াছেন।

আগামী ৮ই মা'র হরিদ্বার যাইবার কথা। এবার গুরু-পূর্ণিমার উৎসব যোগীভাইয়ের আগ্রহে হরিদ্বারেই হওয়া স্থির হইয়াছে।

৯ই জুলাই ১৯৫৭।

দেরাদুন হইতে চিঠি আসিয়াছে, গত ৫ই বিকালে হরিবাবাজী মা'র সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দেরাদুন গিয়াছিলেন। সঙ্গে সুন্দরলাল পণ্ডিতজীও গিয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লী হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন। হরিবাবাজী নাকি বলিয়াছেন যে মা গুরু-পূর্ণিমার সময় হরিদ্বারে থাকিবেন জানিতে পারিলে তিনিও ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু সময়মত তাহা জানিতে না পারায় গুরু-পূর্ণিমায় সকলকে বৃন্দাবনে আসিবার কথা লেখা হইয়া গিয়াছে। ভাইয়ার মেয়ে সুনয়না মা'র কথামত তাঁহাকে কয়েকটি ভজন শুনাইয়াছেন। হরিবাবাজী তাহাতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গুরু-পূর্ণিমার দিন হরিদ্বারে গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস লইবার কথা হইয়াছে। সেই-সব ব্যবস্থা করিবার জন্য মা পূর্ব হইতেই ব্রহ্মচারী কান্তিভাই, চিন্ময়ানন্দ ও কেশবানন্দকে হরিদ্বারে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১২ই জুলাই ১৯৫৭।

নারায়ণ স্বামিজীর ও বুনির চিঠিতে মা'র খবর পাইলাম। গত ৮ই বেলা ১২টার গাড়ীতে অনেককে হরিদ্বার পাঠাইয়া মা ৩৷৽টার সময় মোটরে হরিদ্বার রওনা হইয়া প্রায় ৬৷৽টায় ওখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। মা'র সঙ্গে দিদিমা, পরমানন্দ স্বামী, নারায়ণ স্বামী ও কাশিমবাজারের মহারাণী কয়েকদিন পূর্বেই দেরাদুন গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা মায়ের নিকটে কয়েকটি দিন থাকেন।

গুরু-পূর্ণিমায় হরিদ্বারে মা।

গুরু-পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত হরিদ্বারে গিয়াছেন। কুচামন হইতে রাজা প্রতাপ সিংহজী এবং তাঁহার ভগিনীও গিয়া পৌঁছিয়াছেন। টিহরীর মহারাণী তাঁহার দেবর মহারাজকুমার বলেন্দ শাহ ও তাঁহার পত্নীকে লইয়া একদিন মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত মা বেশ দীর্ঘ সময় আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন।

গতকাল গুরু-পূর্ণিমার উৎসব আশা করি হরিদ্বারে মা'র উপস্থিতিতে বেশ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের খবর এখনো চিঠিতে পাই নাই। হরিদ্বার, দেরাদুন হইতে এখানে চিঠি আসিতে প্রায় চার দিন লাগে।

১৫ই জুলাই ১৯৫৭।

হরিদ্বার হইতে ১২ তারিখের চিঠিতে আজ গুরু-পূর্ণিমার বিষয় বিস্তারিত পাওয়া গেল।

গুরু-পূর্ণিমার দিন সকাল হইতেই অখণ্ড নামকীর্তন সুরু হইয়াছিল। সেই সঙ্গে অখণ্ড জপও চলিতেছিল। বাঘাট হাউসের নীচের হলটি খুব সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টায় মা আসিয়া নীচে বসিলেন। ব্রহ্মচারী কুসুম মা'র পূজা করিল। পূজা সমাপ্ত হইলে উপস্থিত সকলেই মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। ইহার পর মা নিজেই নাম সুরু করিলেন—"জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।" কিছুক্ষণ নাম করিয়া মা সকলকে নিজ হস্তে প্রসাদ ও মালা বিতরণ করিলেন।

হরিদ্বারে গুরু-পূর্ণিমা উৎসব।

বেলা ১টা হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পুটিত রামায়ণপাঠও হইয়াছে। বিকালে সৎসঙ্গে মা আবার আসিয়া বসিলেন। শ্রীগণেশদত্ত গোস্বামী মহারাজ হিন্দীতে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন।

সমস্ত রাত্রি খুব ঝম ঝম করিয়া কীর্তন চলিয়া পরদিন সূর্যোদয়ের সময় সমাপ্ত হইয়াছে। দেরাদুন ও দিল্লীর অনেকেই আসিয়া এই কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন।

তাহা ছাড়া গুরু-পূর্ণিমার দিন সকালেই কাশিমবাজারের মহারাণী মা'র উপস্থিতিতে সচল যুগল কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরোহিতের কাজ শ্রীযুক্ত বাটুদাই করাইয়াছেন।

পূর্ণিমার পূর্বদিন রাত্রেই ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গের বিরজা হোম ইত্যাদি সুরু হইয়াছিল। শেষ রাত্রে দিদিমা তাহাকে সন্ন্যাসের মহাবাক্য শুনাইয়াছেন। তাহার পর স্বামী শঙ্করানন্দজী মা'র ও দিদিমার উপস্থিতিতে প্রেষ-মন্ত্র দিলেন। আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নাম হইয়াছে স্বামী চৈতন্যানন্দ গিরি।

ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ।

গত ১৯৫০ সনে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরে আশ্রমে ব্রহ্মচারী নেপালদা, প্রকাশ, স্বরূপ ও মৃণ্ময় এবং কেশব সন্ন্যাস লইয়াছিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর

তাহাদের নাম যথাক্রমে নারায়ণানন্দ, প্রকাশানন্দ, স্বরূপানন্দ, চিন্ময়ানন্দ ও কেশবানন্দ হইয়াছে। প্রায় সাত বৎসর পরে এইবার আবার একটি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিল।

মা সন্ন্যাস-গ্রহণ উৎসব উপলক্ষে আশ্রমস্থ সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের উপদেশ দিয়াছেন,—"তোমরা সকলেই বেশ মন দিয়া সাধন-ভজনে লাগিয়া যাও। সময় ত চলিয়া যাইতেছে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ উপলক্ষে গুরু-পূর্ণিমার পরদিন মা'র উপস্থিতিতে প্রায় ৫০জন সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র দান করা হইয়াছে।

মা পূর্ণিমার পরদিনই অর্থাৎ ১২ তারিখ বিকালে মোটরে দেরাদুন ফিরিয়া গিয়াছেন। হরিদ্বারে বাঘাট হাউসে সাধন-ভজনের জন্য স্বামী শিবানন্দ, চিন্ময়ানন্দ ও চৈতন্যানন্দকে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ চতুর্মাস বোধ হয় উঁহারা হরিদ্বারেই থাকিবে।

১৭ই জুলাই ১৯৫৭।

দেরাদুন হইতে কুসুম, বুনি এবং নারায়ণ স্বামীরও পত্র আসিয়াছে।

মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল যাইতেছে না। সেই কানের ও মাথায় শব্দটা নাকি এখনও চলিতেছে। কখনও একটু কমে, কখনো একটু বাড়িয়া যায়। পায়ের একটা ব্যথা লাগিয়াই আছে। মা তাই অনেক সময় উপর হইতে নীচে নামেনও না। তবে সন্ধ্যার পূর্বে প্রায় প্রত্যহই একবার কল্যাণবনে ঘুরিয়া আসেন।

২০শে জুলাই ১৯৫৭।

নারায়ণ স্বামিজী লিখিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য

করিয়া মা বলিতেছিলেন,—"তোমরা যখন ভোগের দিক্‌টা ছেড়ে এখানে এসেছ তখন ভালো করে সাধন-ভজনে লাগা দরকার। যতটা শক্তি সবটা এদিকে প্রয়োগ কর।" এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্পও বলিয়াছেন। উহা এইরূপ—

একজন সাধক গুরুর আদেশমত নির্জনে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেছিলেন। দীর্ঘদিন কঠোর সাধনার পর একদিন এক দীর্ঘকায় মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও তুমি?" সেই সাধকটি কিছু না চাওয়া সত্ত্বেও মহাপুরুষ তাঁহাকে মুক্তিবর দিতে চাহিলেন। সাধক নম্রভাবে বলিলেন,—"আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার দেওয়া কোনও বর নিতে অক্ষম।" কিছুদিন পর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সব বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন,—"কোনও বর না চাহিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। মুক্তি হইতে বড় যে ভক্তি ও প্রেম তুমি তাহারই অধিকারী হইবে।" গল্পটি বলিয়া মা বলিলেন,—"উহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধক কিনা, তাই ভক্তি-প্রেমকে মুক্তির চেয়েও বড় স্থান দিয়াছে। আসল কথা, সর্বদাই সাধন-ভজন করতে করতে, 'কি পেলাম', 'কি হ'ল' এই দিকে খেয়াল না দিয়ে সেই পথে চলতে থাকা। তাতেই ভাল ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের নানান্ কথা।

আবার একসময় কথা হইতেছিল যে, মা কাহাকেও ভালবাসেন কি না। কেহ কেহ বলিলেন যে, "মা যদি ভাল না বাসিতেন তবে মা'র নিকট এত লোক কিভাবে আসিত?" নারায়ণ স্বামিজী বলিলেন, "গত ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি বলিতে পারি যে মা'র মধ্যে ভালবাসার নাম-গন্ধও নাই।" এই কথার উত্তরে মা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"দণ্ডী সাধু কি বলছে দেখ। ঠিকই ত, ভালবাসাবাসি ত দুইজন থাকলে। যখন কেবল বল একমাত্র তিনিই তখন কে কাকে ভালবাসে? দেখ, জাগতিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে

সকলেই ছোট্ট শিশুকে দেখলে কতই না আদর করে, ভালবাসে। কিন্তু এই শরীরটার ত সবই অদ্ভুত। এমন একটা সময় গিয়েছে যখন যদি দেখা যেত যে কেউ শিশুকে আদর করছে, তবে তখন শিশুর সৃষ্টির কথা খেয়াল হয়ে ভিতর থেকে যেন বমির ভাব আসত।"

নারায়ণ স্বামী একটু পরে নিজের কথা মাকে বলিলেন,—"দেখ মা, আমার কাছে কোনও ছোট ছেলে কখনও কোলে আসতে চায় না। আমি আগেও অনেকবার এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় আমার এই বিকট চেহারা দেখেই তারা সব ভয় পায়।"

মা বলিয়া উঠিলেন—"যদি কেউ আসতে চায়, তবে নেবে তুমি?" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

আর একটি ছেলে মাকে প্রশ্ন করিল,—"ভগবান্ যদি সর্বশক্তিমান্ তবে জগতে এত অশান্তি দুঃখ কেন? তিনি ত ইচ্ছা করলেই সব দূর করতে পারেন।"

মা জবাব দিলেন,—"ভগবান্ ত কাহারো পরামর্শ নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি। তিনি যদি ঠিক অন্যভাবে জগৎ বানাতেন তবে ত তোমাদের প্রশ্ন থেকেই যেত। যদি ঠিক ঠিক বুঝা যায় যে তিনি মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান্ তবে আর এই জাতীয় প্রশ্ন মনে আসেই না।"

একটি পুত্রহারা ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা মা'র কাছে আসিয়া খুব কান্নাকাটি করিতেছিলেন, তাঁহার প্রায় ৬০ বৎসরের ইঞ্জিনীয়ার পুত্র কয়েকদিন হয় মারা গিয়াছে।

মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"কি করবে মা? যাঁর জিনিস তিনিই এই কয়দিন তোমার কাছে রেখে সেবা করিয়ে নিলেন। সেও তোমার কাছ থেকে যে কয়দিন প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করল। তারপর তিনি নিজের জিনিস নিজেই ফিরিয়ে নিলেন। যখন তোমার কান্না আসবে তখন ভগবানের জন্য ইষ্টের জন্য কাঁদবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা মহিলার বুকের মধ্যে

নিজের মাথাটি রাখিলেন। বৃদ্ধা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা শান্ত মনে মা'র নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

এই প্রসঙ্গে মা একটি ঘটনা সকলকে বলিয়াছেন। বহু বৎসর পূর্বে মা যখন তারাপীঠে ছিলেন তখন একজন ভদ্রমহিলা ১১ বৎসরের একটি মেয়েকে লইয়া মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার বড় একটি মেয়ের বিবাহ-ব্যবস্থা সমস্ত ঠিক। এমন সময় সে হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনি বড়ই মূহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারাপীঠের একটি ঘটনা।

মা'র নিকটে আসিয়া অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিলেন। পরের বৎসর মা যখন আবার তারাপীঠে গিয়াছেন সেই ভদ্রমহিলা মা'র নিকট আসিয়া দেখা করিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সেই ১১ বৎসরের মেয়েটিও মারা গিয়াছে। কি অদ্ভুত, ঠিক তাহার এক বৎসর পর মা'র আবার তারাপীঠে যাওয়া হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া সেই ভদ্রমহিলা মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার কোলে একটি একমাসের কন্যা। তিনি মা'র নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানাইলেন। ভদ্রমহিলা না-কি সেই ১১ বৎসরের মেয়েটির জন্য খুবই কান্নাকাটি করিতেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে ঐ মেয়েটি তাহার সমবয়স্কা অনেক মেয়েদের সঙ্গে একস্থানে বসিয়া যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। স্থানটিও খুবই মনোরম। আবার ভদ্রমহিলার স্বামী স্বপ্নে দেখিলেন যে সেই মৃত মেয়েটি আসিয়া দুঃখ-সহকারে বলিতেছে,—"বাবা, মা আমার জন্য বড়ই কান্নাকাটি করছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। এবার মার কোলে চললাম।" এই বলিয়াই যেন সেই মেয়েটি একটি শিশুমূর্তিতে পরিণত হইল এবং ভদ্রলোকটি শিশুকে তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে দিলেন। আর এদিকে ঐ স্বপ্ন দেখিবার পরই ভদ্র-মহিলার গর্ভসঞ্চার হয়। তাহার এক বৎসরের মধ্যে ঐ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল এবং সেই কন্যাকে লইয়াই এবার মা'র নিকট দেখা করিতে আসিয়াছেন।

এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মা বলিয়াছেন,—"মৃত আত্মার জন্য কান্নাকাটি করলে কখনও কখনও তাহার অকল্যাণ হয়। এইরূপ অনেক ঘটনা শোনা গেছে। তাই কর্তব্য ধীর স্থির-ভাবে আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করা। তিনিই দেন, আবার তিনিই নিয়া নেন। সুতরাং মানুষের আর কী করবার আছে?"

মৃত আত্মার জন্য কান্নাকাটি করিতে নাই।

ঐ দিনই মা আরও একটি গল্প সকলকে বলিয়াছেন। নারায়ণ স্বামী তাহাও বিস্তারিতভাবে জানাইয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ফকির ছিলেন। দুইজনে খুবই বন্ধুত্ব। একদিন এক ঘটনা হইল। ব্রাহ্মণটি একস্থানে বসিয়া খুব পাকা কাঁঠালের গন্ধ পাইতেছেন। সেটি কাঁঠালের সময় আদৌ না। তবুও কোথা হইতে কাঁঠালের এমন গন্ধ আসিতেছে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বাগানে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে কোথাও কাঁঠালের নাম-গন্ধও নাই। অগত্যা কিছু বুঝিতে না পারিয়া সেই ফকিরের নিকট গিয়া সকল কথা বলিলেন। ফকির সাহেব বেশ একজন ভাল সাধক। কিছু কিছু অলৌকিক শক্তিও ছিল। একটু সময় নীরব থাকিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন। দুইজনে যাইতে যাইতে একটি নদীর পাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নদী পার হইয়া একটু গিয়াই দেখিতে পাইলেন একখানি কুটীরের ভিতর বসিয়া একজন ব্রাহ্মণ পাকা কাঁঠাল দিয়া তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা নাকি খুবই পাকা কাঁঠাল ভালবাসিতেন। তাই তিনি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু কষ্ট করিয়া একটি কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধে অর্পণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ফকির সাহেব তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন,—"দেখ বন্ধু, এই ব্রাহ্মণটির তুমিই গত জন্মে পিতা ছিলে। তুমি তখন পাকা কাঁঠাল খুবই ভালবাসিতে। তাই শ্রাদ্ধে দেওয়া কাঁঠালের গন্ধ তুমি তোমার নিজের ঘরে বসিয়াও পাইতেছিলে।"

এই গল্পটি বলিয়া মা নিজে বলিলেন,—"তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির

উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তু অর্পণ করা যায়, তার দ্বারা মৃত আত্মার তৃপ্তি হইয়া থাকে। আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায়, শ্রাদ্ধ করিয়া কী লাভ? মৃত ব্যক্তি কিভাবে তাহা ভোগ করিবে। কিন্তু এরূপ বহু সত্য ঘটনা আছে যেগুলি তুমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। তাই কোন জিনিসই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে নাই।"

আমি আজ সকালে পুনা হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১১৷৷০টায় আসিয়া বম্বেতে ভাইয়ার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। পুনাতে মা'র নির্দেশমত মা যাইবার পরও ঠিক আরও এক মাস থাকা হইয়াছে। এখন বম্বের ডাক্তারেরা যদি আমাকে যাইতে অনুমতি দেন, তবেই আমি মা'র নিকট দেরাদূন চলিয়া যাইতে পারি।

২১শে জুলাই ১৯৫৭।

দেরাদূন হইতে লিখিত পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। মা ওখানে বিশ্রামেই আছেন। বিকালের দিকে প্রায় প্রত্যহই কল্যাণবনে বেড়াইতে যান। একবার হাঁটিয়াই যান। বিকালের দিকে মোটরে আনা হয়।

একদিন বিকালে মা সেখানে গিয়া সম্মুখের বাঁধান স্থানটিতে পায়চারি করিতেছেন, জলন্ধরের সর্দার ভগবন্ত সিংও (রামজী) মা'র সঙ্গেই ছিলেন।

বীজ দিয়া বীজ নাশ করিতে হয়।

একটি বড় গাছের গোড়ায় একটি মূলা গাছ হইয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐ দিকে মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বীজ দিয়ে বীজকে নাশ করতে হয়। মানে বীজমন্ত্র জপ করতে করতে কর্মের বীজ নষ্ট হয়। তখন আর সৃষ্টি হয় না।"

ইতিমধ্যে একদিন স্বামী শরণানন্দজী মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি, যদিও বাল্যকাল হইতেই অন্ধ। মাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। কয়েক বৎসর হয় তাঁহার ভক্তেরা বৃন্দাবনে আমাদের আশ্রমের সম্মুখেই 'মানব-সেবা সঙ্ঘ' নামে একটি আশ্রম বানাইয়া দিয়াছেন।

২৪শে জুলাই ১৯৫৭।

দেরাদুনের পত্রে জানিলাম, ওখানে আশ্রমে অখণ্ড ভাগবতপাঠ পরশু সকাল হইতে সুরু হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের হিন্দী অনুবাদ ব্যাখ্যাও চলিতেছে। আর অনেকে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র অখণ্ডরূপে জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল পাঠ শ্রীযুক্ত বাটুদা, ব্রহ্মচারী কান্তিভাই, অধ্যাপক শম্ভুবাবু, শাশ্বতানন্দ স্বামী, ব্রহ্মচারী ভরদ্বাজ, কুসুম ও কলিকাতার বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন। মা-ও সকলকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝেই পাঠে আসিয়া বসেন।

২৬শে জুলাই ১৯৫৭।

কুসুমের পত্রে জানিলাম যে অখণ্ড ভাগবত-পাঠ ৩৮॥০ ঘণ্টায় সমাপ্ত হইয়াছে। সমাপ্তির সময় মা উপস্থিত ছিলেন। বেশ সুন্দরমত সব কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২৮শে জুলাই ১৯৫৭।

দেরাদুন হইতে ২০ তারিখের লেখা পত্র আসিয়াছে।

কাশীতে অনাথ গত ২৪শে সকাল প্রায় ১০টার সময় দেহরক্ষা করিয়াছে। মা'র নিকট ঐদিন রাত্রিতেই তার গিয়াছিল।

অনাথ গত কয়েক বৎসর হয় বাত-ব্যাধিতে খুবই কষ্ট পাইতেছিল। মায়ের পুরাতন ভক্ত। অসুস্থতার জন্য দিল্লী হইতে চাকুরীতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশী আসিয়া আশ্রমের সন্নিকটেই একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া পরিবার লইয়া থাকিতেছিল। বেচারা শেষদিকে খুবই কষ্ট পাইয়াছিল। এতদিনে কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিল।

পরশু হইতে আশ্রমে আবার সকাল-বিকাল দুইবার এক এক ঘণ্টা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা সুরু হইয়াছে। বোধ হয় ১৪ দিনে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শেষ হইবে। তাহা ছাড়া মা'র নির্দেশমত আশ্রমে সকলে মিলিয়া অখণ্ড-ভাবে দিবারাত্রি জপ শুরু করিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মেয়েরা সময় ভাগ করিয়া নিল এবং সমস্ত রাত্রিটা ছেলেরা জপ করিতেছে। যাহাতে কেহ বৃথা সময় নষ্ট না করে সেজন্য মা'র বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়।

শ্রীমান্ পানু গত পরশু কলিকাতা হইতে মা'র নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কাশীতে অনাথের মৃত্যুর সময় সে নাকি উপস্থিত ছিল। অনাথ দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে খুবই কষ্ট পাইতেছিল। সেইজন্য তাহার একমাত্র পুত্র কান্তি তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে গোগ্রাস দিতে দিতেই অনাথের প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যায়। পুরাণেও দেখা যায় যে এইসব সময়ে প্রায়শ্চিত্ত যদি ঠিক ঠিক বিধিমত করা যায় তবে হয় রোগী সুস্থ হইয়া ওঠে, অথবা সঙ্গে সঙ্গে সে কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করে।

বিধিমত শাস্ত্রীয় কর্মের ফল অনিবার্য।

এই কথা শুনিয়া মা-ও নাকি বলিয়াছেন,—"দেখ এও একটি বিশেষ কথা। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।"

৩০শে জুলাই ১৯৫৭।

আজ সন্ধ্যায় আমি ফ্রন্টিয়ার মেলে দিল্লী রওনা হইলাম। সেখানে আগামী কাল সন্ধ্যায় পৌঁছিয়া আবার রাত্রে মুসৌরী এক্সপ্রেসে দেরাদুন রওনা হইব। আমার সঙ্গে আছে সরোজ, ঠাকুরমা তুলসী ও পারুল।

১লা আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ সকাল প্রায় ৮টার সময় দেরাদুন আসিয়া পৌঁছিলাম। গতকাল দিল্লীতে ষ্টেশনে বহুলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল।

এখানে আসিয়াই শুনিলাম মা'র শরীরটা খুবই খারাপ যাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, দেরাদুন হইতে ২৭শে তারিখ রওনা হইয়া ভাইয়ার মেয়ে সুনয়না ও আহমদাবাদের ঠাকুরভাই মুন্সার মেয়ে বীণা ২৯শে বম্বে পৌঁছিলেই তাহাদের সঙ্গে আমার মা'র শরীর সম্বন্ধে কথা হইল। কিন্তু তাহারা মা'র শরীর যে এইরূপ সে-বিষয়ে কিছুই বলিতে পারে নাই। পরে শুনিতে পাইলাম যে, আমরা ওখানে সংবাদ পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িব সেইজন্যই মা'র নির্দেশমত কোনও খবর দেওয়া হয় নাই।

গত ২৬শে রাত্রি হইতেই মা'র শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। পরদিন রাত্রিতে মা'র শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। মা বাহিরে বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া শুইয়া

পড়েন। হার্টের palpitationও খুব হইয়াছিল, এবং নাড়ীর গতিও এত দ্রুত যে গণনা করা যাইতেছিল না। অনেকেই ঘাবড়াইয়া যায় এবং স্থানীয় একজন বড় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে হার্টের অবস্থা বেশ দুর্বল। তাই যাহাতে সর্বদা বিশ্রামে থাকেন, ইহাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু পরদিবস বিকালে মা নিজের খেয়ালে অল্প অল্প সর্দির মধ্যেই বৃষ্টির জলে বাহিরে বসিয়া স্নান করিয়াছেন। মা নাম দিয়াছেন 'আকাশ-গঙ্গায় স্নান'। মা'র সবই অদ্ভুত।

তবু মা এখন বিশ্রামেই আছেন। নীচে আর নামেন না। সকলে আসিয়া উপরে মা'র ঘরে দেখা করিয়া যাইতেছে।

২রা আগষ্ট ১৯৫৭।

পীড়িতা মা।

গতকাল রাত্রিতে মা'র শরীরের অবস্থা আবার বেশ খারাপ হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ২টার সময় মা নিজেই উঠিয়া একবার বাথরুমে যান। ঘরে বুনি ও সতী ছিল। তাহারা দেখিল মা'র ভাব স্বাভাবিক নহে। সমস্ত মুখ হইতে যেন একটি অপূর্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। মা হাসিতে হাসিতে তাহাদের বলিলেন,—"এখনই ত সময়। মাথা ধোব, মুখ ধোব। ব্যস্, সকালে আর আমার কিছুই করার থাকবে না।"

মা কখনো কখনো মাঝে মাঝে একটু মাথায় জল দেন। ঐ মধ্যরাত্রে হঠাৎ মা'র মাথা ধুইবার কথা বলায় তাহারা খুবই অবাক্ হইল। মা গিয়া ভাল করিয়া মুখ ধুইয়া, মাথা ধুইয়া আসিয়া আবার বিছানায় শুইলেন। একটু পরে বুনিকে হাওয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু হাওয়া দিতে দিতেই

মা'র শরীরে এক অদ্ভুত কম্পন সুরু হইল। এমন কম্পন যে দুই-তিন জনেও মায়ের শরীর চাপিয়া ধরিয়া স্থির রাখিতে পারিতেছিল না। তাহারা ঘাবড়াইয়া গিয়া আমাকে এবং নারায়ণ স্বামীকে মা'র ঘরে ডাকিয়া আনিল। একটু পরে মাকে ধীরে ধীরে একটু হরলিকস্ খাওয়ান হইল। কিছু সময় পর মা যেন একটু চুপ করিলেন। তখন রাত্রি ৪টা। ঘরের মধ্যে আমি, নারায়ণ স্বামী, বেলু, বুনি ও সতী।

মা বাম কাৎ হইয়া শুইয়া আছেন। চক্ষু বন্ধ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দু'জন পুরুষমূর্তি আসছে, যাচ্ছে; কত রকম কি বলছে।" এইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। আর কিছু বলিলেন না।

নারায়ণ স্বামী মা'র কাছে প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা, তুমি খেয়াল করলেই সব-কিছু হয়। আমাদের কাতর প্রার্থনা যে তুমি একটু খেয়াল করে আমাদের জন্য তোমার শরীরটা ভালো করে তোল।" মা আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, এই শরীরটার খেয়াল হলে সেটা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।" মা কথাগুলি যেন বেশ জোর দিয়া বলিলেন। মা স্বয়ং কতভাবে নিজ পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তবুও আমাদের সর্বদা সেই অটুট অবস্থা থাকে কই! ইহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের কথা কি হইতে পারে?

আমরা প্রায় ৪॥৹টার পর মা'র ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা একটু চুপ-চাপ যেন শুইলেন।

গতকাল দুপুরে মিসেস্ সভরওয়াল তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া মা'র নিকট প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটি মাদ্রাজে বর্মা শেল কোম্পানীতে কাজ করে। দিল্লীর কমলা জয়সোয়ালের ছোট বোন নিনাকে সে বিবাহ করিয়াছে। শীঘ্রই দুইজনে বিলাত যাইতেছে। সেইজন্য মা'র আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে। যাইবার সময় মা পুত্রবধূর হাতে দুইটি ফল দিলেন। ইহা দেখিয়াই মিসেস্

একটি ঘটনা।

সভরওয়াল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মাতাজী, আবার সেই ফল!" প্রথমে আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পরে শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত আগা সাহেব যখন কয়েকদিন পূর্বে এখানে আসিয়াছিলেন তখন সকলের সম্মুখে তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বলিয়া গিয়াছেন। তাহাও এই ফল লইয়াই ঘটিয়াছে।

ঘটনাটি এইরূপ যে, আগা সাহেব তখন উত্তর প্রদেশের Deputy Superintendent of Police-রূপে কার্য করিতেছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মা'র সহিত বিশেষ মেলা-মেশার সুযোগ পান নাই। একবার কোনও কার্য উপলক্ষে সস্ত্রীক মুসৌরী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে এখানে আশ্রমে মা'র দর্শনের জন্য নামিলেন। তবে ভিতরে আসিয়া শুনিলেন যে মা বিশ্রাম করিতেছেন, তাই তখন দর্শন হওয়া কঠিন। তিনি নিরাশ হইয়া মোটরে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় কেহ আসিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল,—"মা ডাকিতেছেন।" তাঁহারা উভয়ে মা'র নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। আসিবার সময় মা তাঁহার স্ত্রীর হাতে একসঙ্গে তিনটি ফল দিলেন। আশ্চর্য, এই ফল তিনটি খাইবার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের তিনটি সন্তান জন্মে। সেই সময়ে অবশ্য তাঁহাদের অন্য কোন সন্তানাদি ছিল না। তাঁহাদের মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে মা'র কৃপাতেই এইভাবে তিনটি সন্তান হইয়াছে এবং মা সেইজন্যই তাঁহাকে তিনটি ফল একসঙ্গে দিয়াছিলেন।

ইহার বেশ কয়েক বৎসর পরে, আগা সাহেব যখন লক্ষ্ণৌতে বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, সেই সময় মা একবার সেখানে গিয়াছিলেন। মা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া তিনি সস্ত্রীক মা'র দর্শনের জন্য যান। সেবারও যখন প্রণাম করিয়া উঠিলেন এমন সময় মা তাঁহার স্ত্রীর হাতে দুইটি ফল দিতে যাইতেছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মাতাজী, আর চাই না।" তাঁহারা মনে করিলেন যে মা'র দেওয়া দুইটি ফল গ্রহণ করিলেই হয়ত আবার দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু আর সন্তানের

অভিলাষ না থাকায় তাঁহারা তখন মাকে নম্রভাবে মনের কথা এবং পূর্বের ঘটনাও জানাইলেন। আশ্চর্য এই যে, সেই কবে দেরাদুনে মা তাঁহার স্ত্রীর হাতে ফল দিয়াছিলেন, তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কতবার তাঁহারাও মা'র দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মা'র নিকট ঐ তিনটি সন্তানের জন্মের কারণ সম্বন্ধে মাকে কিছুই বলেন নাই। সেবার লক্ষ্ণৌতে যখন মা আবার দুইটি ফল দিতে গেলেন তখনই তাঁহারা ঐ বিষয়ে মাকে সমস্ত কিছু জানাইলেন।

এবারও দেরাদুনে আসিয়া মা'র ঘরে বসিয়া ঐ কথাই সকলের সম্মুখে বলিয়াছেন। তখন মিসেস্ সভরওয়ালও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উহা সব শুনিয়াছেন। আজ তাই মা যখনই তাঁহার পুত্রবধূর হাতে দুইটি ফল দিলেন, তখনই তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে তাহার নিশ্চয়ই দুইটি সন্তান হইবে।

এইরূপ ঘটনা মা'র নিকট অনেক সময়ই ঘটিতে দেখা যায়। প্রায় তিন বৎসর পূর্বের কথা। মা একবার কাশীতে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাসার সম্মুখে মোটরে বসিয়া আছেন। গোপালদাদার মেয়ে রাধু আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা তাহার হাতে দুইটি মালা একসঙ্গে দিলেন। উপস্থিত কেহ কেহ ইহা দেখিয়া হয়ত ভাবিলেন 'দুইটি' কেন? কিন্তু মা পূর্ব হইতেই সমস্ত কিছু দেখিতেছিলেন। ইহার পরেই মা বম্বে চলিয়া আসেন। সেখানে গিয়া আমরা সংবাদ পাইলাম যে হঠাৎ যোগাযোগ হওয়ায় রাধুর বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। মা যখন আসিতেছিলেন তখন বিবাহের কোন কথাই ছিল না। কিন্তু মা পূর্ব হইতেই রাধুকে দুইটি মালা দিয়া আসিলেন।

আজও রাত্রে মা'র শরীরটা বেশ খারাপ হইয়া পড়িল। সেবা গিয়া মিসেস্ সভরওয়ালকে সংবাদ দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া স্থানীয় একজন হার্ট রোগ-বিশেষজ্ঞ মেজর সিংকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার দেখাইয়া কোনই লাভ নাই, চিকিৎসা যখন করা যাইবে না। কিন্তু মিসেস সভরওয়াল

বিশেষ আগ্রহ-সহকারে লইয়া আসিয়াছেন তাই মাকে পরীক্ষা করিতে না দিয়া বিদায় দিতে পারা গেল না। ভদ্রলোক আসিয়া মা'র হার্ট দেখিয়া পরে রক্তের চাপ পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। মা'র রক্তের চাপ পূর্বেও কয়েকবার লওয়া হইয়াছিল—সর্বদাই normal পাওয়া গিয়াছে। মেজর সিং পরীক্ষা করিবার সময় হাতে স্ট্রাপ্ একটু জোর দিয়া বাঁধিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার হার্টের স্পন্দনও বাড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার চলিয়া গেলেন। কিন্তু মধ্যরাত্রিতে মা'র হার্টের স্পন্দন ও নাড়ির গতিও সঙ্গে সঙ্গেই খুব আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িল।

মা'র শরীরের সমস্ত কিছুরই এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যে সকলে হয়ত দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিবে না। রক্তের চাপ লইবার সময় হাতে স্ট্রাপ্‌টি একটু জোর দিয়া বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গেই মা'র হার্টের উপর যে প্রতিক্রয়া আরম্ভ হইবে ইহা কোন ডাক্তারই অনুমান করিতে পারিতেন না। সুতরাং ডাক্তারদের এ-সব কারণে দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি এত দীর্ঘ দিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও মা'র শরীরের ধারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আর নূতন ডাক্তার কিংবা অন্য কেহ কিভাবে তাহা বুঝিতে পারিবে!

৩রা আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ সকাল হইতেই মা'র শরীর খারাপ। বিছানার ওপরেই শুইয়া আছেন। অনেক বেলাতে একবার উঠিয়া বাথরুমে গেলেন। তখন মাকে সামান্য একটু কিছু খাওয়ান হইল। সকলের দর্শনের সময় সন্ধ্যার পর আধ ঘণ্টা এবং রাত্রে মৌনের পর আধ ঘণ্টা রাখা হইল। ঘরের বাহির হইতেই এক এক করিয়া সকলে প্রণাম করিয়া যাইবে।

মায়ের অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

মা'র নাড়ির গতি খুবই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। সেবা কিছুক্ষণ পর পরই মা'র নাড়ি দেখে। কখনো গতি খুবই দ্রুত আবার কখনো এত ধীরে ধীরে চলিতেছে যে পাওয়াই যায় না ভালমত। মা চুপচাপ অসাড়ভাবে পড়িয়া আছেন। হাত-পায়ের শেষ অংশ খুবই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।

সকালে মা'র এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি মায়ের ভক্ত ডাক্তার সোমকে সংবাদ দিলাম। তিনি ইতিপূর্বেও মাকে বহুবার দেখিয়াছেন। মা'র এই অবস্থায় যে কি করা উচিত তাহা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মনকেও স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। ডাক্তার সোম বিকাল ৪টার পূর্বে আসিতে পারিবেন না বলাতে হেমবাবু তাড়াতাড়ি স্থানীয় ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদকে লইয়া আসিলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি আসিয়া মাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে হার্টের সেরূপ কোনই রোগ দেখা যায় না ; তবু এরূপ অবস্থা কেন হইতেছে তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। Lungsও স্বাভাবিক। শরীরেও অন্য কোন রোগ নাই। যাহাই হউক, তিনিও মাকে বিশ্রামে রাখিতে বার বার বলিয়া গেলেন এবং মা'র উপযুক্ত খাদ্যাদির list বানাইয়া দিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সোম আসিয়া আবার মাকে পরীক্ষা করিলেন। তিনি বসিয়া থাকিতে থাকিতে মা'র শরীর কেমন যেন হইয়া পড়িল। একটু পরে মা নিজের মুখে তাঁহাকে শরীরের অবস্থাটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্ণনা করিলেন।

মা'র শরীরের এইরূপ অবস্থা যাইতেছে, এই সময় যদি অন্যান্য স্থানের ভক্তদের সংবাদ না দেওয়া হয় তবে তাঁহারা সকলেই আমাকে পরে বিশেষ অনুযোগ দিবেন। সেইজন্য শ্রীহরিবাবাজী, অবধূতজী, যোগীভাই, ভাইয়া, ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত, পটল, কান্তিভাই, মুকুন্দভাই, টিহরীর মহারাজা প্রভৃতি আরও অনেককে তার বা চিঠিতে মা'র সংবাদ দেওয়া হইল।

একটু সুযোগ পাইয়া মাকে এই কথা বলায় মা বলিলেন,—"এ শরীরের

কোনও কথা নেই। তোমরা খবর দেও না দেও। তবে গোপী বাবা এই শরীরটার কথা চিন্তা করে তাই তাকে একটা চিঠি দিতে পার।" তাই কবিরাজ মহাশয় এবং অমূল্যদাদাকে মা'র বিষয়ে জানাইলাম।

পরমানন্দ স্বামিজী পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে কলিকাতায় নূতন আশ্রম কেনা সংক্রান্ত বিষয়ে গিয়াছেন। তিনি হয়ত আরও কয়েকটি দিন ওখানে থাকিতে পারেন। কিন্তু মা'র এই অবস্থায় স্বামিজী এত দূরে আছেন তাহা ভাল লাগে না। তাই স্বামিজীকেও মা'র অবস্থা জানাইয়া আসিতে লিখিয়া দেওয়া হইল।

৫ই আগষ্ট ১৯৫৭।

মা'র শরীর খারাপই চলিতেছে। কখনো একটু একটু কথাবার্তা বলেন বা একটু স্বাভাবিক মনে হয়। আবার অন্য সময়ে এমনভাবে চুপচাপ পড়িয়া থাকেন যে দেখিলেও মনে ভয় হয়।

মা'র সংবাদ পাইয়া দুপুরে বৃন্দাবন হইতে শ্রীহরিবাবাজী, অবধূতজী, এবং সঙ্গে স্বরূপানন্দ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা মা'র নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া কল্যাণবনে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মা একটু একটু কথা-বার্তা বলাতে যাহা পরিশ্রম হইল তাহাতেই মা'র শ্বাসের গতি বিকালের দিকে পুনরায় খারাপ হইয়া পড়িল।

রাত্রি ৯টার পরে হরিবাবাজী ও অবধূতজী আবার মা'র ঘরে আসিলেন। হরিবাবা মা'র নিকট তাঁর জীবনের এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তাঁহার বোধ হয় একান্ত অভিপ্রায়, যে কোনও ভাবে যদি মা'র শরীর সুস্থ করিবার খেয়ালটি আনা যায়। মা'র বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় তাঁহার নিত্য কীর্তনও করেন নাই। মা'র এইরূপ অবস্থার ভিতরেও সমস্ত কিছুই খেয়াল আছে। মা হরিবাবাজীকে আস্তে আস্তে

বলিলেন,—"বাবা, এই শরীরের জন্য তুমি কিন্তু কীর্তন বন্ধ করিও না। কীর্তনের শব্দ ত ভগবানের নামের শব্দ—ভালই ত!"

৬ই আগস্ট ১৯৫৭।

গতকাল রাত্রি প্রায় ১২টায় মা'র শ্বাসের এবং নাড়ীর গতি আবার যেন কেমন হইয়া পড়িয়াছিল। পায়ের শেষ অংশ বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ ঘসিয়া দিবার পরে যেন কিছুটা স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল।

কাশী হইতে ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত ও পটল মাকে দেখিবার জন্য আজ সকালে আসিয়া পৌঁছিলেন। গোপালদাদাকে আমিই আসিবার জন্য তার করিয়াছিলাম। কারণ মা'র কখন, কোন্ সময়, কি রকম অবস্থা হইয়া পড়ে। সম্মুখে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক থাকিলে তিনি তবু প্রকৃত অবস্থাটি কিছু হয়ত বুঝিতে পারিবেন। আমাদেরও মনে কিছুটা শান্তি আসিবে। তাহা ছাড়া, গোপালদাদা মা'র শরীরের ধারা বহুদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবস্থাটা কিছু বুঝিতে পারিলে মা'র শরীরের ভাবের অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা হয়ত করিতে পারেন।

তাঁহারা আসিবার একটু পরেই দিল্লী হইতে মোটরে ভাইয়া ও কানিয়া-ভাই আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা গতকাল সন্ধ্যায় বম্বে হইতে প্লেনে দিল্লী রওনা হইয়া আসিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে আসিবার সময় ডাক্তার বলরামজীকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। বলরামজী দিল্লীর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আমি নিজে তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিলাম এবং আশ্রমের অনেককেও তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন।

মা চুপচাপ পড়িয়াই আছেন। বেলা প্রায় ২টার পর মাকে আমি গিয়া আস্তে আস্তে তুলিলাম। তখন পর্যন্ত মা'র মুখও ধোওয়ান হয় নাই। মা

উঠিয়াছেন সংবাদ পাইয়া গোপালদাদা, পটল, ভাইয়া, কানিয়াভাই, বলরামজী প্রভৃতি আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলাম। মা আবার চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে মৌনের পর হরিবাবাজী ও অবধূতজী মাকে দেখিতে উপরে আসিলেন। অবধূতজী মা'র নিকটে আসিয়া মাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। হরিবাবাজীকে একটি চেয়ারে মা'র বিছানার সম্মুখে বসিতে দেই। তাঁহার সঙ্গে মা শুইয়া শুইয়াই দুই-একটি কথা মাঝে মাঝে বলিতেছেন। তাহাও যেন একপ্রকার জোর দিয়া বলা হইতেছে। হরিবাবাজীই কথা বলিতেছেন। কথাবার্তা বলিয়া মায়ের ভাবের পরিবর্তন করাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু তিনি কথা বলিতে বলিতেও মা যেন মাঝে মাঝে কেমন এলাইয়া পড়িলেন। যেন অন্য সকলের দিকে কোন খেয়ালই নাই। সাধারণতঃ হরিবাবাজী প্রভৃতি মহাত্মারা আসিলে মা কিরূপভাবে কথা বলেন, কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা আমরা সর্বদাই দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখন যেন হরিবাবাজী যে বসিয়া আছেন, বা কি বলিতেছেন, তাহাও যেন খেয়ালে নাই। এইসব অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়াও সকলে আরও বেশী আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে।

হরিবাবাজী চলিয়া গেলেও মা অনেকক্ষণ নিঃসাড়ভাবে বিছানায় শুইয়া রহিলেন। রাত্রিতেও কয়েকবারই অবস্থা যেন কেমন হইল। সমস্ত রাত্রি আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠায় কাটে। সর্বদা দুইজন করিয়া মা'র সেবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাত্রিতেও এই ব্যবস্থা।

আজ একাদশী হইতে ঝুলন আরম্ভ। মা'র শরীরের অবস্থা এইরূপ, তাই কাহারো মনে কোন প্রকার আনন্দ নাই। মা সুস্থ থাকিলে আজ মাকে লইয়া সকলে কতই না উৎসব করিত। কিন্তু তবু আশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য নীচে হলঘরের পিছনের বারান্দায় ঝুলন একটু সাজান হইয়াছে। মা একটু না দেখিলে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইবে বলিয়া মাকে ধীরে ধীরে

উপরের বারান্দায় একটা চেয়ারে আনিয়া একটু সময় সন্ধ্যার পরে বসান হইয়াছিল। সেখান হইতে নীচের বারান্দায় ঝুলন দেখিতে পাওয়া যায়। মা একটু আসিয়া বসিলেন। ইহাতেই সকলের মনে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। সমস্ত উৎসব, সমস্ত আয়োজন, সমস্ত পরিশ্রম যেন সার্থক হইয়া গেল।

ডাক্তার বলরামজী এবং গোপালদাদা মাকে বেশ ভাল করিয়া আজ পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কোনও অসুখ তাঁহারা পাইলেন না। Heart, Lungs, Blood Pressure ইত্যাদি সবই স্বাভাবিক। তবু মা'র শরীরের অবস্থা যে কেন এইরূপ হইতেছে তাহা তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোথাও লেখা নাই। রোগ না পাইলে চিকিৎসা করা যায় না। রোগের কোনও প্রকাশ নাই, ওদিকে শরীরের এইরূপ অবস্থা—ইহার কারণ নির্ণয় করা তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বাহিরে। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন,—"এ শরীর সব সময়ই ভাল আছে। যা হয় তাই ঠিক।" আবার এক এক সময় বলিতেছেন—"গত আট মাসের উপর এ শরীরের শোবার কোনও ভাবই নেই। অন্য শরীর হলে যে কি হ'ত বলা কঠিন। তবে এই শরীরের ত কোন কথাই নেই। এও এক রূপ।"

৭ই আগষ্ট ১৯৫৭।

প্রায় ১১৷৷৹টার পর মা আজ নিজেই একটু উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কোনও কথা নাই। টান হইয়া একেবারে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছেন। মুখের ভাবটিও কেমন একটু অস্বাভাবিক। অনেকে মা'র শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া মনে করিলেন যে মা'র শরীরে হয়ত কোনও ক্রিয়া চলিতেছে। কাহারো কাহারো মনে একটু আশার সঞ্চারও হইল যদি ইহার পর হইতে মা'র শরীর একটু ভাল দেখা যায়। ভাইয়া

ত বলিয়াই উঠিলেন,—"মাতাজী বোধ হয় আমাদের সকলের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাই এইরকম ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এখন মা নিশ্চয়ই ভাল হইবেন। যাহা হউক প্রায় এক ঘণ্টার উপর ঐভাবে বসিয়া থাকিয়া মা নিজেই আবার শুইয়া পড়িলেন। বাহির হইতে বিশেষ কোনও অবস্থার উন্নতি বোধ হইল না। তবে মুখে এক অসাধারণ দিব্য জ্যোতি। যে দেখিল সে-ই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কোথা দিয়া যেন কি হইতেছে তাহা বুঝিয়া ওঠা আমাদের মনুষ্য-বুদ্ধিতে অসম্ভব। মা নিজে কৃপা করিয়া যদি কিছু বলেন তবেই আমরা একটু বুঝিতে পারি।

বেলা প্রায় ৪টার পর মাকে ধরিয়া বসাইয়া সামান্য কিছু খাওয়ান হইল। সন্ধ্যার সময় অল্পক্ষণের জন্য মা'র দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে আসিয়া দরজার বাহির হইতে প্রণাম করিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে তিন-চার জনের বেশী লোক আসা বা মা'র সঙ্গে কথা বলা বা মাকে স্পর্শ করা ডাক্তারেরা সকলেই নিষেধ করিয়াছেন।

বিকালে বলরামজী মোটরেই দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন। তিনি এখানে থাকিয়াই বা কি করিবেন? তাঁহাদের বিদ্যার ভিতরে ত কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। মা'র খাওয়া-দাওয়ারও ভাব একেবারেই নাই। মা বলিলেন,—"ভিতর থেকে সব যেন বন্ধ হয়ে আসছে।" মুখে কিছু দিলেও সত্যই যেন ভিতরে যাইতে চায় না। মুখের ভিতরেই হয়ত থাকিয়া যাইতেছে। এ এক অসাধারণ অবস্থা। অনেকেই বলিতেছিলেন যে হার্টের অবস্থা জানিবার জন্য Electro-Cardiogram লওয়া ভাল। কিন্তু মা'র শরীরে কখনো এইসব করা হয় নাই। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা-ও উদাসভাবে বলিলেন,—"বেশ, তোমরা যদি জিম্মা নিতে পার, তবে নেও।" মা'র শরীরের দায়িত্ব নিবে এইরূপ সাহস কাহার আছে? তাই আমিই বিশেষ করিয়া সকলকে এইরূপ প্রস্তাব করিতে মানা করিয়া দিলাম। আবার সকলকে বিশেষ কিছুই বলা যায় না; মা'র এইরূপ অবস্থা দেখিয়া

সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা করিতেছে কিভাবে মা'র শরীর ভাল হইবে। তাই তাহারা যাহা বলিতেছে তাহাও মায়ের প্রতি অগাধ ভালবাসারই পরিচয়। সুতরাং তাহাদের কার্যে বাধা দিবারও আমার যেন তেমন অধিকার নাই। তবুও সকলকে মায়ের শরীরের অসাধারণ স্বরূপের কথা বলিয়া কিছু কিছু শান্ত করিতে হইতেছে। কেহ প্রস্তাব করিতেছে, "বম্বে হইতে বড় ডাক্তার ডাকা হউক।" কেহ বলিতেছে,—"দিল্লী হইতে বিশেষজ্ঞ লইয়া আসি।" সকলেই মা'র জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। সাধারণ শরীর হইলে এই অবস্থায় যে কখন কি হইয়া যাইত তাহা বলা কঠিন। শুধু মা'র শরীর বলিয়াই এবং মা ইচ্ছা করিলেই আবার সুস্থ হইতে পারেন এই বিশ্বাস আমাদের মনে একটু একটু আছে বলিয়াই এইরূপ অবস্থাতেও আমরা সমস্ত কিছু চালাইয়া লইতেছি। আবার যখন মা'র অবস্থা খুব খারাপ দেখি, তখন মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলের মুখের উপরেই যেন.এক বিষাদের ছায়া।

গতকাল রাত্রে মা আমাকে একবার ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—"দেখা যাচ্ছে একজন পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে ডাক্তারী চিকিৎসার কিছু থাকবে না।" প্রকৃত অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই কয়দিন যাবৎ মা'র মুখ হইতে কোনও প্রকার আশার বাণীই শুনিতে পাইতেছি না, সেই জন্যই আমরা সকলে আরো বিচলিত হইয়া পড়িতেছি।

আজ সন্ধ্যার পর হইতেই মা'র অবস্থা যেন আরও খারাপ মনে হইল। হাত-পা মাঝে মাঝেই একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা ও শক্ত হইয়া যাইতেছে, মাথাও বালিশের উপর নাই। একেবারে শবাসনের মত শুইয়া আছেন। শ্বাস সম্পূর্ণ পড়িতে না পড়িতেই আবার শ্বাস গ্রহণ করা হইতেছে। শ্বাসের গতিটা উর্ধ্ব দিকেই। আবার যখন নীচের দিকে গতি তখন একেবারেই নীচের দিকে। নাড়ীর গতি কখনও ১১০।১১৫, আবার কখনো এত ধীরে

চলিতেছে যে নাড়ী পাওয়াই কঠিন। পেটে বায়ুও বেশ। সেইজন্যই হয়ত হার্টের উপর জোর পড়িতেছে।

হরিবাবাজী রাত্রে আসিয়া মা'র নিকট প্রত্যহের মত বসিলেন। কিন্তু মা'র যেন কোন খেয়ালই নাই। অনেকে মনে করিতেছেন, ইহাও হয়ত সমাধির এক প্রকার অবস্থা। কিন্তু মা'র ভাবাবস্থা দেখিবার সুযোগ আমি অনেক পাইয়াছি। এবার যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। মা'রও কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। কোনও দিকেই যেন কিছু আটকাইবার নাই। প্রায়ই বলিতেছেন, "যখন যা কিছু হয়ে যেতে পারে। এ শরীরের কথাই যা হয়ে যায়।"

হরিবাবাজী চলিয়া যাইবার পর অবধূতজী মা'র নিকট একান্তে অনেক প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিয়াছে যে আগামী কাল সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি মা'র ঘরে বসিয়া কেহ না কেহ শিব বা শক্তির বীজমন্ত্র জপ করে। তাহা ছাড়া, তিনি আরও বলিলেন যে যত শীঘ্র সম্ভব এখান হইতে কেহ কাশীতে গিয়া শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর নিকট মা'র এই অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে জানাক। তাহা ছাড়া, তিনি মা'র শরীর সুস্থ হইবার জন্য কিছু অনুষ্ঠানাদি করিবার নির্দেশ দেন কিনা তাহাও জানিয়া আসা।

শ্রীশঙ্কর ভারতীজী কাশীর একজন অতি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী। তিনি কাশীতে ললিতা ঘাটে একটি আশ্রমে থাকিয়া একান্তে সাধন-ভজন করেন। ঘরের বাহিরে কদাচিৎ আসেন। বাহিরের কাহারও সঙ্গে দেখা-শোনা কথাবার্তাও নাই। মা'র নির্দেশমত গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের আশ্রম হইতেই খাদ্যবস্তু নিয়মিত পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতীজীর সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী আছেন। তিনিই খাবার ব্যবস্থা করেন। ঐ আশ্রমেই গুহার ভিতরে এক দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ভারতীজীর নিকট দেবী প্রায়ই আবির্ভূতা হ'ন, এবং তাঁহার আদেশও তিনি সর্বদাই পাইয়া থাকেন। একবার দেবীর নির্দেশেই ভারতীজী কাহারও নিকট

হইতে মা'র কোনও খবরাখবর না লইয়াই একা হাঁটিতে হাঁটিতে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতীজীর সম্বন্ধে আরও অনেক অলৌকিক বিষয়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

অবধূতজীর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভারতীজী এত দূরে থাকিলেও সেখান হইতেই মা'র শরীরের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হইবেন। তাই তিনি হয়ত এখন কিছু নির্দেশ দিতে পারেন যাহাতে আমাদের সকলেরই শান্তি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, ভারতীজী দেবীর নিকট হইতেও হয়ত কিছু আদেশ পাইতে পারেন। গত বৎসর জয়ন্তী উৎসবের সময় ভারতীজীকে দেবী মা'র সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছিলেন নাকি, কিন্তু সময় এখনো আসে নাই বলিয়া সে-কথা এখনো আমরা কেহই জানিতে পারি নাই।

আজ রাত্রিতে মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাগবতের ব্যাখ্যা কি শেষ হয়েছে?" পরমানন্দজী নিকটেই ছিলেন। তিনি বলিলেন যে আজ বিকালেই শ্রীমদ্ভাগবতের যে ব্যাখ্যা চৌদ্দ দিন পূর্বে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। মা একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাগবতে পরীক্ষিতের গতির কথা কি বলে?" এইটুকু বলিয়াই আর কিছু বলিলেন না। স্বামিজীও ঠিক অর্থ ধরিতে পারিলেন না।

৮ই আগষ্ট ১৯৫৭।

গত রাত্রিতে মা'র শরীরের অবস্থা কয়েকবারই বেশ খারাপ হইয়াছিল। শ্বাসের গতি এবং নাড়ীর অবস্থা ভীতিজনক হইয়া পড়িতেছিল।

আজ সকালে হরিবাবাজী প্রভৃতি মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন শুনিয়া ১১।৹টায় মাকে তুলিলাম। হরিবাবাজী এবং অবধূতজী আসিয়া মা'র সম্মুখে বসিলেন। মা যদিও নিশ্চল হইয়া যেন একরকম নেশার ভাবে

পড়িয়া আছেন, মাথার নীচে বালিশও নাই—সোজা চিৎ হইয়া বিছানার উপর শুইয়া।

অবধূতজী বৃন্দাবনে গিয়া মা'র জন্য কি অনুষ্ঠান করাইবেন সেইজন্য আজ রাত্রেই তিনি বৃন্দাবন রওনা হইয়া যাইবেন। হরিবাবাজীরও আজই ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু মা'র এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আরও দুই-তিন দিন থাকিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হরিবাবাজীর সহিত মা ধীরে ধীরে কথা বলিলেন—"পিতাজী, কাল রাত্রে এইরকম একটা খবর পাওয়া গেল যে কয়েকজন সাধু এই শরীরের কাছে আসবে। কিন্তু শরীরের ভাবটা যেন এইরকম যে, বেশ আসবে, আসবে। তাদের জন্যও সে-রকম যেন কোন খেয়ালই নেই। দেখা গেল ত্রৈলঙ্গ স্বামিজী (এই শরীর যদিও কথনো তাকে দেখে নাই) সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর, মাথায় ছোট ছোট চুল, মুখেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বিশাল পেট নিয়ে এসে এই শরীরের সামনে বসল। একটু পরে দুই হাত দিয়ে মাটীতে ভর করে উঠে যেন সেইখানেই মিলিয়ে গেল। সেইসঙ্গে আরও আট-নয় জন সূক্ষ্মশরীরধারী, তাদের মধ্যে পরীক্ষিৎ নামেও একজন ছিল। কিন্তু ইনিই সেই ভাগবতের পরীক্ষিৎ কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।

"তারা এসে যে সাঘেঁসি করে এই শরীরটার সামনে বসল। এই সময় বুনি ঘরের মধ্যে আসছিল। তাকে বললাম, 'তুই শুতে যা না'। বুনি ঘরের মধ্যে থাকলে পাছে সাধুদের গায়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়—এই রকম যেন ভাবটা। সাধুরা তারপর মাকে পরিক্রমা করে সকলে মিলিয়ে গেল।"

বুনিও বলিয়া উঠিল যে সে কাল রাত্রে দুই-তিন বার মা'র ঘরের মধ্যে আসিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মা প্রতিবারই তাহাকে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যান্য সব মেয়েদেরও সরাইয়া দিয়াছিলেন। বুনি দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল মা নিজে নিজেই মশারীর মধ্যে

বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। ভাবটাও যেন কেমন। কিন্তু মা যাইতে মানা করিয়াছেন, সেইজন্য সে আর ভিতরে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। এখন বুঝিতে পারা গেল যে তখনই সাধু-মহাত্মারা সকলে সূক্ষ্মশরীরে মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। মা'র কথার ভাবে বুঝিলাম সেই সাধুদের মনের ভাব যেন মা'র শরীর সুস্থ হইয়া উঠুক, এই রকমটি। মা ত অবশ্য নিজের বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কিছুই বলেন না।

সন্ধ্যাবেলা অবধূতজী মা'র কাছে বসিয়া আছেন। তিনি আজ রাত্রের গাড়ীতেই বৃন্দাবন যাইতেছেন। সঙ্গে স্বরূপও চলিয়া যাইতেছে।

মা কথায় কথায় অবধূতজীকে বলিলেন,—"কালকেই দেখা যাচ্ছিল অবধূত পিতাজী ও হরিবাবা এই শরীরের কাছে এসেছে (বলা বাহুল্য সকলেই সূক্ষ্মে)। অবধূত বাবা সাধারণতঃ এই শরীরটার সঙ্গে একাসনে কখনো বসে না। কিন্তু তখন এসে চৌকির একপাশে গিয়ে বসল। মনের মধ্যে তীব্র সঙ্কল্প যে মা'র শরীর ভাল করবই। এই ভাবটি নিয়ে এসে এই শরীরের হাতের নখের কোণা দিয়ে একটু কিছু যেন উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। ঐ সময়ে আর একজন কে যেন বলল—কিছুটা থেকেও যেতে পারে। কিন্তু অবধূত পিতাজীর ভাব যেন—'না, এই শরীরকে ভাল করবেই। আবার একটু পরে হরিবাবাকে দেখা গেল গম্ভীরভাবে বসে কি চিন্তা করছেন। তাঁরও ভাবটা যেন কী করে এই শরীরকে ভাল করা যায়।"

অবধূতজী মা'র এই কথা শুনিয়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হাঁ, কাল সারা রাত্রি সত্যই আমার মাথায় কেবল একটি কথাই ঘুরছিল যে কি করে মা'র শরীর ভাল করা যায়।" মা-ও সেই ভাবেরই প্রকাশ দেখিয়াছেন। এইসকল কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরই একটু আনন্দ হইল। মহাত্মাদের তীব্র ইচ্ছা হইলে মা'র শরীর নিশ্চয়ই আবার তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া উঠিবে।

হরিবাবাজী গতকাল রাত্রেও মা'র নিকট আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—"মাতাজী, আপনি এই সঙ্কল্প করুন যে, হরিবাবার উদ্ধারের জন্যই শরীর সুস্থ করতে হবে।" সত্যই মহাত্মার ভাবটি কী সুন্দর, কী পবিত্র। অন্য কিছু যদি না-ও হয়, তবে অন্ততঃ তাঁহার নিজ উদ্ধারের কথা বলিয়াও যদি মার খেয়ালটি সুস্থ হইবার দিকে ফিরাইয়া আনা যায়।

কিন্তু মা আবার এই কথার রেশ ধরিয়াই পরে বলিতেছিলেন—"এই শরীরের ত কোনো বন্ধনই নাই। এটা করা হয় নাই, এটা করতে হবে,—এ শরীরের সে দিকটাই নাই। তোমরাও সবাই জান যে এ শরীরের ঐ রকম কোনও ভাবও নাই যে কোনও কিছুর জন্যে বসে থাকা। যা হয়ে যায়, তাই ঠিক। এই শরীর ত কোনও সঙ্কল্প করে আসে নাই।"

৯ই আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ সকালে ৮॥৹টায় ভাইয়া ও কানিয়াভাই মোটরে দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন। সেখান হইতে আজই বৈকালে প্লেনে বম্বে ফিরিয়া যাইবেন। মা গত কালই বলিয়াছিলেন যে যাইবার সময় যেন তাঁহারা মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া যান। তাঁহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মা মাত্র দুই-একটি কথা বলিয়াই আবার চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

১১॥৹টার পর হরিবাবাজী প্রভৃতি মা'র নিকটে আসিয়া বসিলেন। এই কয়দিন ধরিয়াই দেখিতেছি যে মা কাৎ হইয়া থাকিলে শ্বাসের গতি আরও খারাপ হয়। আবার চিৎ হইয়া শুইলে যেন একটু ভাল।

মা-ও এই প্রসঙ্গে বলিলেন—"শরীরটা যখন একটু হেলানোভাবে থাকে, তাতেও যেন শরীরটার শ্বাসের গতি ঠিক চলছে না। অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তাই অনেক সময়ই আপনা থেকেই মাথাটা যেন বালিশ থেকে নীচে নেমে

যায়। আর শরীরটা টান হয়ে যেন শবাসনের মত। এ-সব যেন আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে। এ-ও এক বেশ তামাসা। এই শরীর দেখে যাচ্ছে শরীরের ভিতর শিরায় শিরায় প্রশিরায় প্রশিরায় কোথায় কি হচ্ছে। এই শরীর আর দেখা এবং ক্রিয়া সবই এক কিনা তাই। প্রথমে যেন মেরুদণ্ডের বাম দিকে একটা কিছু ক্রিয়া চলছে। আবার একটু পরেই দেখা গেল ডান দিকেও সেই রকমটা। তার পর (আপন হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন) মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ থেকে সুরু করে উপর পর্যন্ত বেশ চওড়া স্থান নিয়ে ঐ রকমটা খুব চলছে। এই যে ক্রিয়া তাতেই কখনো কখনো শরীরটা যেন টক্‌টক্ করে চাইছে, কথা বল্‌ছে, হাসছে। এটা এই স্পন্দনেরই ক্রিয়া কিন্তু। আবার এই গতিটাতেই শরীর কখনো একেবারে নিস্তেজ। ভিতর থেকে যেন বন্ধ।”

আমরাও দেখিতেছি যে অনেক সময়ই মা যেন একেবারে পাথরের মত স্থির হইয়া পড়িয়া আছেন। শ্বাস চলিতেছে কিনা, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। মুখে কিছু দিতে গেলেও তাহা যেন ভিতরে যাইতেছে না।

আবার একটু পরে বলিতেছেন—“আট মাস থেকে সেই যে মাথার ভিতর শব্দটা আরম্ভ হ’ল, তখন থেকেই শ্বাসের গতিটা কেমন যেন। শোবার কোনও ভাবই নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরটা একটা আসনের মত হয়ে ত বিশ্রাম পেত। কিন্তু সেই জিনিসটা এই কয়মাস হয় একেবারেই নাই। এমন চমৎকার, দেখা যাচ্ছে শরীরটা হয়ত একটু চুপ হয়ে আছে, অমনি শ্বাসটা নীচের দিকে যেতে গিয়ে যেন উপরদিকে ধাক্কা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের হাতটা একটু খাড়া হ’ল অথবা মাথাটা নড়ে গেল। নাভি থেকেই যেন শ্বাসটা উঠছে। আর নাভির নীচের ক্রিয়া যেন সব বন্ধ। যেমন তোমরা বলে থাক না যে নাভি ছেড়ে দিয়েছে। সেই রকম আর কি। এই অবস্থা হলে অন্য শরীরের কি হ’ত তা তোমরাই বোঝ। আবার আজ এই রকমটা হয়েছে যে শরীরের শ্বাসের দিকে খেয়াল বা

ভিতরের সব দেখাশোনা এই খেয়ালটাও যেন নেই। টান হয়ে শুলে শ্বাসের গতিটা যেন একটু ভাল থাকে, কিন্তু বালিশটা সরাবার যেন খেয়ালই নেই। মাঝে মাঝে যেন এই সবই বে-খেয়াল।"

গত ডিসেম্বর মাস হইতে যখন মা'র শরীর খুব খারাপ হয় তাহার পরও, যেমন হয় সেই রকম যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, প্রোগ্রামে যোগ দেওয়া, সবই হইয়া আসিতেছে। মা'র শরীরের বিশ্রাম আদৌ হয় নাই। অনেকদিন হইতেই মা বলিয়া আসিতেছেন,—"এখন ত সব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখন শরীরের কি হয় বলা মুস্কিল।" আজ আমরা তাই এই অবস্থা দেখিতে পাইতেছি।

দুপুরের পরে মা চুপচাপ শুইয়াই আছেন। আমরা অনেক সময় মনে করি হয়ত বিশ্রাম করিতেছেন। বিকাল ৪টার পর মা উঠিলে মা একটু কিছু খাইলেন। খাওয়ার পর বিছানায় আসিয়া বসিলেন। একটু যেন চটপটে ভাব দেখিলাম।

কথায় কথায় মা বলিলেন, "এই যে শরীরটা এতক্ষণ পাশ ফিরে ছিল, তোমরা মনে করতে পার, শরীরটা শুয়ে বেশ আছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও এক এক সময় এমনটা হয়ে আসছিল যে নাভির ক্রিয়া একেবারে বন্ধ। কিছুই যেন নাই। শ্বাসের গতি এমন যে তোমাদের দৃষ্টিতে যা-কিছু হয়ে যেতে পারে। এ শরীরের কাছে ত সব অবস্থাই সমান। কখনও শুয়ে আছে, কখনও বসে আছে। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই যে কোন মুহূর্তে যা-কিছু হয়ে যেতে পারে। আবার কি চমৎকার দেখ,— এই শরীরের কাছে ত সবই তামাসা। দুই-একবার এইরকমও হয়ে এলো যে যদি খেয়াল আসত, 'যা হচ্ছে হয়ে যাক্'। তবে তখনই কিন্তু যা কিছু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু খেয়ালটা হ'ল না, এ শরীরের দিক ত 'যা হয়ে যায়'। এই দুটি ভাবের মধ্যেই যেন শরীরটা রয়ে গেল। যে মুহূর্তে যেদিকে খেয়ালটা, তাই হয়ে যেতে পারে।"

মা এইসকল কথা এমনভাবে বলেন যে আমাদের আতঙ্ক আরও বেশী হয়। মনে বিশ্বাস রাখিতে চেষ্টা করি, মা কৃপা করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবেনই। কিন্তু আবার মা'র নিজের মুখে এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনিলেই যেন সকলে দিশাহারা হইয়া পড়ি। সকলেরই যে কি আতঙ্কে দিন কাটিতেছে তাহা লিখিয়া কি বুঝাইব।

আজ সকালে হরিবাবাজীর আগ্রহে দীনবন্ধুকে পাঠাইয়া হরিদ্বার হইতে পণ্ডিত সুন্দরলালজীকে আনা হইয়াছে। সকালে সৎসঙ্গের পরে হরিবাবাজী যখন আসিয়াছিলেন তখনও তিনি মা'র নিকট সুস্থ হইবার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বলিতেছিলেন,—"মাতাজী, আমার নিজের সঙ্কল্পেও অনেকে অনেক সময় ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আমার চেয়ে অনেক অনেক উচ্চে, তাই আপনার উপর ত আমার সঙ্কল্প চলতে পারে না। আপনি নিজেই আমাদের উপর কৃপা করুন।"

মায়ের জন্য সকলেরই কী গভীর আকর্ষণ।

সন্ধ্যার সময় মা'র দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে একে একে আসিয়া প্রণাম করিয়া গেল। ফরাসী ডাক্তার বিজয়ানন্দকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?" বিজয়ানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল না।" মা আবার জিজ্ঞাসা করিলে সে মাকে বলিল যে মা'র শরীর এইরূপ খারাপ তাই সে কিরূপে ভাল থাকিতে পারে। এই বলিয়া মা'র ঘরের মধ্যে গিয়া মা'র চৌকির উপর মাথা রাখিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। মাকে বলিল—"মা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপনার শরীর যতদিন পর্যন্ত সুস্থ না হয় ততদিন পর্যন্ত আমি জলও গ্রহণ করিব না।" মা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, বার বার বলিলেন,—"এই রকমটা করতে নেই। এই শরীরের জন্য এইভাবের কোনও সঙ্কল্প করা ঠিক না। মন দিয়া জপ ধ্যান কর। তোমার কথা ত এই শরীর শুনল। এবার এই শরীরের কথা তুমি শোন।" বিজয়ানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার

এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত অনেকেরই চোখে জল আসিয়াছিল। মা'র জন্য সকলেরই কী তীব্র আকর্ষণ।

আগামী কাল ঝুলন উৎসব। হরিবাবাজীর আগ্রহে কাল উদয়াস্ত কীর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লীর ভক্তেরা খুব সুন্দর কীর্তন করে। হরিবাবাই তাহাদের কথা বলায় ইতিমধ্যে দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা কেহ কেহ আগামী কাল সকালে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করে। মৌনের পর হইতে স্থানীয় ভক্তেরা কীর্তন সুরু করিল। সমস্ত রাত্রি কীর্তন চলিবে।

রাত্রিতে ডাক্তার সোম মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। Blood Pressure দেখিলেন স্বাভাবিকই আছে। কিন্তু নাড়ীর গতি একবার ১১০, একবার ৮০, একবার একেবারে কম—পাওয়াই কঠিন এইরূপ অবস্থা। মা এদিকে চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া সমস্ত-কিছুই দেখিতেছিলেন। ডাক্তার সোম যখন হাত নামাইয়া নিলেন, তখন মা আস্তে আস্তে কখন কি রকম নাড়ীর অবস্থা পাইয়াছেন সমস্ত বলিয়া দিলেন। ডাক্তার ত অবাক হইয়া মা'র দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ত মাকে কিছুই বলেন নাই। মা নিজে নিজে কিভাবে সব জানিলেন। উঠিবার সময় বলিতে বলিতে গেলেন—"মা'রই সব খেলা। আমি আর কখনো মাকে পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদি নিয়ে আসব না। বৃথা সব। কোনও লাভ নেই মাকে পরীক্ষা করে। আমাদের নিজেদের মনের শান্তি ত শুধু।"

আজ রাত্রেও শুইবার সময় মা'র ঘর একেবারে খালি করিয়া দিয়া মেয়েদের পাশের ঘরে গিয়া শুইতে বলিলেন। বুঝিলাম আজও হয়ত কোনও সূক্ষ্মশরীরধারী আসিতে পারেন। মা আজকাল এমনিও বেশী সময় যেন একটু একাই থাকিতে পছন্দ করিতেছেন। শরীরটা এত বেশী খারাপ হইবার পূর্বে নাকি নিজে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া শুইতেন। কিন্তু আমরা সকলে পরে প্রার্থনা করিয়াছি যে মা'র এই অবস্থাতে

দরজা খোলাই থাকুক। ভিতরে কাহাকেও না আসিতে দিলেই হইল। দরজার বাহিরে একজন বসিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারিবে মা কখন কী রকম থাকেন এবং কি করেন। কারণ, আজকাল মাকে এত দুর্বল মনে হয়—শরীরে যেন কোন জোরই নাই। দুই-তিন জনে মিলিয়া মাকে ধরিয়া বিছানার উপর বসাইতে হয়। মা বাথরুমে গেলেও সঙ্গে একজনের সর্বদা থাকিতে হয়।

সন্ধ্যার সময় হরিদ্বার হইতে সপ্তর্ষি আশ্রমের শ্রীযুক্ত গণেশদত্তজী মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া মা'র পায়ের নিকট প্রণাম করিলেন। কিন্তু মা টান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তেমন যেন খেয়াল করিলেন না। গণেশদত্তজী একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

১০ই আগষ্ট ১৯৫৭। ঝুলন-পূর্ণিমা।

আজ ঝুলন-পূর্ণিমা। সকাল হইতেই উদয়াস্ত কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। গত রাত্রিতে প্রায় সর্বক্ষণই কীর্তন চলিয়াছে। দিল্লী হইতে বিশেষ কেহ আসিতে পারে নাই। শুধু কানু ও লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিয়াছেন। হরিবাবাজীও মধ্যে মধ্যে আসিয়া যোগ দিতেছেন।

প্রায় ১২টার সময় হরিবাবাজী মাকে দেখিতে আসিলেন। মা-ও উঠিয়া বসিয়াছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজীও সঙ্গেই আছেন। তিনি নানা ভাবের কথাবার্তা বলিয়া মাকে একটু কথা বলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কথায় কথায় পণ্ডিতজী কয়েকবারই বলিয়াছেন—"মাতাজী ত সমাধিতে ডুবে আছেন।" মা তাই আস্তে আস্তে বলিলেন,—"এ শরীরের ত সমাধি লক্ষ্য করে যাওয়া না।

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীমায়ের কিঞ্চিৎ আভাস।

যাওয়া-আসা কোথায় পিতাজী? সমাধির আসন, সমাধির ভাব সেদিকে লক্ষ্যও না, সেদিকে স্থিতিও না। এ শরীরের কাছে চলা, ফেরা, বসা, বলা-কওয়াও যা, এটাও ঠিক তাই।”

হরিবাবাজী কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—“দিল্লীতে আমি যখন অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ছিলাম, তাহার পর মাতাজী আমাকে আশ্রমে নিয়া গেলেন। সেখান হইতে যাইবার দিন মাতাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া গাড়িতে বসিতে যাইতেছি, এমন সময় মাতাজী আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাকে নিজের চৌকির উপর বসাইয়া আমার পিঠে হাত দিয়া ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন—‘এখন চল পিতাজী’। আর আমি যেন মা’র কাছে ছোট শিশুর মত দাঁড়িয়ে আছি।”

কথা-প্রসঙ্গে হরিবাবার বিষয়ে কয়েকটি কথা।

মা এই প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—‘হ্যাঁ, পিতাজী, কি-রকম তামাসা! এর দুই বৎসর আগে এক সময় দেখা গিয়েছিল, বাবা এই শরীরেরই বাম অঙ্গ জড়িয়ে যেন আছে। ভাবটা শিশুর মতই। এই শরীরটা বলল,—‘যাও বাবা, প্রস্রাব করে এসো’। অনেকে বলতে পারে যে হঠাৎ প্রস্রাব করার কথা এল কেন? পরে দেখা গেল যে বাবার প্রস্রাবের রোগই হ’ল। খবর এল বাবা হোসিয়ারপুরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। তখন এই শরীরটা যেন একেবারে শুক্‌না পাতার মত উড়ে বাবার কাছে চলে গেল। তখন এই শরীরটা যদি বাবার কাছে না গিয়ে পৌঁছাত, তবে কি হ’ত ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হ’ল। দিল্লী নিয়ে আসা, সন্তোষ সেনকে দিয়ে হাসপাতালে রেখে অপারেশনের ব্যবস্থা করা সব-কিছুই। আবার এমন আশ্চর্য অপারেশনের ঠিক আগের দিন এই শরীর দেখল বাবার গুরুদেব এসে বাবার কাছে দাঁড়িয়েছিল। চেহারাটা একেবারে পরিষ্কার দেখা গেল। ইশারায় যেন তিনি এ শরীরের দিকে চেয়ে ভাবটা প্রকাশ করলেন—‘এই শরীরের সংরক্ষণ করো’। পরে এই ব্যাপারটা মনোহর প্রভৃতি কয়েকজনকে

বলা হ'ল গোপনে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাবার জন্যে অখণ্ড জপ সুরু করতে বলা হ'ল। সব সময়ে ত সব কথা শরীরের আসে না। মুখ থেকে এসেছিল—প্রস্রাব করে এসো। পরে এত ব্যাপার হয়ে সেই প্রস্রাবের ক্রিয়াই সরল হ'ল।"

হরিবাবাজী মা'র দিকে চাহিয়াই বলিলেন,—"আমিও অপারেশনের দিন দেখিলাম, আমি যেন ছোট্ট শিশুর মত মা'র কোলে জড়াইয়া আছি। আর বহু দেবদেবীর মূর্তি—হাতে যোগিয়া রং-এর পতাকা, যোগিয়া রং-এর কাপড় পরা, সকলে মিলে মাকে যেন প্রদক্ষিণ করছেন।"

মা একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখ কার সঙ্গে কি যোগাযোগ থাকে সে ত বলা যায় না। আর একবার দেখা গেল এই অপারেশনের আগে অখণ্ডানন্দ স্বামী (বৃন্দাবনের) আর মাখনের ছোট ছেলেটি দুইজনে একটা কিছুর উপরে উঠে রওনা হয়েছে। এই শরীরের খেয়াল হ'ল দৃষ্টির বাইরে গেলেই আর ফিরবে না। আশ্চর্য এমন যে অখণ্ডানন্দ পিতাজীর দিকে খেয়ালটা গেল, কিন্তু বাচ্চাটার দিকে যেন খেয়ালই নেই। এই শরীর মাথা হেলিয়ে দেখছে যে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কিনা। শরীরের দৃষ্টির মধ্যে থাকলে আর যেতে পারবে না। এমন একটা যেন চক্করের মধ্যে চলে গেল যেখান থেকে আর ভালো করে দেখাই যায় না। কিন্তু তবু এই শরীরের খেয়াল যে অখণ্ডানন্দ পিতাজীকে দেখতেই হবে। যখনই দেখা হ'ল, তখনই খেয়াল হ'ল যে তার আর কিছু হবে না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"এর কিছুক্ষণ পরে বাবার যখন নার্সিং হোমে অপারেশন হ'ল, তখন এই শরীর একবেলার জন্য বৃন্দাবন গিয়েছিল। তখন বাবাকে দেখবার জন্য অখণ্ডানন্দ পিতাজী এই শরীরের সঙ্গেই মোটরে বৃন্দাবন থেকে দিল্লী চলে আসেন। সোজা নার্সিং হোমে গিয়ে বাবাকে দেখে এসে অখণ্ডানন্দ পিতাজীও ডাঃ জে. কে. সেনের বাসায় এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন। এই শরীর তখন ঐখানেই ছিল।

দিদিও ছিল। বিপিনকে খবর দেওয়া হয়েছিল যে সে এসে রাত্রেই বাবাকে তার বাসায় নিয়ে যাবে। কিন্তু বিপিন আসতে দেরী করছে দেখে পিতাজীর ঐখানেই থাকবার ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। পিতাজী শুয়েছেন এমন সময় বিপিন এসে তাঁকে নিয়ে গেল। পিতাজীর থাকা হ'ল না।"

পণ্ডিতজী বলিয়া উঠিলেন—"আমিও সেইখানেই ছিলাম। মা'র দৈবী ভাব-টাব আমার ভাল লাগে না। কিন্তু মা'র রীতি-নীতি, স্বভাবের মর্যাদার কাছে আমার মাথা নত হইয়া আসে। ঐ সময় অখণ্ডানন্দের জন্য মা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যেভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন, তাহা দেখিলেও বিশ্বাস হয় না।"

মা হাসিয়া বলিলেন,—"পিতাজী, এ-রকম বলতে নাই। বাচ্চীর ত কিছুই আসে না।"

পণ্ডিতজী মা'র কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিলেন,—"মাতাজী, এ-সব কথা আমি শুনিতে চাই না। এ-সব তোমার চালাকী।"

মা একটু পরে আবার পূর্বের কথা সুরু করিলেন,—"এর পরে যখন বাবার আশ্রমে অখণ্ডানন্দজী ভাগবত-সপ্তাহ করলেন, তখন এই শরীর বৃন্দাবনেই ছিল। বাবা প্রথমে ভাগবতপুস্তক এই শরীরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারপর আবার ভাগবত আশ্রম থেকে প্রসেসন্ করে বাবার আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মোটরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই অখণ্ডানন্দ পিতাজী এবং এই শরীরও আছে। রাস্তায় যেতে যেতেই এই শরীর অখণ্ডানন্দ পিতাজীকে আগের ঐ-সব কথা বলতে লাগল। আগে এই-সব কিছু তাকে বলা হয়নি। কিন্তু মোটরের মধ্যে সব কথা পুরা আর বলবার যোগাযোগ হয়ে উঠল না। পিতাজীও হয়ত সব কথাটা ঠিক ঠিক খেয়াল করল না। ঐ পর্যন্তই রয়ে গেল।"

এই-সব কথাবার্তা হইতে হইতে আজ কিছু দেরী হইয়া গেল। হরিবাবা প্রায় ১৷৷৹টায় উঠিয়া গেলেন। মাকে আজ দুপুরেই একটু খাওয়াইয়া দেওয়া

হইল। খাওয়ার পর মা বিছানার উপর শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন,—"গোপী-বাবাকে দেখা যাচ্ছিল। এই শরীর কি একটা তত্ত্বকথা বলছে। বাবাও বলছে। বাবা যেন একটা কাগজ চাইল। বুনি একটুকরা কাগজ এনে বাবার হাতে দিলে, বাবা যেন তাতে সব তত্ত্বকথা আঁকতে লাগলো। সেটা একটা ছবির আকার নিল। এই শরীর তাই দেখে বলছে—"বাবা, তোমার ছবি আঁকার বিদ্যাও আছে? বাবা কলম দিয়াই যেন ছবিতে চোখও এঁকে দিল। পরে বাবা আবার কাগজ চাইলে, বুনি একটু ছোট কাগজ দিল। বাবা আবার আঁকতে সুরু করল। কিন্তু এবার যেন সমস্ত মূর্তিটা আর আঁকতে পারল না। নম্বর দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া মা চুপ করিলেন।

সন্ধ্যায় নীচের হলঘরে মেয়েরা ঝুলন সাজাইয়াছে। তাহাদের আগ্রহে মা একটু আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। তাহাতেই সকলের কত আনন্দ!

১১ই আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ সকাল হইতে রামায়ণের নবাহ সুরু করা হইয়াছে। কান্তিভাই, ভরদ্বাজ এবং উদাস পাঠ করিতেছে।

সকালে সৎসঙ্গ সমাপ্ত হইলে হরিবাবাজী নিত্যকার মত মা'র নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে মা এখান হইতে অন্যত্র কোথাও গিয়া কয়েকটি দিন বিশ্রাম করেন। রায়পুর, বৃন্দাবন, কাশী, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি স্থানের কথা হইল। তিনি চলিয়া গেলে মা'র মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। আজিও আমাদের সকলের অনুরোধে মা দুপুরবেলাতেই খাইলেন। সকালে দিল্লী হইতে শ্রীযুক্ত বর্মাজী আসিয়াছেন মা'র সংবাদ

পাইয়া। তিনি আজ রাত্রেই ফিরিয়া যাইতেছেন। দিল্লীর কানু এবং লাহিড়ী মহাশয়ও আজ রওনা হইবেন।

সন্ধ্যার সময় ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়, পটল কাশী রওনা হইয়া গেলেন। লক্ষ্মৌ হইতে Improvement Trust-এর সেক্রেটারী পাল মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তিনিও আজ পটলের সঙ্গে রওনা হইয়া গেলেন। গোপালদাদার কয়েকটি লেখা এবং কবিতা আজ মাকে শোনান হইয়াছে। ভাবগুলি খুবই সুন্দর।

হরিবাবাজীও আগামী কাল খুব ভোরে রওনা হইয়া যাইবেন। রাত্রিতেই মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। বার বার মাকে করজোড়ে প্রার্থনা জানাইয়া গেলেন—"মাতাজী শরীর ভাল করুন।" মাকে একবার বৃন্দাবন যাইবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। আনন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার আশ্রমে বহু বৎসর ধরিয়া আছেন। তাঁহার উপস্থিত কি-সব সমস্যা আসিয়াছে। তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যও মাকে একবার বৃন্দাবন যাইবার কথা বলিলেন।

ইতিমধ্যে কথা হইয়াছিল যে মা এখান হইতে ২০শে বৃন্দাবন গিয়া, সেখানে তিন-চার দিন থাকিয়া পরে কাশী যাইবেন। কিন্তু মা'র শরীরের অবস্থা এইরূপ হওয়ায় এখন আর বৃন্দাবন যাওয়া সম্বন্ধে আমাদের কাহারও সে-রকম মত নাই। এখানেই কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, পরে মা'র নিজের খেয়ালমত কোথাও যাওয়াই ভাল মনে হয়। কাশীতে বাৎসরিক ভাগবত-জয়ন্তী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য হরিবাবাকেও বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইলাম।

১২ই আগষ্ট ১৯৫৭।

মা'র অসুস্থতার সংবা পাইয়া কাশী হইতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাথ সস্ত্রীক
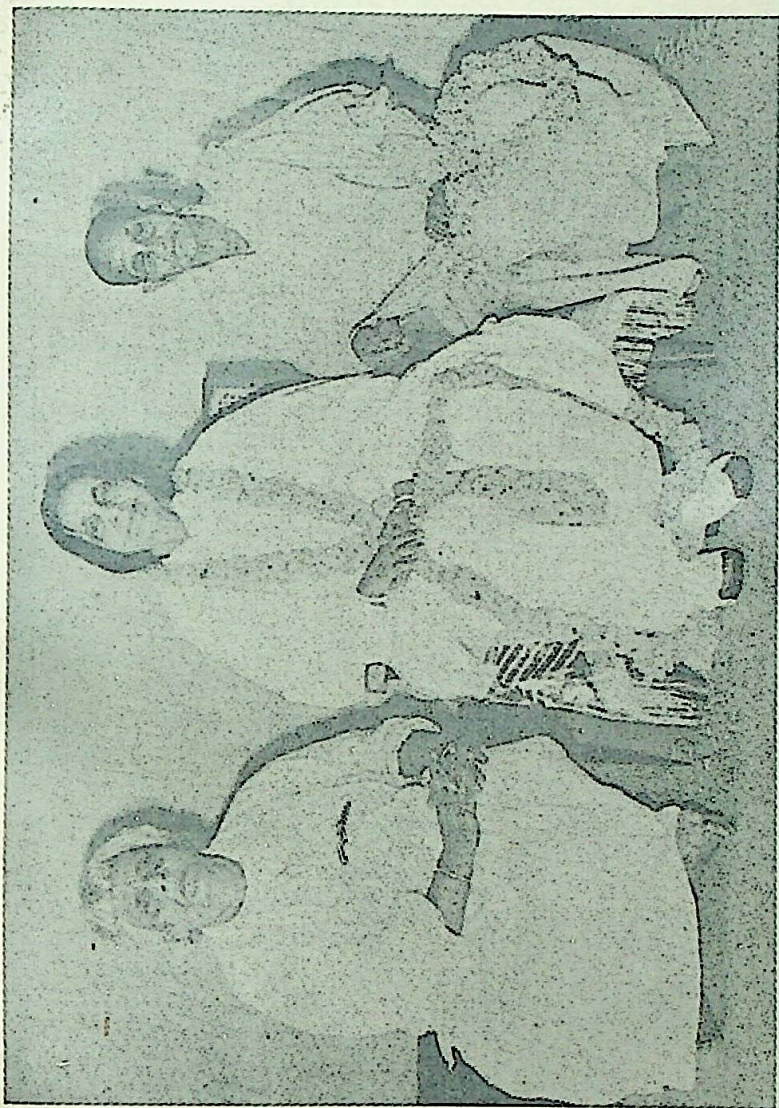
শ্রীশ্রীমায়ের সাথে দিদিমা ও লেখিকা

মাকে দেখিবার জন্য সকালে আসিয়া পৌঁছিলেন। কাশীতে তাঁহার অকল্পনীয় কর্মব্যস্ততা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। তাহার মধ্যেও তিনি মাকে দেখিবার জন্য এত দূরে আসিয়াছেন, ইহা সত্যই তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক। তিনি সঙ্গে যন্ত্রপাতিও লইয়া আসিয়াছেন, মা'র কানটি পরীক্ষা করিবার জন্য।

মা'র অসুস্থতার সংবাদে আকুলতা।

আজ মা প্রায় তিনটার পর খাওয়া-দাওয়া করিলেন। তাহার পর সকলের দর্শনের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে ডাঃ নাথ আসিয়া মা'র কান পরীক্ষা করিলেন। কানে ও মাথায় সেই পুরাতন শব্দ এখনও অল্প অল্প আছে। তবে প্রবলতা ততটা নাই। ডাক্তারও পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে একরূপ ভালই আছে।

১৩ই আগষ্ট ১৯৫৭।

গত ৯ই বিকালে কুসুমকে কাশীতে শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর নিকট পাঠান হইয়াছিল। সে আজ সকালে ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে কাশী হইতে পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও তিন-চার দিনের জন্য মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। মা'র এইরূপ বাড়াবাড়ির সংবাদ পাইয়া তিনিও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

কুসুমের নিকট হইতে শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর কথা শোনা গেল। ভারতীজী কাশীর বাহিরে কোথাও যান না; তাই তাঁহাকে আসিবার কথা বলায় তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে আসা অসম্ভব, এবং কোন প্রয়োজনও নাই। তিনি বলিয়াছেন যে মা'র এইভাবের অবস্থা তাঁহার (মা'র) লীলা মাত্র। ব্যস্ত বা শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। বার বারই তিনি বলিয়াছেন যে ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। আরও বলিয়াছেন,—"দেবী

শ্রীশ্রীমা'র সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর উক্তি।

এই নিষ্কিঞ্চনকেও কখনও কখনও দর্শন দেন। মা'র শরীরের দ্বারা জগতের কল্যাণই হইতেছে ; সুতরাং মা'র শরীর রক্ষা করা সকলের জন্যই দরকার। ভক্তেরা অনুষ্ঠান আদি ত সর্বদাই করে, যেমন মহামৃত্যুঞ্জয় জপ, শতচণ্ডী ইত্যাদি। আজকাল আর বেশী কিছু করিবার অধিকারীও পাওয়া যায় না।" শ্রীশঙ্করভারতীর এইসকল কথা শুনিয়া আমাদের মনে একটু আনন্দই হইল।

শোভার আগ্রহে বাটুদা সম্পূটিত শত-চণ্ডীপাঠ ও মহামৃত্যুঞ্জয় অনুষ্ঠান সুরু করিয়াছেন। মা'র শরীর শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুক, ইহাই সকলের একমাত্র প্রার্থনা।

আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই ডাঃ নাথ ও তাঁহার স্ত্রী কাশী রওনা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মা'র নিকট অন্ততঃ পাঁচ-ছয় দিন যাহাতে থাকিতে পারেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার শরীর হঠাৎ খারাপ হওয়াতে আজই চলিয়া যাওয়া স্থির হইল।

কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে মা'রও কিছু কিছু কথা হইল। মা'র হঠাৎ শরীরের অবস্থা এইরূপ কেন হইয়াছে, তাহার পিছনে কি রহস্য আছে তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা মুস্কিল। কবিরাজ মহাশয় হয়ত কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাকে অনেকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। অবশ্য তিনি তেমন পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। মা'র মুখ হইতেই হয়ত সময়মত সমস্ত কথা প্রকাশ হইবে। তবে কবিরাজ মহাশয় অনুমান করিতেছেন যে গত জয়ন্তী-মহোৎসবের সময় মা যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিয়াছিলেন তাহার সঙ্গেই হয়ত মা'র এই অবস্থার কোনও যোগসূত্র থাকিতে পারে। সেই বাণীটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

করুণাময়ী মা'র অসুস্থতা প্রারব্ধ ভোগ নহে।

"কাহারও কোনও ত্রুটি প্রকাশ হইলে এই শরীরকে জানাইতে পার। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিজ নিজ ত্রুটি অনুরূপ দণ্ডাদি গ্রহণ ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

যদি ঐ দণ্ডাদি গ্রহণে কেহ অনিচ্ছুক, তাহা হইলে খেয়াল হয়ত ত্রুটির সে দণ্ড এই শরীর আদরে গ্রহণ। আর যদি কেহ সেই কথা এই শরীরকে না জানাইয়া গোপন রাখে, তবে এই শরীরও খেয়ালমত গোপনে গোপনেই —ওগো নিজ জন! যা হইয়া যায়। যেখানে এই শরীর প্রিয়, এই কথা মনে রাখা। হে বহুরূপ বিশ্বাত্মন্! যদি তোমরা এই শরীরের কিছু তোমাদের দৃষ্টিতে দেখ, তবে বুঝিয়া নিও, তুমি যে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ, ঐ তুমিই দণ্ডস্বরূপ। তুমিই বল, আর আমিই বল, একমাত্র, ঐ, ঐ, ঐ!"

১৪ই আগষ্ট ১৯৫৭।

শ্রীশ্রীমা'র শ্রীমুখে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রসঙ্গে।

গতকাল সকালে কবিরাজ মহাশয়ের সহিত মা'র কথা প্রসঙ্গে শারিরীক অসুস্থতার বিষয় উঠিলে মা বলিয়াছেন,—"দেখ, নিদ্রিত ব্যক্তির (সাধক) স্থিতি লক্ষ্যে গতি থাকে। কিন্তু এখানে ত স্থিতি অস্থিতির লক্ষ্য অলক্ষ্যের কোন প্রশ্নই নেই। প্রত্যেকটি নাড়ী শিরা উপশিরা ক্রিয়া স্পন্দন সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। যেমনটা নাকি প্রদীপ হাতে নিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি একটি করে সব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, এমনটাই আর কি। কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির গতির মধ্যে এইগুলি সব দেখা সম্ভব হয় না। নানা রকমের বাধা তার অতিক্রম করে চলতে হয়। একটা হ'ল বাইরের গতি। আর একটা অন্তর্মুখী গতি। বাবা, এখানে ত আর ঐ প্রশ্ন দাঁড়ায় না। এখানে নাড়ীও আমি, শিরাও আমি, প্রশিরাও আমি, গতিও আমি, দ্রষ্টাও আমি। অবশ্য আমি বলে যদি একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়।"

কবিরাজ মহাশয়—"হ্যাঁ, সমাধি মানে মনের একাগ্রতা আর তার নিরোধ। এখানে ত আর মন অমনের কথাই নেই। তাই মা'র বিষয়ে সমাধির কোনও কথাই উঠতে পারে না।"

মা—"দেখ যেভাবে হাসা, বলা, চলাফেরা হয় শরীরটার এক-একটা রকম প্রকাশ হয়ত। তাই তোমাদের দৃষ্টিতে শরীরের সমাধির আসনও দেখতে পার। শ্বাসের গতি যখন যেভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে আর পরিবর্তন অপরিবর্তনের প্রশ্ন নাই।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—"দেখ, আজকাল কেমন যেন এলো-মেলোভাবে শ্বাসের গতি সর্বত্র যেন পরিষ্কারভাবে শরীরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আবার এর মধ্যে এমনটাও একদিন দেখা গেল যে, এই দেখবারও যেন খেয়ালটা আর নাই। তোমরা একেই চরম কথা বলতে পার। একটা খেয়াল থাকে 'যা হয়ে যায়'। আবার আর একরকম হতে পারত 'যা হচ্ছে হোক'। সব খেয়ালই ত এক জায়গার। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সব কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিতে। এখানে ত কর্ম বা বাসনার কোন কথাই নাই। এখানে মাত্র একটি কথা,—'যা হয়ে যায়'। কেমন চমৎকার। এক সময় দেখা গেল নাভির ক্রিয়া সুরু হয়েছে। সেই সময় দেখলে দেখতে পারবে শরীরের নীচের দিকটা একেবারে ঠাণ্ডা। নাভির ক্রিয়া আরম্ভ হলে কি সাধারণ শরীর আর ফিরে আসতে পারে? প্রথম দিন (৭ই আগষ্ট) দেখা গেল মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে স্পন্দন-সহ তিনটী গতি এক সমান তালে মূল হতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত চলছে।"

কবিরাজ মহাশয়—"ইহাই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার প্রাণের সমগতি। যোগীদের উৎক্রমণের সময় মাত্র এই সমগতির আবির্ভাব হয়।"

মা—"সবই শ্বাসের গতির জন্য। শ্বাসের গতিটা অস্বাভাবিক বলেই কখনো চুপ হয়ে যাওয়া আবার কখনো একেবারেই চটপটে ভাব। বাইরে থেকে দেখা গেলে বলতে পার যে মা-ও বেশ কথা বলছেন, অথবা মা

হয়ত চুপ করে ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু এই অবস্থাতেই শুয়ে থেকে, বসে থেকে, সব কিছু হয়ে যেতে পারে। এক সময় আবার দেখা গেল মেরুদণ্ডের ভিতরে ঘাড়ের নীচে, অথবা পিঠের মধ্যে অথবা শেষ প্রান্তে একটা বিশেষ স্পন্দন। সেই সময় পিঠের ঠিক মাঝখানটা ওদের পরীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। ওরা দেখে বলল,—'একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা'।"

আজ মা একটু সকালেই উঠিয়া বসিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া মা'র নিকট বসিলে গত রাত্রের কথার সূত্র ধরিয়াই মা বলিতে লাগিলেন—"ঐ যে মেরুদণ্ডে তিনটি সমসূত্রে প্রবাহের কথা বলা হয়েছে না! বাবা, এখানে ত কোন বাধাই নেই। সব একেবারে খোলা। সাধারণ ক্ষেত্রে অবলম্বন নিয়ে প্রাণের গতি—কি সাধনার ক্ষেত্রে, কি জগতের ক্ষেত্রে। দেহ মানে, দেও দেও। ভোগ প্রাপ্তি। নিজকে নিয়েই কিন্তু ভোগ। বাবা, একটা কথা আছে—আবার আপনত্ব বোধ না থাকলে ভোগ হতে পারে না। আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার শত্রু, আমার মিত্র—আমি এই অবলম্বনেই প্রাণের গতি। সাধকের ক্ষেত্রে ত প্রাপ্তি অবলম্বন। তার সর্বদা স্থিতি থাকে ত, তাই চলবার সময় পথের আর খেয়াল থাকে না। লক্ষ্যে একবার যদি পৌঁছাতে পারে তখন সে পথের কথা বলতে পারে। তখন এক আলোতেই সব-কিছু উদ্‌ভাসিত হয়ে যায়। একটা বস্তু হ'ত আসলে—পথ, লক্ষ্য যাই বল, নিজ ভিন্ন ত আর কিছুই না।"

শ্রীশ্রীমা ও কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর কথোপকথন।

আমি মাকে প্রশ্ন করিলাম,—"আচ্ছা মা, সবই যখন খোলা, কোনও গ্রন্থিই বন্ধ নেই, তবে তোমার এই শরীরের প্রকাশের অবলম্বন কি?"

মা—(একটু হাসিয়া) "এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে, বাবা, আমি তোমাকে একটা কথা বলছি। আচ্ছা, যাদের মৃত্যু হয়েছে, আর যারা মুক্ত, তাদের পক্ষে কি নিজেদের পরিচিত দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়া সম্ভব?"

কবিরাজ মহাশয়—'হ্যাঁ, মা পারেন।'

একটু পরে আবার মা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বাবা, নির্বাণ যেখানে সেখানে করুণার কথা আসতে পারে কি না?"

কবিরাজ মহাশয়—"যেখানে করুণার কথা হচ্ছে সেখানে দুঃখ বলে দ্বিতীয় কথাও থাকে।"

মা—"তা হলে নির্ব্বাণে কি করুণা করা বাধক হচ্ছে?"

কবিরাজ মহাশয়—"মা, দুইটি মতই আছে। ইহা বৌদ্ধধর্মের মত। এক মতে নির্বাণ হইলে আর করুণা করা যায় না। অপর মতটিতে নির্বাণ-লাভের পরেও স্বরূপভূত করুণা থাকে। যেমন, বিষয় না পেলেও আনন্দ, যাকে বলে স্বরূপানন্দ। এইটাই হচ্ছে বুদ্ধত্ব।"

মা—"যেখানে বুদ্ধত্ব বলছ, সেখানে ত নির্বাণ থেকেও করুণা চলে। যেমন, আগুন থেকে যতই তার তাপ নেও না কেন, তার দাহিকা শক্তি কিন্তু কম হয় না। ভগবান্, যাকে তোমরা পূর্ণ বলে মান, সেখানে ত কিছুই ক্ষুণ্ণ হ'বার নেই। নিজেই নিজের অধীন স্বাধীন।"

আমি—"তাহা হলে তো মা তোমার শরীরের অবলম্বনটীও ঐভাবেই হতে পারে।"

কবিরাজ মহাশয়,—"আর একটি কথা। একটা হচ্ছে করুণা, আর একটা স্বাভাবিক করুণা। যেমন সূর্যের প্রকাশ, আর ঐ শূন্য হতে কিরণধারার প্রবাহ। এই দুটির মধ্যে কি প্রভেদ আছে, না উভয়ই এক?"

মা—"দুইই এক। হওয়া আর করা, একই স্বরূপতঃ। আর স্বরূপ থেকে পৃথক্ মানলে সেখানে পৃথক্ই। স্বরূপতঃ যিনি করছেন, তিনিই হচ্ছেন। স্বরূপ থেকে পৃথক্ বললে, সেখানে ইচ্ছাশক্তি। মহাশক্তি আর ইচ্ছাশক্তি। এইজন্য জগৎ জীবের পক্ষে যে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা করতে পারা হয়, তাই দিয়েই মূলটাকে ধরা। মূল ধরা হওয়া আর করা একই

কিন্তু। দুই ভেবে সকলে কর্ম কর। কিন্তু আপনা আপ। দ্বিতীয় সেখানে কে? ঐ প্রকাশের জন্যই স্বক্রিয়া।"

কবিরাজ মহাশয়—"এমন কোনও স্থিতি আছে, যেখানে প্রকাশেরও কোন শব্দ নেই?"

মা—"এটা ত হতেই হবে! শব্দ অশব্দের কথাই নেই। ভাষা মানলে শব্দ একদিকের কথা। পূর্ণ হয়েও অপূর্ণ। অপূর্ণ হয়েও পূর্ণ। কারণ পূর্ণ-ই ত আছে। অনন্তই ত আছে। এইজন্য সকলেই নিজ নিজ স্থান বেছে নেওয়া।"

আবার বলিতেছেন,—"আমার স্থানেই আমি দাঁড়িয়ে, অপর আমি কিন্তু না। এই ঢং-এ চলে। চলতে চলতে যাত্রী মিলে যায়। আবার কখনো যাত্রী পাওয়াও যায় না। তবে লক্ষ্য ঠিক থাকলে ধোঁকা খাওয়া আর হয় না। এইজন্যই বলা হয় যে গ্রন্থ রূপে—পথ রূপে—একমাত্র তিনিই। 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'। তা হলে আর কোথাও কোনরকম বিরোধ নেই। দুনিয়ার কথা ত্যাজ্য বলা হয়, কিন্তু এমন স্থান আছে যেখানে ত্যাজ্য, গ্রাহ্য নেই। ঐ-ই। বিশেষরূপেও ঐ-ই। জাগ্রত, অজাগ্রত, জানা-অজানা, প্রকাশ-অপ্রকাশ এইসবের কোনও প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। জাগতিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। প্রশ্ন আসে সমাধানের জন্যই। এইজন্য বিশেষ আর অবিশেষ এর স্থান থেকে আলাদা না।"

কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সেই দিনকার সূক্ষ্ম শরীরধারী সাধুদের কথা উঠিল। আজ আরও পরিষ্কার করিয়া সকলের সম্বন্ধে জানা গেল। যে কয়জন মহাত্মা মা'র নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের শুধু মুখটুকুই দেখা গিয়েছিল, সমস্ত শরীর যেন সাদা ধোঁয়ার ঘনীভূত রূপ। দুইজনের পরিধানে একটু সাদা বহির্বাস। একজনের পরিধানে সামান্য এতটুকু কৌপীন মাত্র। অন্যান্য

সূক্ষ্মদেহে মা'র নিকট আগত সাধুদের কথা।

সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাঁহারা সকলে আসিয়া মা'র সম্মুখে বসিয়া, পরে মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, আবার একটু সময় বসিয়া সেইখানেই মিলাইয়া গেলেন।

পরদিনও আবার কোন সূক্ষ্মশরীরী মহাপুরুষ মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে মা এখন আর কিছু বলিলেন না। শুধু বলিলেন,—"বলা আসছে না।"

আজ মাকে একটু কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া আমাদের একটু ভালই মনে হইল। তাহা ছাড়া, কথাবার্তাও যেন স্পষ্ট এবং কিছুটা স্বাভাবিক-ভাবেই বলিতেছিলেন। মা যে-সকল উচ্চস্তরের কথা বলিতেছেন তাহা একমাত্র কবিরাজ মহাশয় ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই-সব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা এতদিন মা আর কাহারো কাছে ব্যক্ত করেন নাই। ইতিমধ্যে ৭ হইতে ৯ তারিখ পর্যন্ত মা'র শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ গিয়াছিল। সেই সময়ের সব কথা মা তন্ন তন্ন করিয়া আজ আবার কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন।

মা বলিলেন,—"বাবা, শরীরের গতিগুলি যখন ঐরূপ চলছিল না, তখন এলানো ভাবটির আরও বাড়াবাড়ি হ'ল। দেখা গেল চোখ একবার বড় হচ্ছে, ঝিমোচ্ছে বা অর্ধেক খুলছে। বেশ মজার। মুখটাও খুলে যাচ্ছে। তারপর আর কি হচ্ছিল আর না হচ্ছিল সে-সব বাইরের যারা তারা হয়ত সব দেখেছে। ঐদিকের রেশটা বাবা এখনো যায়নি। দিনে রাত্রে কখনো কখনো আবার ঐদিকেই যেন মোর ফিরতে চায়। যেমন অসাধারণ মানুষের শেষ সময় একটা চটপটেভাবে বেশী কথা বলা ইত্যাদি হয় না, ঐভাবেই গত আট মাস যাবৎ চলাফেরা করা হয়েছে। ঐ-ভাবে চললে চলতে আজ এই অবস্থাটা এসে গেছে। শরীর আর যেন চলল না। অন্য কোন শরীরে এইরূপটা হলে না জানি কি হ'ত। যেমন দিনে তেমন রাত্রে একই ভাবে চলছে। কিন্তু বাবা, এই শরীরের

ত কোনই কষ্ট নেই। মাঝে মাঝে শুধু দেখতে পার হয়ত একটা দীর্ঘ-শ্বাস পড়ছে; কিন্তু এটাও যে ভিতর থেকে আসে তা কিন্তু না।”

একটু থামিয়া বলিতেছেন,—“কাশীতে যখন বাড়াবাড়িটা হয়েছিল না, তখন নিজের খেয়ালেই ঐ অবস্থাটা দাবিয়ে, এই আট মাস, নয় মাস চালিয়ে আসা হয়েছে। এখন আর সেই দাবাবার খেয়ালটা নেই। এখন যেন আমি free—আমার আর কিছু করবার নেই; যা হয়ে যায়। ঐ কয়দিন কেমন হয়েছিল জান? শরীর যেন কাদার মত এলিয়ে গেল। হাড়গুলিও যেন গলে গিয়েছিল। এখন একটু একটু বসা-টসা, কথা বলা-টলা হচ্ছে। তবে এটাও স্বাভাবিক অবস্থা না। আবার এ শরীরের সবই স্বাভাবিক। এই যে প্রায় আঠারো দিন ধরে শরীরটা বিছানায় পড়ে আছে, কেমনটা জান, যেমন তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুলে আর উঠলে। আঠারো দিন গেছে, কি আঠারো ঘণ্টা গেছে, কি আঠারো মিনিট গেছে, তার কোন খেয়ালই নাই। সংখ্যার যেন মাত্রাই নেই। ব্যস্, এক্কেবারে সমস্ত কিছু গায়েব। (বলিয়া হাততালি দিয়া উঠিলেন)।

শ্রীশ্রীমা'র শরীরের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে আবার বলিতেছেন,—“যে গতিটার কথা সেদিন বলা হচ্ছিল না, সেটা শেষের দিকে এসে যেন সাপের ফণার মত। ছড়িয়ে গেল দুই দিকে—একটা অন্তর্মুখী, আর একটা বাইরের দিকে। মেরুদণ্ডে যে চওড়া একটা প্রবাহ চলছিল, সেই সময় নাকে, চোখে, কপালেও একটু বিশেষ স্পন্দন।” এই জাতীয় আরও অনেক কথা কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে হইল। মা'র মুখের কথা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া না রাখিতে পারিলে পরে ঠিক ঠিক পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মায়ের কথার ভাবটিও ঠিক ঠিক রক্ষা করা কঠিন হইয়া যায়।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় দিল্লী হইতে টিহরীর মহারাজা সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন। মা'র শরীরের অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াই আমার

নিকট তার করিয়াছিলেন। আজ হইতে পার্লামেন্টের অধিবেশন তিন দিন বন্ধ, তাই মা'র নিকট আসিয়াছেন। মা'র এইরূপ অবস্থার মধ্যে তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া উঠিলে পাছে আমাদের সকলকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, সেইজন্য নিজেরাই সমস্ত দিক্‌টা বিবেচনা করিয়া শহরে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য দেরাদুন শহরে তাঁহাদের নিজেদের বাড়ীও আছে।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ বৃহস্পতিবার। কবিরাজ মহাশয় সমস্ত দিনরাত্রি মৌন থাকেন। মা'র সঙ্গে তাই আজ আর কোন কথাবার্তাই হইল না।

মা প্রায় বেলা ১২টায় উঠিলেন। সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিয়া গেল।

মা কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—"আজকাল আবার একটা নূতন রকম দেখা যাচ্ছে। কখনো কখনো পা থেকে কোমর পর্যন্ত যেন হঠাৎ ঝটকা দিয়ে বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মা'র সকলই অসাধারণ। ইহা আবার কিরূপ তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না।

১৬ই আগষ্ট ১৯৫৭।

সকালে মা প্রায় ১১টার সময় উঠিলে কবিরাজ মহাশয়কে মা'র নিকট ডাকিয়া লইলাম। বিশেষ কোন কথাবার্তা আর হইল না। সাধারণভাবে শরীর সম্বন্ধে অল্প অল্প কথা হইল।

সন্ধ্যার গাড়ীতে কবিরাজ মহাশয় কাশী রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে কমলও চলিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আরও কয়েকটী দিন

থাকার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু কাশীতে তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমেও জন্মাষ্টমী উৎসব আছে, তাই আর দেরী করিতে পারিলেন না।

১৭ই আগষ্ট ১৯৫৭।

দেরাদুনে মা'র উপস্থিতিতে জন্মাষ্টমী।

আগামী কাল জন্মাষ্টমী। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত দেরাদুনে মা'র নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। আগামী কাল উদয়াস্ত অখণ্ড নাম-কীর্তন হইবার কথা। সেইজন্য দিল্লী হইতে ছেলেদের মধ্যে অনেকেই আসিয়াছে। দিল্লী হইতে শ্রীযুক্ত বর্মাজীরও আসিবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাঁহার কাঁধের হাড়ে নাকি চোট লাগিয়াছে, কাজেই আসিতে পারেন নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বম্বে হইতে আবার ভাইয়া, লীলা ও কানিয়াভাই প্রভৃতির আসিবার কথা ছিল ; কিন্তু তাঁহারাও বিশেষ কি কাজে আটকাইয়া পড়িলেন।

নীচে হলঘরের মধ্যখানে কলাগাছ লতা-পাতা ইত্যাদির দ্বারা বেশ সুন্দর করিয়া নাম-যজ্ঞের মঞ্চ রচনা করা হইল। সন্ধ্যার পর কীর্তনের বিধিমত অধিবাস হইল। মা-ও উপরের বারান্দায় অসিয়া চেয়ারে অনেকক্ষণ বসিলেন। তাহার পর কীর্তন আরম্ভ হইলে মা উঠিয়া ঘরে গেলেন।

১৮ই আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ প্রাতঃকাল হইতে নাম-কীর্তন চলিতেছে। ছেলেরা সকলে মিলিয়া আবেগভরে গাহিতেছে—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।"

মা-ও প্রায় ১২টায় বাহিরে আসিয়া বারান্দার চেয়ারে বসিলেন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেলে মা আর একবার আসিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন। তাহার পর বিশ্রাম করিতে লইয়া যাওয়া হইল।

দিল্লীর কমলা যশপাল কয়েকদিন হয় তাঁহাদের মেয়ে লইয়া মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। এবার গ্রীষ্মকালে আশ্রমে কয়েকজনকে লইয়া কমলা কেদারনাথ ও বদরীনাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন। আজ জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার যাত্রা পূর্ণ উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় কীর্তন সমাপ্ত হইলে একটু নগর-কীর্তন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। সমস্ত দিন বেশ সুন্দর কীর্তন হইয়াছে।

হলঘরের বারান্দায় লক্ষ্মী ও মহীশূরের মহারানী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া খুব সুন্দর করিয়া সিংহাসন সাজাইয়াছে। তাহার উপরেই সব ঠাকুর বসাইয়া পূজা হইল। মা রাত্রি ঠিক ১২টার সময় আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। উপরেই মা যাহাতে শুইয়া শুইয়া সব দেখিতে পারেন সেজন্য একটি খাট খুব সুন্দর করিয়া সার্টিনের কাপড় ও জরির ঝালর ইত্যাদি দ্বারা সাজান হইয়াছে। নীচে কীর্তন ও পূজা চলিতেছিল। মা প্রায় ১৷৷০টার পর ঘরে গিয়া শুইলেন। অনেকেই উপবাস করিয়াছিল। তাহাদের সকলের প্রসাদ-গ্রহণ শেষ করিয়া আমাদের বিশ্রাম করিতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল।

১৯শে আগষ্ট ১৯৫৭।

এবার কবিরাজ মহাশয় এখানে থাকাকালীন তাঁহার সঙ্গে একদিন পরমহংস যোগানন্দের 'যোগীর আত্মজীবনী' পুস্তক লইয়া আলোচনা হইতেছিল।

যোগানন্দ স্বামিজী দীর্ঘ পনের বৎসর সুদূর আমেরিকা মহাদেশে থাকিয়া ভারতে ১৯৩৫ সনে একবার আসিয়াছিলেন। এখানে আসার পর মা'র সহিত তাঁহার দুই-তিনবার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি ১৯৩৬ সনে আবার আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে গিয়া 'Autobiography of a Yogi' নাম দিয়া ইংরাজিতে তাঁহার আত্মজীবনী প্রকাশিত করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ পুস্তকটি পৃথিবীর বহু ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে মা'র সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ একটি বহুপ্রচারিত পুস্তকে মা'র সম্বন্ধে অনেকরকম সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা ও ঘটনাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকটি লইয়া ইতিপূর্বেও ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি অনেকেই মা'র নিকট আলোচনা করিয়াছেন।

পরমহংস যোগানন্দ-জীর আত্মজীবনীতে শ্রীশ্রীমা'র সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্ত কথা ও ঘটনা।

পরমহংস যোগানন্দজী ১৯৩৬ সনের পর আর ভারতে আসেন নাই এবং মা'র সহিতও আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবার তিনি হয়ত সময় বা সুযোগ পান নাই। অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে মা'র সম্বন্ধে নানা প্রকার ভ্রান্ত সংবাদও হয়ত তিনি শুনিয়া থাকিতে পারেন। আজ যোগানন্দজী এ জগতে নাই। ভারতে আসিয়া মা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার বা জানিবার সুযোগ পাইলে তিনি নিজেও হয়ত মা'র সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

পুস্তকটির একস্থানে তিনি লিখিতেছেন—মা তাঁহার দুই হাত দিয়া যোগানন্দজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের উপর মাথাটি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, মা কখনও কাহারও এইভাবে গলা জড়াইয়া ধরা বা কাঁধের উপর মাথা রাখা ইত্যাদি করেন না। বাল্যকালে নিজের শরীরের

মায়েরও গলা জড়ান বা বিশেষ কাছে ঘেঁসিয়া বসাও কখনও নাকি মা'র দেখা যায় নাই।

অপর একস্থানে লিখিত আছে যে, মা যোগানন্দজীকে বলিতেছেন,—"বাবা, এ-জীবনে আজ আমি আপনাকে এই প্রথম দেখছি কত যুগযুগান্ত পরে। এখান আর চলে যাবেন না।" মা'র মুখে এ-জাতীয় কথা আমরা কখনও শুনি নাই। তাই মাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। মা বলিয়াছেন যে, "তোমার নাম শুনেছি, বাইরে দেখার সুযোগ, যোগাযোগ, বাবা, এই ত করিয়ে নিলে"—এইরকম কথা হইয়াছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে পুস্তকটিতে মা'র জন্মস্থান বা জন্মতারিখও সম্পূর্ণ ভুল ছাপা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, একস্থানে ভোলানাথ ও মা সম্বন্ধে এমন সব অবিশ্বাস্য কথা ও ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে তাহা পড়িলে সত্যই বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। মা বা ভোলানাথ সম্বন্ধে যাঁহারা সামান্য কিছুও জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও একবাক্যে না বলিয়া পারিবেন না যে ঐ-সমস্ত বিষয় সবই কাল্পনিক বা মিথ্যা।

যোগানন্দজী স্বয়ং যে মা'র সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার লিখিত আত্মজীবনী হইতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ঘটনাচক্রে মা'র সম্বন্ধে এমন সমস্ত কথা তাঁহার লিখিত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে সত্যই দুঃখিত হইতে হয়। দুনিয়ার এইরূপ একটি বহু-প্রচলিত পুস্তকে যদি ঠিক ঠিক সত্য ঘটনা বা সত্য কথা লেখা হইত তবে আমাদের সকলেরই কত আনন্দ ও গৌরবের কারণ হইত।

মা'র ও আমাদের এখান হইতে ২৩শে কাশী রওনা হইবার কথা হইয়াছে। কেহ কেহ খুব সম্ভবতঃ দুই-একদিন পূর্বেই চলিয়া যাইবে।

দুই-তিনদিন হয় লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সহায়ের টেলিগ্রাম আসিয়াছে

যে তাঁহাদের একমাত্র পুত্র টুটু প্যারিসে গত ১১ই হঠাৎ মারা গিয়াছে।

একটি দুঃখদায়ক ঘটনা।

এই সংবাদটি পাইয়া আমরা সকলেই বিশেষ মর্মাহত হইলাম। চক্রধারীর চক্র বুঝিয়া ওঠা মুস্কিল। শ্রীযুক্ত সহায় উত্তর প্রদেশের Chief Conservator of Forests. তিনি ডাঃ পান্নালাল-এর বড় জামাতা। লীলা এবং রামেশ্বর সহায় উভয়েই আমাদের বিশেষ পরিচিত। টুটু একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিল। ভারত সরকার হইতে প্যারিসে আণবিক শক্তির গবেষণায় সে কয়েক বৎসর যাবৎ নিযুক্ত ছিল। এইভাবে আকস্মিকরূপে যে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইবে তাহা কেহই ধারণা করিতে পারে নাই। মা সংবাদ পাইয়াই লীলা, রামেশ্বরভাই এবং ডাঃ পান্নালালজীর নিকটে বিশেষ করিয়া চিঠি লিখাইলেন। মা'র বাণী পাইয়া যদি এই দারুণ শোকে কিছুটা সান্ত্বনা পায়।

২০শে আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ সকালে সাবিত্রী কাশী আশ্রম হইতে আসিয়া পৌঁছিল। সে আসিয়া প্রণাম করিবামাত্র মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপাল ভালো আছে ত?"

সাবিত্রী একটু অবাক্ হইয়া ধীরে ধীরে জবাব দিল,—"হ্যাঁ, ভালই ত দেখলাম।"

কাশী আশ্রমস্থিত প্রতিষ্ঠিত গোপালের অলৌকিক ঘটনা

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, 'গোপাল কাহারও নাম'। কিন্তু মা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কাশী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত গোপালজীর বিষয়ে। গোপালজীর অনেক অলৌকিক ঘটনা পূর্বে আরও ঘটিয়াছে। মা'র মুখেও অনেক সময় এই প্রশ্ন শুনিয়াছি—"গোপাল কেমন আছে?" আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

সাবিত্রীর জবাব শুনিয়া মা আজ যেন তেমন নিশ্চিন্ত হইলেন না। আস্তে আস্তে বলিলেন,—"কাল রাত্রেই আমি কয়েকবার বুনিকে বলেছি যে, গোপাল এসে তাঁর ছোট্ট লাল লাল হাতখানি এই শরীরকে বার বার দেখাচ্ছেন। বেশ চোট পেয়েছেন, এই ভাবটা।"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম,—"এ আবার কি কাণ্ড!" কারণ, মা জন্মাষ্টমীর তিন-চারদিন পূর্বেই কাশীতে অতুল ব্রহ্মচারী ও মাখনকে চিঠি দ্বারা জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তাহারা যেন জন্মাষ্টমীর দিন গোপালজীকে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করে। তবে গোপালজীর নিশ্চয়ই ঐ দিনই শরীরে কোথাও চোট লাগিয়াছে।

মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু বলল নাকি? তোমার কাছে এসে বেশ নালিশ করে গেল ত!"

মা অল্প অল্প হাসিয়া বলিলেন,—"না নালিশ না। তবে ব্যথা লেগেছে, তাই এই শরীরটাকে জানিয়ে গেল। সমস্ত শরীরটাতেই বেশ লেগেছে।"

সাবিত্রী ত অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল, এইজন্যই আসিবামাত্র সাবিত্রীকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপাল কেমন আছে?" কিন্তু আশ্চর্য এমন যে, কাশীতে কাহারও মুখে সে শুনিয়া আসে নাই যে জন্মাষ্টমীর দিন গোপালজীর কিছু চোট লাগিয়াছে। এদিকে মা'র নিকট সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন,—"আমি কাল রাত্রেই বুনিকে বলছিলাম। কিন্তু ওকে মানা করে দিয়েছি কাউকে আর বলতে। ভাবছিলাম, দেখা যাক সাবিত্রী বা অন্য কেউ কি বলে!"

গতকাল হইতেই মা'র ঘাড়ে একটা খুব বেশী ব্যথা সুরু হইয়াছে। আজ সেইটির বেশ বাড়াবাড়িই। কে জানে গোপালজীর অঙ্গে আঘাত লাগিবার সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ আছে কিনা। কারণ, এইরূপ ঘটনা পূর্বেও

অনেকবার ঘটিয়াছে। মাকে তাই বলিলাম,—"মা, তোমার কি সেইজন্যেই এই ব্যথা আরম্ভ হ'ল নাকি আবার?"

মা প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দিদি, তুমি আবার এটার সঙ্গে ওটা লাগাচ্ছ কেন?" পরিষ্কার কিছু বলিলেন না। এইটুকু বলিয়াই নীরব রহিলেন।

মনে মনে মা'র কথাই ভাবিতে লাগিলাম। মা'র কি সব অলৌকিক ঘটনা! আজকাল সকলেই বলাবলি করে, পাথরের মূর্তি কী আবার জীবন্ত হইতে পারে? মূর্তিপূজায় সর্বসাধারণেরও তাই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবই দেখা যায়। কিন্তু করুণাময়ী মা নিজে কৃপা করিয়া নানাভাবে আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে আমাদের জ্ঞানের বাহিরেও বহু কিছু আছে। অনেক কিছু ঘটনা আছে যাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার আমাদের কোনও উপায় নাই।

আজ বিকালে বাটুদা, বিনয়দা, ঠাকুরমা, কৃপাল ও তাহার মেয়েকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পানুও মা'র নির্দেশে আজই আলমোড়া রওনা হইয়া গেল। মা ধীরে ধীরে এখানকার পাট ভাঙ্গিতে সুরু করিলেন। মা'রও ২৩শেই রওনা হইবার কথা। কিন্তু একবার মা'র মুখ হইতে শুনিলাম,—"দিদি, তোমরা ঐ তারিখে চলে যাও না। আমি না হয় একটু পরে যাব।" যদিও ইহা ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনও কথাই হয় নাই, তাই ২৩শের জন্য গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় এখানকার একজন ডাক্তার শ্রীবলবন্ত সিং মা'র নিকট দুইজন স্ত্রীলোক-সহ আসিয়াছেন। তিনি পূর্বে কখনো আশ্রমে মা'র নিকট আসেন নাই। তবে রাস্তায় মা কখনো কখনো বেড়াইতে বাহির হইলে, তিনি কয়েকবারই মা'র দর্শন পাইয়াছেন। তিনি আসিয়া মাকে বলিতে লাগিলেন, "মাতাজী, শুনিলাম আপনার শরীর ভাল যাইতেছে না। তবে আপনার শরীরের তো

একটি বিচিত্র ঘটনা।

কোন প্রয়োজনও নাই। আপনি ত পূর্ণকাম। তবে আপনার শরীর নিয়া আমাদের প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয়, আপনার সঙ্গে যাঁহারা ভক্ত আছেন তাঁহারা আপনার শরীর যে খারাপ হইতে পারে তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারেন না। তাই মাতাজী আমি আসিয়াছি, আপনার শরীর ভাল করিয়া তুলিতে। আমি নিজেও ডাক্তার। আমার সঙ্গে আরও অনেক ডাক্তার কবিরাজের পরিচয় আছে। আপনার চিকিৎসার যে ব্যয় হইবে তাহা সব আমিই বহন করিব।"

মা হাসিয়া বলিলেন,—"পিতাজী, এই শরীর ত কোনো ঔষধ নেয় না। তবে এই সম্বন্ধে তুমি পরমানন্দের সঙ্গে কথা বলিতে পার।" ভদ্রলোকটির কথার মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। ভাব দেখিয়া মনে হয় মা'র কতদিনের পরিচিত।

২২শে আগষ্ট ১৯৫৭।

আজ বেলা প্রায় ১টায় যোগীভাই মোটরে সোলন রওনা হইয়া গেলেন। যাইবার সময় মা'র নিকট হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিয়া গেলেন,—"মাতাজী, আপ্ খুদ খেয়াল কর্‌কে আচ্ছে হো যাইয়ে।"

মহীশূরের মহারানীও সঙ্গীয় সকলকে লইয়া আজ সন্ধ্যাতেই রওনা হইয়া গেলেন। কতদিন পর সন্ধ্যার সময় মা উপরে গাড়ীবারান্দার ছাদে একটু পায়চারী করিলেন।

মা'র যাইবার প্রোগ্রাম কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের প্রায় সকলকেই মা আগামী কাল কাশী পাঠাইয়া দিতেছেন। মা এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকিয়া ব্যথাটা একটু কমিলে পরে কাশী যাইবেন বলিলেন।

২৩শে আগষ্ট ১৯৫৭।

বিকাল প্রায় ৫৷৷৹টায় আমরা ২০৷২২জন দুন এক্‌স্‌প্রেসে কাশী রওনা হইলাম। স্টেশনে যাইবার পথে মাকে কল্যাণবনে রাখিয়া আসিলাম। মা হয়ত কয়েকটি দিন সেখানেই থাকিবেন। মা'র সঙ্গে কেবল পরমানন্দজী, নারায়ণস্বামী, হরপ্রসাদ, ভরদ্বাজ, কেশবানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন থাকিল।

হরিবাবাজী বৃন্দাবন ফিরিয়া যাইবার পূর্বে মা'র নিকট অনেকবার কিষণপুর ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও গিয়া কয়েকটি দিন থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, মা স্থান পরিবর্তন করিলেই হয়ত সুস্থ হইয়া উঠিবেন।

২৪শে আগষ্ট ১৯৫৭।

বিকাল প্রায় ৩৷৹টায় কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশনে আশ্রম হইতে অনেকেই আসিয়াছিলেন। মা'র শরীর এখনো ভালো না। তবু মা'র আদেশেই এই সময় মাকে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। মনটা সকলেরই বিশেষ চিন্তিত। এখানকার সকলেই আসিয়া বিশেষ করিয়া মা'র শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

২৬শে আগষ্ট ১৯৫৭।

দেরাদুন হইতে পত্র আসিয়াছে। মা'র ব্যথা এখনো আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা একটু কম মনে হয়। সম্পূর্ণ বিশ্রামেই আছেন। আজ হয়ত কল্যাণবন হইতে কয়েকদিনের জন্য রায়পুর আশ্রমে যাইতে পারেন।

২৯শে আগষ্ট ১৯৫৭।

রায়পুর হইতে পত্র পাইলাম। মা'র আজ সন্ধ্যায় দেরাদুন হইতে কাশী রওনা হইবার কথা।

প্রকাশানন্দ এতদিন মা'র নিকটেই ছিল। গত পরশু উত্তরকাশী ফিরিয়া গিয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তরকাশী আশ্রমের দেখাশোনা সে-ই করিতেছে। তাহার সঙ্গে গুজরাটি যুবক দীনবন্ধু তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় মা নাকি তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন,—"চেষ্টা করে যেমন এম্.এ. পাশ করেছ, সেই রকমই এদিকেও পাশ করবার জন্যে চেষ্টা করতে লেগে যাও।"

দীনবন্ধু রাজপিপ্‌লার পুরাতন ভক্ত চুনীলাল ভাইয়ের পুত্র। পিতার কারবার কয়েকবারই দেখাশোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মা'র প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকায়, মাঝে মাঝেই মা'র কাছে আসিয়া থাকিয়া যায়। বেশ শান্ত প্রকৃতির ভদ্র যুবক।

৩০শে আগষ্ট ১৯৫৭।

মা আসিবেন বলিয়া পটল উৎসাহ-সহকারে আশ্রম, সদর দরজা এবং রাস্তা পর্যন্ত ফুল-পাতা দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মা এতদিন পরে আবার কাশী আসিতেছেন। স্থানীয় ভক্ত এবং আশ্রম-বাসীদের কতই না আনন্দ। স্টেশনে ডাঃ দাশগুপ্ত, পটল, কমল প্রভৃতি অনেকেই গিয়াছিল। মা বেলা প্রায় ৪টার পর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। পথে কবিরাজ মহাশয়ের বাসা হইয়া আসিয়াছেন। মা'র জন্য বড় রাস্তার উপর একটি সুসজ্জিত পাল্কী রাখা হইয়াছিল—হাঁটিয়া আসিতে মা'র যদি কষ্ট হয়। পাল্কীতে করিয়াই মাকে আশ্রমে আনা হইয়াছে। এইরূপ অসুস্থতার পর এতটা দীর্ঘ পথ রেলে আসাতে মাকে বেশ যেন ক্লান্ত দেখাইতেছে।

স্বামিজীর নিকট শুনিলাম, আজ সকালে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে মা'র দর্শনের জন্য বহু ভক্ত নর-নারী আসিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া মা'র অসুস্থতার পর মাকে দেখিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

ফয়জাবাদ স্টেশন হইতে কিছু দূরে ট্রেনের মধ্যে কি করিয়া একটি কয়লার টুকরা আসিয়া মা'র চোখের মধ্যে পড়ে। দরজা-জানালা যদিও সব বন্ধই ছিল, কিন্তু তবুও কয়লা কিভাবে আসিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। আশ্রমে আসিবার পরে চোখে কয়েকবার গোলাপ জল দিয়া ধুইবার পর এক টুকরা বাহির হইল। রাত্রে ডাঃ নাথ মা'র দর্শনের জন্য আসিলে, তিনি আবার তুলার সাহায্যে একটি টুকরা বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু এখনো কিছু যেন মা'র চোখের মধ্যে আছে।

৩১শে আগষ্ট ১৯৫৭।

সকালে প্রায় ১০টার সময় মা অল্প সময়ের জন্য অন্নপূর্ণার নাট-মন্দিরে গিয়া বসিলেন। সেই সময় সকলে আসিয়া মা'র দর্শন করিলেন।

প্রায় ১১টার সময় ডাঃ নাথ তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া মা'র চক্ষু পরীক্ষার জন্য আসিলেন। দেখিলেন, তারার অতি নিকটে একটি ছোট টুকরা বিঁধিয়া আছে। যন্ত্র-সাহায্যে অতি সাবধানে সেই টুকরাটি বাহির করিয়া দিলেন। তবে চোখে যন্ত্রণা যেন সম্পূর্ণ কমিল না। আগামী কাল হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবত-জয়ন্তী আরম্ভ হইবার কথা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নারায়ণস্বামিজীর নিকট হইতে মা'র দেরাদুন অবস্থান-কালের কয়েকটি ঘটনা শুনিলাম। ঘটনাগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য।

একদিন সকালবেলা দিল্লীর পুরাতন ভক্ত চারুদা সস্ত্রীক মা'র দর্শনে আসিয়া সকলের সম্মুখে একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

একবার মা যখন দিল্লীতে ডাঃ জে. কে. সেনের বাসায় ছিলেন, সেই সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার (হাইকোর্টের জজ) খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। শিশিরবাবু কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। ডাক্তাররাও সকলে প্রায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ সেন চারুবাবুকে অনুরোধ করিতেছিলেন মা'র নিকট শিশিরকুমারের জীবন-রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে। তিনি নিজে মা'র নিকট প্রার্থনা জানাইতে একটু সঙ্কোচ করিতেছিলেন।

অগত্যা চারুবাবু আসিয়া মাকে বলিলেন,—"মা, তুমি শিশিরের প্রাণ রক্ষা কর। ডাক্তারবাবু এই বৃদ্ধ বয়সে যেন পুত্রশোক না পান।"

মা এই কথা শুনিয়া একটু জোরের সঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, তোমাদের শাস্ত্রে আছে না পঞ্চাশ পার হলে বনে যাওয়ার কথা। তোমরা ত সেই সব কথা মানতে চাও না। বেশীদিন সংসারে থাকতে গেলেই এই সব নানারকম শোক-দুঃখ পেতেই হয়।"

এই কথার একটু পরেই মা গিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িলেন। সকলে পরে সংবাদ পাইল যে মা'র শরীরটা ভাল না।

আশ্চর্য, কয়েক ঘণ্টা পরেই কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল, শিশির-কুমারের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল।

চারুবাবুর স্ত্রী চারুবাবুকে বার বার অনুযোগ দিতেছিলেন যে মাকে এই সব কথা জানান ঠিক হয় নাই। মা শিশিরবাবুর রোগ নিজ শরীরের উপর টানিয়া নিয়াছেন। বাস্তবিকই দেখা গেল, শিশিরকুমার ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। এইরূপ অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন মা'র জীবনে অহঃরহ দেখা যায়। আর তাহার কয়টাই বা আমরা জানি!

চারুবাবু যখন এবার এই সব কথা মা'র নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন মা-ও বলিলেন,—"হ্যাঁ বাবা, এমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, সেই সময় এই শরীরটা কি দেখছিল জান? দেখা যাচ্ছিল মহাদেব বসে আছেন;

তাঁহার নিকটে একটি হাঁড়ি, সেই হাঁড়ির গা বেয়ে অসংখ্য ছোট ছোট পোকা এসে ভিতরে পড়ছে। মহাদেব যেন সেগুলি সব খেয়ে ফেলবেন।"

আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, পরে সত্য সত্যই সংবাদ পাওয়া গেল যে কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকেরা রোগ পরীক্ষা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে পুরাতন কাগজের ভিতর এক প্রকার ছোট ছোট পোকা দেখা যায় তাহা শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া গিয়া অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। বহু সংখ্যক পোকা একত্রে সৃষ্ট হইয়া ভিতরে এরূপ জখম করিয়া দিয়াছিল যে মুখ দিয়া সর্বদা পূঁজ ও রক্ত পড়িতেছিল।

মা আরও একটি কথা প্রকাশ করিলেন। শিশিরকুমারের মা একটি মন্ত্র জপ করিতেন। মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন সেই মন্ত্রটি ছেলেকে দিতে এবং সে যেন নিত্য ঐ মন্ত্র জপ করে। যাঁহার অসীম কৃপায় ঐরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে সে মুক্ত হইল তাঁহার নাম জপ করাই একমাত্র কর্তব্য। মা'র কৃপায় শিশিরবাবু এখনো সুস্থ শরীরে অতি উচ্চ পদে সরকারী কাজ করিয়া যাইতেছেন।

চারুবাবুও তাই মাকে এবং অন্য সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন যে, মা'র বর্তমান শরীরের এইরূপ অবস্থার প্রকৃত কারণ কী তাহা আমরা এখনো কিছুই জানি না। মা নিজে কৃপা করিয়া প্রকাশ না করিলে আমাদের ত জানিবার আর কোনই উপায় নাই।

আর একটি ঘটনা। একদিন রায়পুর মৌন-মন্দিরের সম্মুখে মা বসিয়াছিলেন। এমন সময় রায়সাহেব মাধোরামজীর পুত্রবধূ হংসা দেবী আসিয়া ফুল-বেলপাতা দিয়া মা'র চরণে অঞ্জলি প্রদান করে। বেলপাতাগুলির মধ্যে শ্বেতচন্দন দিয়া কিছু লেখা ছিল। মা উপস্থিত কাহাকেও কাহাকেও ঐ বেলপাতা হাতে ধরিয়া দেন।

বেলপাতায় কি লেখা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করায়, 'মা নারায়ণ স্বামিজীকে বলিতে বলিলেন। তিনি পড়িতে গিয়া দেখিলেন যে অক্ষরগুলি পড়া

যাইতেছে না। মা তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন,—"ষড়ক্ষর মন্ত্র লেখা আছে।" মা'র আদেশ পাইয়া তিনি তখন মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া দিলেন।

একে একে প্রত্যেকেই আসিয়া মা'র নিকট বলিতে লাগিল,—"মা, তুমি নিজ মুখে বলে দেও, কি মন্ত্র লেখা আছে।" কিন্তু মা ত কথনো মন্ত্র উচ্চারণ করেন না। তাই মা'র আদেশে নারায়ণস্বামিজী মন্ত্র বলিতে লাগিলেন। মা তাহার পর সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"যারা যারা বেলপাতা পেয়েছ, তারা ঐ মন্ত্র জপ করো।"

এইভাবে খেলায় খেলায় অনেকে ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিল।

যাঁহারা বেলপাতা পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আলমোড়া জেলার আস্কোটের রাজাদের এক আত্মীয়া এবং তাঁহার কন্যাও ছিলেন। তাঁহারা এই ব্যাপারটিকে দীক্ষা-গ্রহণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রভাতে মা'র জন্য বস্ত্র, ফল, ফুল, দীপ, দক্ষিণা প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। তাঁহারা মাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া পূজা ও আরতি করিলেন।

এইরূপ খেলায় খেলায় মা যে কি করেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অতীত। মা জাগতিক দৃষ্টিতে কখনও মন্ত্র-দীক্ষা দেন না। তবে এইরূপ সব ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া যায় যে তাহা সব সময়ে আমরাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য আজকাল জানিত অজানিত এমন অনেক স্ত্রী-পুরুষ আছেন যাঁহারা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করেন যে মা-ই তাঁহাদের একমাত্র গুরু এবং তাঁহারা মা'রই কৃপাতে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

আজ হইতে আশ্রমের শ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হইল। আশ্রমে ইহা প্রথমে আরম্ভ করেন মা'র ভক্ত ৺কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁহার

পরলোকগমনের পরেও ইহা বন্ধ হয় নাই এবং তাঁহার স্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে প্রতি বৎসরই ভাদ্র শুক্লা অষ্টমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ভাগবত-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

আশ্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত-জয়ন্তী উৎসব।

এইবার এই সপ্তাহের যজমান হইলেন বম্বের শ্রীবাবুভাই কানিয়া। তিনিই অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই উপলক্ষে তিনি সপরিবারে কাশীতে মায়ের নিকট আসিয়াছেন।

আজ সকালবেলা মায়ের সম্মুখে যথানিয়মে ঘটস্থাপনা হইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তির ষোড়শোপচারে পূজা হইবার পর শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ করিতেছেন বৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রী। বাটুদা, ব্রহ্মচারী কান্তিভাই, কলিকাতার বিনয়বাবু এবং ব্রজবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবক ধারক, জাপক এবং শ্রোতার পদে ব্রতী হইলেন। সকালে মাহাত্ম্য পাঠ হইল এবং বিকালে শ্রীনাথজীই হিন্দীতে ব্যাখ্যা করিলেন।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় ও ডাক্তার গোপালদাদা মা'র ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। নানারূপ কথাবার্তা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বেই দেরাদুনে মা'র শরীরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সকলেরই স্মরণে আছে। মা'র এখন কিছুদিন কোথাও একান্তে বিশ্রাম করা বিশেষ দরকার। এই জাতীয় কথাই হইতেছে। গোপালদাদা বলিলেন,—"মা-ই ত বিন্ধ্য-বাসিনী। তাই মা'র কিছুদিন স্বস্থানে গিয়ে বিশ্রাম করাই ত ঠিক।"

মা এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বাবার কথা শোন।"

কিন্তু গোপালদাদার এই কথার পশ্চাতে গূঢ় অর্থ লুকান আছে। যোগী-ভাইও একবার দেখিয়াছিলেন যে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী এবং মা অভিন্ন। জাগ্রত অবস্থায় জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে মা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্তি ধারণ করিয়া আবার কিছুক্ষণ পরে স্বরূপ ধারণ করিলেন। যোগীভাই মা'র গলায় যে মালা পরাইয়াছিলেন তাহা দেখিলেন দেবী-মূর্তির গলায় ঝুলিতেছে। আবার দেবীর গলায় তিনি মালা দিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহা মা'রই গলায় শোভা পাইতেছে। যোগীভাইয়ের এই ঘটনা আমরা কয়েকজন মাত্র জানি।

যোগীভাইয়ের অপূর্ব দর্শন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। বৃন্দাবনের রাধা-রমণজীর জন্য এবার কলিকাতার ভক্ত শ্রীঅরুণ ঘোষ কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটি মূল্যবান্ সিংহাসন বানাইয়া দিয়াছে। গত ২৫শে বৃন্দাবনে এই সিংহাসনের উপর মূর্তি-স্থাপন উৎসব হইয়া গিয়াছে। মাকে সেই সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত থাকিবার জন্য অরুণ বার বার প্রার্থনা জানাইয়াছিল। মা'র যাওয়ার কথাও একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু মা'র শরীর সেই সময় বিশেষ খারাপ থাকাতে যাওয়া হইয়া ওঠে নাই। মা যদিও অরুণকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"দুঃখ যেন না করে। তোমাদের দৃষ্টিতে এই শরীরটার যাওয়া না হ'লেও এই শরীরটা সেখানেই থাকবে।" মা'র এই কথার উপরে অরুণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

আরও একটি ঘটনা।

সিংহাসনে দেবমূর্তি যখন স্থাপিত করা হইতেছে, তখন অরুণের স্ত্রী তাহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন,—"কৈ, মা এলেন না?" অরুণ যদিও সেই সময় পরিষ্কার অনুভব করিতেছিল যে মা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত আছেন। তাই সে জোর দিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিয়া উঠিল,—"তুমি দেখতে পাচ্ছ না? মা ত উপস্থিত রয়েছেন। ঐ যে—"

অরুণ মাকে ইতিপূর্বেও নানারূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। একবার অরুণ দেখিয়াছিল মা বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর মন্দিরের ভিতরে দাঁড়াইয়া আছেন। একটু পরে বিগ্রহের সম্মুখের পরদা উঠিলে দেখা গেল মা মহাপ্রভুর রূপ ধারণ করিয়াছেন, আবার মহাপ্রভুই মা'র মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন।

আর একবার অরুণ দেখিয়াছিল যে সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে মহাপ্রভু ও মা ভাসিয়া চলিয়াছেন।

আরও একবার দেখিতে পাইয়াছিল যে, অরুণ মা'র গলায় যে মালা পরাইয়া দিয়াছিল সেই মালা মহাপ্রভুর গলায় শোভা পাইতেছে এবং মহাপ্রভুর গলার মালা মা'র গলায় রহিয়াছে।

এইরূপ কতভাবে কতরূপে যে মা কতজনকে সর্বদাই দর্শন দিতেছেন তাহার সংবাদ আমরা কয়টিই বা জানি। এই সব কথা যখন একবার মা'র সম্মুখে হইতেছিল তখন মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"এ শরীরের ত কোনও গোলমাল নাই। যে যা বলে তাই। আবার যদি কেহ বলে কিছু না, তবে কিছুই না।"

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

ভাগবত-জয়ন্তী বেশ ভালভাবে গতকাল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে অনেকেই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ হইতে ডাঃ পান্নালালজী তাঁহার কন্যা লীলা ও তাহার স্বামীকে (শ্রীযুক্ত সহায়, I.F.S., Chief Conservator of Forests, U.P.) সঙ্গে লইয়া মা'র নিকটে আসিয়াছিলেন।

লীলা বিশেষ শোকার্ত। প্রায় এক মাস হইল তাহার একমাত্র পুত্র প্যারিসে দেহত্যাগ করিয়াছে। কামেশ্বর বা টুটুকে আমরা সকলেই ছোটবেলা

হইতে বিশেষভাবে জানিতাম। বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্যারিসে আনবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়াছিল। তাহার এই গবেষণার ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই আশা করিতেছি যে টুটু এক সময়ে দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে।

অকস্মাৎ এইরূপ সন্তানের মৃত্যুতে পরিবারের সকলেই বিশেষ শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছেন। তাই মা'র নিকট শান্তিলাভের আশায় পরিবারের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লীলা খুবই উচ্চশিক্ষিতা এবং গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা। এইরূপ ভয়ানক শোকেও সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। তাহার ধৈর্য্য ও সহ্যগুণ দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম।

মা'র নিকট কথা-প্রসঙ্গে লীলা বলিতেছিল,—"মা, আমি সবই বুঝি। ভগবান্ যাহা করেন তাহার মধ্যে কোনও ভুল বা অন্যায় নাই। কিন্তু তবুও সব সময় যেন সহ্য করিয়া উঠিতে পারি না।"

টুটুর সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনার বিষয়ও আমরা জানিতে পারিলাম। একদিন লীলার পূজা করিতে করিতে হঠাৎ কেন জানি মনে হইল, টুটুকে মা'র পায়ে অর্পণ করিয়া দেয়। অমনি মনে মনে টুটুকে মা'র পায়ে অর্পণ করিয়া দিল। মা যে টুটুকে এইভাবে তাঁহার শ্রীচরণে মৃত্যুর বহু পূর্বেই স্থান দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশও কোথায়!

একটি সুন্দর ঘটনা।

একবার কী উপলক্ষে ডাঃ পান্নালালজী মায়ের নিকট কাশীতে আসিয়াছিলেন। নীচের হলঘরে সৎসঙ্গ হইতেছে। সৎসঙ্গে বসিয়াই মা'র হঠাৎ কেন জানি টুটুর কথা খেয়াল হইল। সৎসঙ্গ সমাপ্ত হইলে উপরে উঠিতে উঠিতে মা পান্নালালজীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পিতাজী, টুটুকো ষড়ক্ষর মন্ত্র লিখকে দে দেনা। ইহ জপ উহ কিয়া করে।"

এই কথা আমরা কেহই তখন জানিতে পারি নাই। আজ ডাঃ পান্নালালজী

কথায় কথায় ইহা প্রকাশ করিলেন। ইহার পরেই ৺দুর্গাপূজার সময় মা যখন এলাহাবাদে গিয়াছিলেন তখন মা আমাকে দিয়াই একটি বেলপাতার উপরে ষড়ক্ষর মন্ত্র লিখাইয়া টুটুকে তাহা দেওয়াইয়া ছিলেন। মা'র নির্দেশ-মত সে ঐ মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করে। যাহাকে কৃপা করিবার তাহাকে তিনি নিজেই অযাচিতভাবে অহেতুক করুণা করিয়া থাকেন। যে মুহূর্তে টুটুকে লীলা মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছে সেইক্ষণ হইতেই, কিভাবে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহার ব্যবস্থা মা স্বয়ং করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কোথায়!

বি. এস্‌সি. পাশ করিবার পরেই টুটুর বিলাতে গিয়া পড়াশুনা করিবার কথা হইতেছিল। মাকে এই সম্বন্ধে পান্নালালজী জিজ্ঞাসা করায় মা তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন,—"এখানেই এম্‌. এ. পাশ করে একটা প্রফেসারী করলেই ত ভালো।"

পান্নালালজী কিন্তু কাহাকেও এই কথা তখন আর বলিলেন না। টুটুর যখন বিলাত যাওয়া প্রায় স্থির তখন মা নিজ হইতেই এবার লীলাকে বলিলেন,—"টুটু দু'টি বছর বিলাত না গিয়া পারে না?"

লীলা উত্তরে মাকে বলিয়াছিল যে টুটুর ঐরূপ উৎসাহ, যাইবার কথা-বার্তাও সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থাতে টুটুকে যাইতে সে নিষেধ করিতে পারে না। তবে মা যদি কৃপা করিয়া টুটুর মত পরিবর্তন করিয়া দেন তবে ভিন্ন কথা।

বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, টুটু এখানেই এম্‌. এস্‌সি. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ব-ইচ্ছায় সে বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। ইহা সকলই মায়ের খেলা।

টুটু এলাহাবাদে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া বেশ ভালভাবে পরে এম্‌. এস্‌সি. পাশ করিল। কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিবে। পাশ করিবার কিছুদিন পরেই টুটু ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে গবেষণার জন্য ফ্রান্সে চলিয়া

গেল। আশ্চর্য যে, এবার তাহার যাওয়া না-যাওয়া সম্বন্ধে মাকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। চলিয়া যাইবার পরে মা সংবাদ পান। যাহা হইবার তাহা এইভাবেই হইয়া যায়। সেখানে গিয়া প্রায় তুই বৎসর পরে সে সুস্থ শরীরে কিভাবে দেহত্যাগ করিল তাহার প্রকৃত বিবরণ এখনো কেহ জানিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের উপাসনাই ছিল তাহার একমাত্র কাম্য। সেই বিজ্ঞানের উপাসনা করিতে করিতেই অকালে এই কৃতী যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

যাহাই হউক, টুটুর আত্মার যে উর্ধ্বগতি হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সমস্ত পরিবারের উপরেই মা'র বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে। লীলাকে মা সাধন-ভজন করিবার জন্য একখানি সাদা কম্বল এবং নিত্য পাঠের জন্য একখানা শ্রীমদ্ভাগবত স্বহস্তে প্রদান করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীকে মা'র সম্মুখে বসাইয়া ভাগবত পাঠক রাইয়াছেন। মহানিশাতেও রেশমী বস্ত্র পরাইয়া ঐ সাদা কম্বলের উপর বসাইয়া লীলাকে দিয়া মা কী জপ করাইয়াছেন। মা'র অপার করুণা তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

এবার কাশী আশ্রমে ৺দুর্গাপূজা হইবে। অনেকদিন পূর্বেই স্বর্গীয় নির্মলবাবুর স্ত্রী (আমার বড়দিদি) বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কাশীতে একবার পূজার আয়োজন করেন। মা এবার তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। এবং পূজার সময় আকস্মিক কোন বাধা-বিঘ্ন না হইলে মা এইখানেই থাকিবেন এই জাতীয় কথাও হইয়া আছে।

লক্ষ্ণৌর একজন বাঙ্গালী যুবক, খুব সুন্দর প্রতিমা গড়িতে পারে। ইতিপূর্বে আশ্রমের অনেক স্থানে সে গিয়া নিজ হস্তে প্রতিমা গড়িয়াছে। এবারও সে-ই দেবীমূর্তি বানাইতেছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

কাশী আশ্রমে বড় দিদির দুর্গাপূজা।

আজ দেবীর শুভ বোধন। মা'র উপস্থিতিতে সন্ধ্যার সময় বিধিমত দেবীর বোধন হইয়া গেল। মূর্তি খুবই সুন্দর হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতেছে। মৃণ্ময়ী মূর্তি যেন একেবারে জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

আজ উষা-কীর্তনের পরে খুব ধুমধামের সহিত দেবীর মঙ্গল আরতি হইল। সমস্ত আশ্রম যেন এক নূতন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত নর-নারী সকলেই পবিত্র ও শুদ্ধ ভাব লইয়া দেবীর দর্শনে সমাগত। তদুপরি মায়ের উপস্থিতি যেন সকলের প্রাণে আনন্দ আরও শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। আরতি সমাপ্ত হইলে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে সকলে প্রণাম করিল।

পূজার আয়োজন মা'রই তত্ত্বাবধানে হইতেছে। স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, কোথায় কি কি করা কর্তব্য তাহা মা দেখাইয়া দিতেছেন। দেবী-পূজা বহু স্থানেই হইয়া থাকে, কিন্তু মায়ের সাক্ষাৎ নির্দেশে পূজায় যেরূপ প্রকৃত বিধিমত ব্যবস্থা হয়, তাহা অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পূজা অপেক্ষা উৎসবের আড়ম্বরই আজকাল সর্বত্র বেশী হইয়া থাকে। আড়ম্বর সেখানে থাকে সত্য, কিন্তু প্রাণ কই! আজ আমরা সাক্ষাৎ বিশ্বজননীর আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই কৃপাপূর্ণ নির্দেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতেছি, ইহাই বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার।

দেবীর নব-পত্রিকা স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া পূজার ও ভোগের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। পূজার

ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তদের বসিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত কোন বিষয়েই মায়ের দৃষ্টি এড়ায় না।

মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা সমবেতভাবে চণ্ডী ও গীতা পাঠ করিতে লাগিল। ভিতরে পূজা চলিতেছে। মা-ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন।

গত প্রতিপদ হইতেই দেবীভাগবত ও রামায়ণ-পাঠ নিয়মিতভাবে হইতেছে। নবরাত্রির মধ্যে এই দুইটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাঠ করা হইবে।

সপ্তমী-বিহিত পূজা, অঞ্জলি ও মধ্যাহ্ন-ভোগ মা'র উপস্থিতিতে বেশ সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হইল। সান্ধ্য আরতি ও কীর্ত্তনের সময় বহু দর্শনার্থীর ভীড় লাগিয়া গেল। কাশী হেন স্থানে, গঙ্গাতটে, মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমের এই শারদীয়া পূজায় যে নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দের আগমন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি!

১লা অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ মহাষ্টমী। যথাবিধানে উষাকীর্তন, মঙ্গল-আরতি, দেবীর স্নান-পূজা-ভোগ ও আরতি সম্পন্ন হইল।

পূজার মধ্যেই মা একবার চৌখাম্বায় পটলদের বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন। প্রতি বৎসরই সেখানে পূজা হয়। মাকেও ইতিপূর্বে বহুবার তাহারা সেখানে লইয়া গিয়াছে।

পটলদের বাড়ী হইতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপীঠের বারান্দায় কুমারী পূজার এক বিরাট্ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পনেরটি কুমারী ও এক বটুকের পূজা হইল। গতকালও দুইটি কুমারীর পূজা হইয়াছে।

ইহার পর ২৮০টা হইতে ৩॥০টার ভিতরে মায়ের সম্মুখে দেবীর সন্ধি-পূজাও সম্পন্ন হইল।

শহরের ভক্তবৃন্দের অধিকাংশই আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন। মা নিজ হস্তে একটি তরকারী পরিবেশন করিলেন। কয়েকজন সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া মা'র হাত হইতে অন্ন-প্রসাদও গ্রহণ করিল। মহাষ্টমীর দিন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার হাতে প্রসাদ পাইয়া সকলেই আপন আপন ভাগ্যকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

২রা অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ নবমী পূজা। মঙ্গল আরতি, মহাস্নান প্রভৃতি যথানিয়মেই হইয়া গেল।

৩রা অক্টোবর ১৯৫৭।

দশমী-বিহিত পূজান্তে সকাল ৯টার মধ্যে দেবীর বিসর্জন হইয়া গেল। বিকালবেলা সকলে মিলিয়া নৌকা করিয়া লইয়া গিয়া প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে মা অন্নপূর্ণার নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইল। মা'র নির্দেশমত আমি সকলকে মিষ্টি বিতরণ করিলাম।

মৌনের পরে মা লাইব্রেরীর বারান্দায় গিয়া বসিলেন। মা পূর্বেই নারায়ণস্বামিজীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—"তুমি মিষ্টি আনাইয়া রাখিও।

আমি আমার বন্ধুদের ও মায়েদের হাতে দিব।" সংবাদ পাইয়া পাড়ার যত দরিদ্র বালক ও বালিকা এবং স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পূর্ব হইতেই একত্রিত হইয়াছে। মা গিয়া একে একে সকলের হাতে রসগোল্লা বিতরণ করিলেন।

মা যখন মিষ্টি দিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ও মা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিও মা'র হাত হইতে মিষ্টি গ্রহণ করিয়া, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাহা সেখানে দাঁড়াইয়াই গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্যই হইলাম। কারণ, কবিরাজ মহাশয় সাধারণতঃ এইভাবে যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া কিছু আহার করেন না এবং মা-ও এইভাবে তাঁহাকে কিছু দেন না।

কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আজই মা'র কথা হইতেছিল। মা বলিতে-ছিলেন,—"প্রতিমা যখন গড়া হচ্ছিল তখন একদিন এই শরীরটা হরিভবনের (লাইব্রেরী বিল্ডিংটির নাম হরিভবন। শ্রীশ্রীহরিবাবা আসিয়া এখানে প্রথমে অবস্থান করিয়াছিলেন) তিন তলায় শুয়ে আছে। দেখছে কি উত্তর দিকের দরজা দিয়ে একটি দেবীমূর্তি ঘরে প্রবেশ করল এবং তার পেছনে পেছনে আরও বহু দেবীমূর্তি। প্রথমে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-বত্রিশের মতন। মুখের গড়ন খানিকটা বাচ্চুর মা'র মুখের গড়নের মতন। তবে নীচের দিকটা বেশ ভরা ভরা। দেবীমূর্তিরা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে যে, এইবারকার পূজা ত প্রতি বৎসর হবে না, তাই এইবারের জন্যই যেন আসা।"

মা আরও বলিলেন,—"গত বছরই বাচ্চুর মা'র আশ্রমে পূজা করবার সঙ্কল্প জেগেছিল। কিন্তু বিনয়বাবু আগের থেকেই ঠিক করে ফেলেছিল বলে সেবার আর হতে পারেনি। সবই ত কল্পনা। পূজা করবার কল্পনা তার হয়েছিল কিনা, তাই তার কল্পনা অনুসারে দেবীর মুখের ভাবটাও যেন কতকটা তারই মুখের মত। কি সুন্দর!"

৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ বাইরের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বিদায় লইয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। পুনা হইতে পাঞ্জাবী ভক্ত শ্রীযুক্ত ওমপ্রকাশ নন্দা আসিয়াছেন। তাঁহার নিজ মুখ হইতে আজ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শুনিলাম। দক্ষিণ-যাত্রার পরে মা যখন পুনাতে গিয়া এক ধর্মশালাতে একটি রাত্রি ছিলেন, সেইখানেই তিনি মাকে প্রথম দর্শন করেন। মাকে তিনি তাঁহার বাড়ীতে একবার পদধূলি দিবার জন্য প্রার্থনা করাতে মা সম্মত হইয়াছিলেন এবং শেষরাত্রি ৩॥০টায় তাঁহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হ'ন।

ভক্তবৎসলা মা।

মা যে তাহার মত অধমের গৃহে যাইবেন ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মা যদিও গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরঘরমে তো বহুৎ দেব-দেবীকা মূর্তি আউর ফটো হ্যয়।"

মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুরঘর তাঁহার গৃহের কত ভিতরে, মা তাহা কিভাবে দেখিলেন! তাই মা যে স্বয়ংই কৃপা করিয়া তাঁহার পূজার ঘরে সূক্ষ্মে গিয়া সমস্ত-কিছু পবিত্র করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, সে-বিষয়ে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

মা'র জয়ন্তী উৎসবের পূর্বের ঘটনা,—একদিন পূজা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল,—"শিব ত আমার ইষ্ট, কিন্তু শিব কি শক্তি ছাড়া?" তাঁহাকে গিয়া কেহ যেন বলিল,—"তুই শক্তির পূজা ত করিস্ না?"

পরদিনই তিনি মনের প্রেরণায় মা'র সেবার জন্য ৫০০৲ টাকা কাশীর ঠিকানায় পাঠাইলেন। আশ্চর্য, হঠাৎ এইভাবে পুনা হইতে কে একজন এত টাকা পাঠাইয়াছেন, আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ত টাকার সঙ্গে নিজের পরিচয়ও কিছু দেন নাই। এই কথাটা মাকে বলিলে মা অবশ্য

আমাকে বলিয়াছিলেন,—"দিদি, ঐ যে দক্ষিণ-যাত্রার সময় একবার দেখা হয়েছিল, সে না ত? তাঁকে চিঠি দিয়ে দেখ।"

এই ঘটনার কথা আমার মুখে শুনিয়া নন্দা সাহেবের আরও স্থির বিশ্বাস হইল যে শক্তিরূপিণী মা তাঁহার দীন পূজা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

মা কী কৃপাস্পর্শ মে পত্থর ভী সোনা বন যাতা হয়।

নন্দাজী বেশ বলিতেছিলেন,—"যিন্‌কি কৃপা স্পর্শমে পত্থর ভী সোনা বন্ যাতা হয়, উস্‌সে মেরা পরিবর্তন হোগা ইস্‌মে আশ্চর্য কী বাত ক্যা হয়!"

এখানে পূজার কয়দিন তিনি নিত্য ৩টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া মঙ্গল আরতিতে যোগ দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, শয্যা ত্যাগ করিবার সময় তিনি প্রতিদিনই শুনিয়াছেন আশ্রমের কোথাও বেশ সুন্দরভাবে নাম-কীর্তন চলিতেছে। কী মধুর সেই নাম! এখনো যেন তাঁহার কানে তাহা লাগিয়া আছে। কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে কোথাও কীর্তনের আওয়াজ নাই। সবে-মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ শৌচ-আদিতে যাইতেছে। সত্য সত্যই ভোর ৩টার সময় আশ্রমের কোথাও কীর্তন হয় না। কন্যাপীঠের মেয়েদের উষাকীর্তন হয় ৪টার পরে।

৺বিজয়া-দশমী দিনের আর একটি ঘটনা। সকালবেলা বিসর্জনের পূজা হইতেছে। বাটুদার মুখের বিসর্জনের মন্ত্র চতুর্দিক্ ধ্বনিত করিতেছে।

আরও একটি বিচিত্র ঘটনা।

মা-ও পূজামণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইয়া আছেন, বাহিরে নন্দাজী। হঠাৎ একটি তীব্র আলোর ঝলক তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন একেবারে ঝলসাইয়া দিয়া গেল। অপূর্ব সে জ্যোতিঃ। তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে মাকে ঐ কথা জানাইলে মা তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন,—"দেবীরই ঐ জ্যোতিঃ। বিসর্জনের পূর্বক্ষণের একটু প্রকাশ।"

৭ই অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ একজন অপরিচিত ভদ্রলোক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। নাম শ্রীনিগমকুমার চক্রবর্তী। পূর্বে তিনি আসামে থাকিতেন, বর্তমানে বিহারে বাস করিতেছেন। তিনি আজকাল পাটনায় সব্-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

পূজার সময়ে পাটনাতেই তিনি মার ভক্ত শ্রীশম্ভু চৌধুরীর (অধ্যাপক) সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মা'র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। শম্ভুবাবুর কথামতই তিনি মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন।

একটি সুন্দর স্বপ্ন।

মা'র নিকট তিনি বেশ সুন্দর একটি স্বপ্নের বর্ণনা করিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার একজন বন্ধু কাশীতে গঙ্গার উপরেই কোনও একটি বাড়ীর ছাদে বসিয়া আছেন। বাড়ীটির সম্মুখের অংশটি যেন একেবারে গঙ্গার মধ্যে। উঠানে ফুলের গাছ ইত্যাদি অনেক আছে। এক কোণে একটি বেলগাছ। একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক অনেক মেয়েদের লইয়া সেই ছাদের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন। হঠাৎ সেই স্ত্রীমূর্তি তাঁহার কাপড়ের আঁচল নিজের কোমরে জড়াইয়া যেন এক লাফে দালানের একটি কার্নিশের ওপর উঠিয়া, বেলগাছ হইতে বেলপাতা ছিঁড়িয়া সেই ভদ্রলোকের আঁচলে দিতেছেন। ভদ্রলোক সেই স্ত্রীমূর্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সব বেলপাতা দিয়া কি হইবে? সেই স্ত্রীমূর্তি তখন তাঁহাকে গম্ভীরভাবে বলিতেছিলেন,—"তোমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। তখন দেখা যাইবে যাহা হয়।"

নিগমবাবু বলিতেছেন যে, আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলেন যে স্বপ্নে যেরূপ বাড়ী-ঘর, উঠান, বাগান সব দেখিয়া-ছিলেন, এখানেও ঠিক ঠিক সেইরূপই। সমস্ত-কিছুই যেন হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। শুধু বেলগাছটি এবং বিরাট্ ছাদ না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য

হইলেন। মাকেও দেখিয়া তিনি দেখিলেন স্বপ্নদৃষ্ট এই সেই স্ত্রীমূর্তি। অদ্ভুত চেহারার সাদৃশ্য। শুধু বয়সটি যেন এখন কিছু বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে।

তাঁহার মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে বলিলাম, —"স্বপ্নে যা যা দেখেছেন, কিছুই বাদ যায় নাই। বেলগাছ এবং ছাদও ছিল। বেলগাছটি ঠিক যেখানে দেখেছিলেন সেইখানেই ছিল, অল্প কিছুদিন হয় হঠাৎ মরে গেছে। আর ছাদও ঠিক ঠিক সেইরকমই ছিল। ঐটিও অল্প কিছুদিন হয় ঘাটের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।"

আমাদের এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক আরও বিস্মিত হইলেন। সেই স্ত্রীমূর্তির কথা—"আবার দেখা হবে"—তাঁহার কানে বাজিতেছিল। সত্য সত্যই ঠিক ঠিক আবার সেই রূপেই, সেই স্থানেই, সেই পরিস্থিতিতেই মা'র দর্শন হইল।

বেলপাতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে মা'র কি কথা হইল তাহা আমরা আর জানিবার সুযোগ পাইলাম না। মা নিশ্চয়ই সে-বিষয়েও তাঁহাকে অনেক কিছুই বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার সঙ্গে মা'র অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা হইয়াছিল।

মা'র কথামত তিনি আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইলেন। মাকে দর্শন করিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন। বার বার বলিতেছিলেন,—"মাকে খুব ভালো লেগেছে, এত আপন বলে বোধ হচ্ছে।"

৮ই অক্টোবর ১৯৫৭।

আমার বড়দিদির আগ্রহে আজ আশ্রমে ৺লক্ষ্মীপূজারও আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী-মণ্ডপে পূজা আরম্ভ হইল। মা শেষ পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন। রাত্রিতে বহু ভক্ত মায়ের সম্মুখে প্রসাদ পাইলেন।

আশ্রমে বড়দিদির ৺লক্ষ্মী-পূজা।

গভীর রাত্রিতে লোকজনের ভীড় কমিয়া গেলে পুনার নন্দাজী ও তাঁহার স্ত্রীর বিশেষ প্রার্থনায় মাকে জয়ন্তী উৎসবের সময় নির্মিত অষ্ট-ধাতুর বিশাল সিংহের (আসন) উপর একবার বসান হইল। নন্দাজী ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া মা'র এই সিংহবাহিনী রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। আরও অনেকেই এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

১৭ই অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ কয়েকদিন হইতেই আমার কোমরে আবার খুব বেদনা চলিতেছে। আজকাল বেশীর ভাগ সময় শুইয়াই থাকি। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যথাও যেন বাড়িয়া চলিল। মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের উপরের ঘরে শুইয়া আছেন। মা'র শরীরটাও ভালো না বলিয়া মাকে সংবাদ দিতে নিষেধ করিলাম। আমার নিকটে দুর্গা (জিতেনদাদার স্ত্রী) অরুণা ও সতী ছিল। কি কারণে হঠাৎ বুনি ঘরে আসায় দুর্গা তাহাকে ইসারায় জানাইল মাকে আমার বিষয়ে সংবাদ দিতে।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা।

বুনি গিয়া তাড়াতাড়ি মাকে আমার শরীরের কথা জানাইল। মা-ও সংবাদ পাইয়াই নামিয়া আসিলেন। আমার ঘরে ঢুকিয়া মা প্রথমে ঘরের জিনিস-পত্র এদিক্-ওদিক্ করাইয়া আমার চৌকিটিও সরাইলেন। এই সব ব্যবস্থা করাইয়া বিছানার নিকটেই চেয়ারের উপর বসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি, এখন তোমার ব্যথাটা নিশ্চয়ই কমেছে।"

মা কথাটা এমনভাবে বলিলেন যে আমি শুধু মা'র দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলিবার মত যেন কিছুই ছিল না। তবে অনুভব করিলাম যে মা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথার তীব্রতাটা যেন কমিয়া আসিল।

ডাক্তার গোপালদাদাকে পূর্বেই ফোনে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও আসিয়া পৌঁছিলেন। একটি ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার জন্য তিনি একজন ডাক্তারও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ডাক্তারবাবু হঠাৎ মাকে বলিলেন,—"মাগো, দিদির ব্যথার জায়গাটায় একটু হাত দিয়া দেখ না।"

ডাক্তারবাবুর কথামত মা আমার জামাটা আস্তে তুলিয়া বেদনার স্থানটি আঙ্গুল দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ বাবা, কি যেন একটা ফট্ করে সরে গেল।"

মা'র কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল। মা'র সবই অলৌকিক। নতুবা ব্যথার স্থান হইতে আবার কি সরিয়া যাইবে। একটু পরেই ডাক্তারবাবুকে মা বলিলেন,—"বাবা, ব্যথাটা ত কমেছে। এখনো কি তোমাদের ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার দরকার।"

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন,—"মা, ইন্‌জেক্‌সন দেওয়াতে কোনও ক্ষতি নাই। বরং ভালই হবে।"

ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইলে মা আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৮ই অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ সকালে উঠিয়া দেখি ব্যথার নাম-গন্ধও নাই। কিভাবে যে ব্যথাটা কমিয়া গেল তাহা যেন বুঝিতেও পারিলাম না। ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইয়াছিল সত্য। কিন্তু তাহার অনেক আগেই ব্যথাটা কম হইতেছিল। মা ঘরে আসিয়া শুধু জিনিসপত্র একটু নাড়াচাড়া করিতেছিলেন মাত্র। উহার ভিতরেই যে কী রহস্য লুকান ছিল কে বলিবে? পরে ডাক্তারবাবুর

অনুরোধেই আমার ব্যথার স্থানে হাতখানি দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি যেন একটা সরে গেল।"

মা'র এইসব সূক্ষ্ম ব্যাপার আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার অসাধ্য যে এ জগতে কিছুই নাই। সামান্য স্পর্শে তীব্রতম রোগ-যন্ত্রণা নিরাময় হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জীব-বুদ্ধি এমনই যে অজ্ঞানের অন্ধকার কিছুতেই দূর হইতেছে না। তাঁহাকে কোথায় আমরা চিনিতে পারিতেছি!

২১শে অক্টোবর ১৯৫৭।

আশ্রমে শ্যামাপূজা।

আগামী কাল আশ্রমে শ্যামাপূজার আয়োজন হইতেছে। আজই দুপুর-বেলা মা বিশ্রাম করিতে করিতে হঠাৎ নারায়ণস্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কালীমূর্তিখানা আজই বসাইয়া রাখ।"

মা'র নির্দেশমত সন্ধ্যার সময় কালীমূর্তি মণ্ডপের বেদীর উপর স্থাপিত হইল। যথাবিধি আরতিও করা হইল।

২২শে অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ ৺শ্যামাপূজা। ৺পূজার সাজ, নৈবেদ্যাদি, ভোগ প্রভৃতি সমস্তই মা'র উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে হইল। রাত্রি ১০টার পরে পূজা আরম্ভ হইল। পূজার শেষ পর্যন্ত মা বসিয়া রহিলেন এবং প্রতিটি কাজ যাহাতে নিখুঁত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও পূজার সময় আসিয়া দেবীর নিকটে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

পূজা, ভোগ ও আরতি সমাপ্ত হইতে রাত্রি প্রায় ১॥০টা বাজিয়া গেল। সকলে মহানন্দে তাহার পর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আগামীকাল অন্নকূট। তাহার ব্যবস্থা আজ রাত্রি হইতেই আরম্ভ হইল। মা-ও আর বিশ্রাম করিতে গেলেন না। নিজে এঘর-ওঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

২৩শে অক্টোবর ১৯৫৭।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্নকূট ভোগ পাক আরম্ভ হইল। বেলা ১টার পূর্বেই ভোগ-নিবেদন ও আরতি হইয়া গেল। ফল, মিষ্টি ও ভোগের অন্যান্য জিনিস সব লইয়া প্রায় ১৫৬ পদ হইয়া গেল। এই সমস্ত পদ থালায় থালায় সাজাইয়া ভোগের আয়োজন করা সেও এক অপূর্ব দৃশ্য।

প্রায় পাঁচ শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা আশ্রমে অন্নকূটের প্রসাদ পাইল। মা'র স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে আজিকার দিনে কেহ যেন প্রসাদ হইতে বঞ্চিত না হয়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে বিমুখ হইয়া যাইবার যে কোন অবকাশই নাই। প্রসাদ-গ্রহণের সময় মা নিজ হস্তে সকলকে কিছু কিছু প্রসাদ বিতরণ করিলেন। আজ অন্নকূটের দিনে মা'র হস্তে প্রসাদ পাইয়া সকলেই যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

আশ্রমে অন্নকূট
—বিরাট্ উৎসব।

সন্ধ্যার পর সমস্ত কার্য সমাধা হইয়া গেলে মা একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। গতকাল সন্ধ্যা হইতেই মা'র আর বিশ্রামের সুযোগ হয় নাই। এইরূপ অসুস্থ শরীর লইয়া যে কিভাবে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখাশোনা করিলেন তাহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনভাবেই ইহা সম্ভব না।

আবার মায়ের সাক্ষাৎ উপস্থিতি বিনা এইভাবে সকল কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া সম্ভব হইত না। মা নিজে পূর্ণা। তাই মা'র সকল কাজই নিখুঁত এবং পূর্ণ হইয়া ওঠে। মা'র অসীম কৃপাতে আজ আমরা এইরূপ শিক্ষা-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি। এইরূপ সুযোগ লাভ সত্যই দুর্লভ!

২৪শে অক্টোবর ১৯৫৭।

কাশীতে প্রায় দুই মাসকাল থাকিবার পর, আজ মা'র বিন্ধ্যাচল যাইবার কথা হইয়াছে। এত দীর্ঘ সময় মা এখানে শীঘ্র আর থাকেন নাই। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও আশ্রমবাসী ছেলে-মেয়েরা এবার মাকে লইয়া আনন্দ করিবার খুবই সুযোগ পাইয়াছে।

বিকাল প্রায় ৩টার সময় মা মোটরে রওনা হইয়া গেলেন। বাহির হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মা'র সঙ্গে চলিলেন। সর্বসমেত প্রায় ৫০।৫২জন মা'র সঙ্গে চলিল। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল না, তাই মা আমাকে এখানেই বিশ্রাম করিতে বলিয়া গেলেন।

২৭শে অক্টোবর ১৯৫৭।

বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় নিত্যই মা'র সংবাদ পাইতেছি। কেহ না কেহ প্রায় রোজই আসা-যাওয়া করিতেছে। সংবাদ পাইলাম মা'র শরীর অনেক ভাল আছে। বিন্ধ্যাচলে বেশী সময় বিশ্রাম করিবার সুযোগ হইতেছে।

আজ রাত্রিতে জ্যোতির্ময়দাদা (শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের গুরুভ্রাতা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর শিষ্য) আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আগামী কাল তিনিও বিন্ধ্যাচল যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার মুখে একটি বেশ সুন্দর ঘটনা শুনিলাম।

একটি সুন্দর ঘটনা।

এবার নবমীপূজার দিন তাঁহাদের সপরিবারে এখানে প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজে এবং বাড়ীর প্রায় সকলেই অসুস্থ থাকায় তাঁহারা কেহই আসিতে পারেন নাই। মা তাঁহাকে আশ্রম হইতে একটু প্রসাদ পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই প্রসাদ সামান্য একটু গ্রহণ করা-মাত্রই তাঁহার সমস্ত রোগ দূর হইয়া গেল। ঐ প্রসাদ সকলেই একটু একটু গ্রহণ করিলে তাহারাও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া গেল। জ্যোতির্ময়দাদা বলিলেন যে ঐরূপ সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত প্রসাদ তাঁহারা জীবনে আর কখনো পান নাই।

৩১শে অক্টোবর ১৯৫৭।

আজ বেলা প্রায় ১০টায় মা হঠাৎ বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, Executive Officer, Lucknow Municipal Board মাকে নিয়া আসিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন হয় মা'র নিকট বিন্ধ্যাচলে আছেন। মাকে এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া আশ্রমবাসী সকলেরই মহানন্দ। এইরূপ হঠাৎ আসিবার কারণ মা বিন্ধ্যাচলে বা এখানে কাহাকেও বলেন নাই। এখন মা'র নিকট ধীরে ধীরে তাহা শুনিতে পাইলাম।

গতকাল বিন্ধ্যাচলে শুইয়া শুইয়া মা দেখিতেছিলেন, লীলা হইতেছে। সেখানে হরিবাবাজী প্রভৃতি আরও অনেকে এবং মা-ও বসিয়া আছেন।

একটু পরে মা অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবটি যেন লীলা ত আরও কতই দেখা হইয়াছে—এইরূপ। এমন সময় হরিবাবা আসিয়া মাকে বলিলেন,—"দিদি ত গৈল।" তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আদরের সুরে যেন বলিলেন,—"যা—ও।"

করুণাময়ী মায়ের আমার প্রতি কি অপার করুণা।

মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গৈল কি?"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এই যেমন কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না সেইরকমটা আর কি?"

ইহা বলিয়াই বলিতেছেন,—"এই কথা ওখানে আর কাউকে না বলে তোর কাছে এসে বলব এই খেয়ালটা ছিল, তাই বলা হ'ল।"

মা আরও বলিলেন,—"কোনও বার ত এই শরীরের মুহূর্ত দেখে আসা হয় না। এবার মুহূর্ত দেখে আসা হয়েছে।"

মা'র কথা শুনিতে শুনিতে আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলাম, করুণাময়ী মা'র কত করুণা! তিনি দয়া করিয়া আমাকেই দর্শন দিতে সেই বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন। গতকাল রাত্রিতে আমার শরীরটা খুবই খারাপ লাগিতেছিল। আমার অবস্থা দেখিয়া মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়া গিয়াছিল। আমি বমি করিতে করিতে একেবারে হয়রান হইয়া পড়িতেছিলাম। মনে মনে বলিতেছিলাম,—"মা, আর ত সহ্য হয় না।"

দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থতার ফলে সহ্যশক্তি যেন কমিয়া গিয়াছে। রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝিবার শক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাই মনে মনে মা'র শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছিলাম। আমার সেই কাতর আবেদন তৎক্ষণাৎ মা'র নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। মা-ও আমার অসুস্থতার বিবরণ শুনিয়া বলিতেছিলেন,—"হ্যাঁ, দেখছিলাম যে তুই বমি করতে করতে একে-

বারে অবশের মত হয়ে পড়েছিস্।" মা'র এই অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আমার কেবলই একটি গানের কয়েকটি পদ মনে আসিতে লাগিল,

"অযোগ্য অধম বলে তো মোরে
কম করে কিছু দাও নি।
যা দিয়াছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কাড়িয়াও কিছু নাও নি॥
তোমার আশিস্ ধরি নাই শিরে,
পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবুও তো তুমি কেবলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাও নি॥"

মা'র অহেতুকী কৃপার নিদর্শন প্রতি পদে পদে কতই পাইতেছি; কিন্তু তবুও আমাদের অবুঝ মন কি সর্বদা বুঝিতে সক্ষম হয়। মা-ই নিজে যদি কৃপা করিয়া আমাদের তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি দেন তবেই তাহা সম্ভব।

মা খাওয়ার পরে আবার বেলা প্রায় ২৷৷৹টায় বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া গেলেন।

ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম পি. এইচ. ডি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কিছুদিন যাবৎ পায়ে চোট পাইয়া আশ্রমেই আছেন। কলিকাতা হইতে মায়ের নিকট কয়েকদিন থাকিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিলেন। মাতাজী এখানে আসিয়াই তাঁহাকে invalid chair-এ বসাইয়া উপরতলার একটি ঘরে থাকিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলেন। মা'র সকল বিষয়েই প্রখর দৃষ্টি।

৫ই নভেম্বর ১৯৫৭।

সকালবেলা বিন্ধ্যাচল হইতে পাল সাহেব তাঁহার মোটর লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মা আমাকে বিন্ধ্যাচল যাইতে আদেশ দিয়াছেন। কয়েকদিন

যাবৎ শরীরটা খুবই খারাপ লাগিতেছিল। তাই মা বোধ হয় একটু স্থান-পরিবর্তন করাইলেন।

বেলা প্রায় ৫॥০টায় আমি বিন্ধ্যাচল আসিয়া পৌঁছিলাম। শুনিলাম মা'র শরীরটাও খুব ভালো না। তাই আজ আর বোধ হয় নীচে নামিবেন না। মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকেই চেয়ারে বসাইয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইল।

কিছুক্ষণ পরে মা নিজেই নামিয়া আসিলেন। আমার ঘরেই মৌন পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কথাবার্তাও হইতেছিল। মৌনের কিছু পরে উপরে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

৬ই নভেম্বর ১৯৫৭।

মা আজ একটু বেলাতে উঠিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। মা কৃপা করিয়া নিজেই নামিয়া আসিলেন। নতুবা আমার ত উপরে যাইবার শক্তি নাই। এক যদি চেয়ারে বসাইয়া সকলে ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া যায়।

কিছু সময় কথাবার্তার পরে খাইবার সময় হইলে মা উপরে চলিয়া গেলেন। রাত্রিতেও মা একবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

৭ই নভেম্বর ১৯৫৭।

বম্বে হইতে আজ ভোরে ভাইয়া (শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ, Managing Director, New India Assurance Co.) আসিয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ। আমাকে গ্রহণের সময় মা'র ঘরে লইয়া যাইবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু আমার ব্যথার জন্য আর উপরে যাইতে সাহস পাইলাম না।

কিন্তু মা'র খেয়াল সকল দিকেই পূর্ণভাবেই আছে। গ্রহণের সময় কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকলে গিয়া মা'র ঘরেই বসিয়াছে। মা তাড়াতাড়ি আমার ঘরে আসিয়া আমাকে একটি মালা দিয়া আবার ওপরে গিয়া বসিলেন।

রাত্রি প্রায় ১০টা পর্যন্ত মা'র সম্মুখে কীর্তন চলিল। গ্রহণ ছাড়িয়া গেলে, ভোগ রান্না হইলে, সকলে প্রসাদ পাইল।

১০ই নভেম্বর ১৯৫৭।

এখানে আসিয়া মা'র যথাসম্ভব বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মা'র শরীরটা তাই পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল মনে হয়। মা নিজের খেয়ালমতই চলিতেছেন এবং খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন।

১১ই নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ সন্ধ্যার সময় মির্জাপুর হইতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করিলেন যে সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকিলে সাধন-ভজন করিবার সময় কোথা হইতে পাওয়া যায়?

মা বলিলেন,—"আসল সরকারের 'নৌকর'. হও। সেই মূল সরকার থেকেই ত এই সরকার। যেমন মন দিয়া সরকারী কাজ নিয়মিতভাবে কর, সেইরকম এই সরকারের দিকেও একটি চিন্তাধারা রাখা উচিত। সেবা-বুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। লক্ষ্য থাকে তিনিই। তবে সেই সেবা-বুদ্ধিতে স্থিত থাকার জন্য (যেমন তোমরা ঘড়িতে দিনে একবার

আসল সরকারের নওকর হও।

করে দম দেও না ?) সকাল-সন্ধ্যায় একবার করে দম দিবার চেষ্টা করা। মানে একটু সময় স্থিরভাবে বসে তাঁর ধ্যান ও জপ করা।"

মা'র মুখে এই সব কথা শুনিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

১২ই নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ সকালেই একজন ফরাসী ভদ্রলোক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। শুনিলাম আনন্দপ্রিয়া বহিনজী (রাজমাতা কমলেন্দু শাহ, টেহরী গাড়ওয়াল) তাঁহাকে মা'র নিকট পাঠাইয়াছেন। ভদ্রলোকের নাম জিয়ঁ ক্রিশ্চিয়াঁ।

মা'র দর্শনার্থী কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী।

আত্মানন্দ (বর্তমানে আমাদেরই আশ্রমবাসী এক অষ্ট্রীয়ান মহিলা, মিস্ ব্লাঙ্কা শ্লাম্) তাঁহাকে মা'র ঘরে লইয়া আসিল। আত্মানন্দের মাধ্যমে মা'র সঙ্গে তাঁহার অনেকক্ষণ যাবৎ পারমার্থিক কথাবার্তা হইল। মা'র দর্শন ও উপদেশে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম।

১৪ই নভেম্বর ১৯৫৭।

আগামী কাল মা'র বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী ফিরিবার কথা হইয়াছে।

তিন-চারদিন হয় কাশী হইতে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং অমূল্যদাদা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত) মা'র কাছে আসিয়াছেন! তাঁহারাও মা'র সঙ্গেই ফিরিবেন। মা'র দর্শনের জন্য একজন অ্যামেরিকান ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন। নাম শ্রীমতী জেনিকার জোন্স্। শুনিলাম, পৃথিবীর একজন

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। মা'র নাম শুনিয়াই ইনি কাশীতে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে সংবাদ পাইয়া বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন। তিনি নাকি ভারতে যোগাভ্যাস করিতে আসিয়াছেন। স্বভাবটী বেশ মধুর।

তিনি কথায় কথায় মাকে বলিলেন, ভারতবর্ষ যেন তাঁহার কত পরিচিত বলিয়া মনে হয়। ভারতের সব কিছু যেন কত আপন, কত প্রিয়। ভদ্রমহিলা মাকে দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়াছেন। বারবারই বলিতে লাগিলেন যে এতদিনে তাঁহার ভারতে আসা সার্থক হইল। সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহাকে আমেরিকা ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে আবার কিভাবে মা'র সঙ্গে দেখা হইবে জানিতে চাহিলেন।

১৫ই নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা প্রায় ১॥০টায় আমরা বিন্ধ্যাচল হইতে রওনা হইলাম। পাল সাহেবের গাড়ীতে মা, কবিরাজ মহাশয়, অমূল্যদাদা প্রভৃতি গেলেন। অপর একটি গাড়ীতে আমি মেয়েদের লইয়া চলিলাম। বিন্ধ্যাচল আশ্রমে উপস্থিত শাশ্বতানন্দ স্বামী, কুসুম ব্রহ্মচারী, উদাস প্রভৃতি কয়েকজনকে মা রাখিয়া গেলেন।

বেলা প্রায় ৪টায় মাকে লইয়া আমরা কাশী আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। কাশীতে আবার আনন্দের হাট বসিল।

১৭ই নভেম্বর ১৯৫৭।

আগামী ২২শে হইতে দিল্লী আশ্রমে সংযম মহাব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কথা। এবার আগা সাহেবের আগ্রহেই (শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর নাথ

আগা আই. পি. এস্., উত্তর রেলওয়ের Chief Security Officer) দিল্লীতে সপ্তাহ হইতেছে।

দিল্লী আশ্রম অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিন্তু এবার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমটিকে সম্পূর্ণ করিবার প্রয়োজনবোধে পরমানন্দস্বামী আজ প্রায় আড়াই মাস যাবৎ সেখানেই আছেন। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং স্থানীয় ভক্তদের সহায়তায় আশ্রমের মধ্যস্থিত বিরাট্ হলঘর এবং আরও কিছু কিছু নূতন কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আশ্রমে বিজলী বাতিও আসিতেছে।

সংযম-সপ্তাহে যোগদান উপলক্ষে আজ আশ্রম হইতে মা অনেককেই দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। মা'র আগামী পরশু রওনা হইবার কথা। আমি উপস্থিত কাশীতেই থাকিব।

১৯শে নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ দিল্লী একস্প্রেসে মা রওনা হইলেন। বেলা প্রায় ১২টায় মা মোটরে করিয়া মোগলসরাই আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মার' সঙ্গে ব্রহ্মচারী ভরত, সস্ত্রীক ভুবনদা, বুনি, সতী প্রভৃতি কয়েকজন গেল।

২০শে নভেম্বর ১৯৫৭।

তার পাইলাম মা আজ প্রাতে ভালমত দিল্লী পৌঁছিয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ বুনির চিঠি পাইলাম। মা'র গাড়ী সেদিন সামান্য লেট ছিল। মাকে স্বাগত করিবার জন্য স্টেশনে আগা সাহেব সস্ত্রীক, টিহরীর মহারাজা লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র শাহ এবং মহারানী সুরযকুমারী, নারায়ণদাসজী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আগা সাহেব নিজে মোটর চালাইয়া মাকে আশ্রমে লইয়া গিয়াছেন। আশ্রমের পথে মা আদিত্য নারায়ণজীর বাসায় গিয়া শ্রীশ্রীহরিবাবার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছেন।

দিল্লীর আশ্রমে সংযম-সপ্তাহ মহাব্রত।

শ্রীহরিবাবা কয়েকদিন পূর্ব হইতেই দিল্লীতে আছেন। তবে মা আসিবার পূর্বে তিনি দিল্লীতে তাঁহার ভক্ত আদিত্য নারায়ণজীর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন।

নূতন আশ্রমটি নাকি খুবই সুন্দর হইয়াছে। এত অল্পদিনের মধ্যে যে কিভাবে এইরূপ আয়োজন সম্ভব হইয়াছে তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেছেন। হলঘরটি নাকি খুবই সুন্দর হইয়াছে। প্রায় পাঁচশতাধিক লোকের বসিবার যোগ্য হইয়াছে। একটি নূতন ঘরও নির্মিত হইয়াছে। আশ্রমের চারদিকে পাকা দেয়াল দিয়া বাগান করা হইয়াছে। চন্দ্রলোকের বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আশ্রমটি নাকি দূর হইতে এখন একটি ছবির মত দেখায়।

আশ্রম-নির্মাণের কার্যে স্বামী পরমানন্দকে সর্বাপেক্ষা এবং সর্ববিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন নারায়ণদাস ভাই (Rai Bahadur Narain Das, Retd. Executive Engineer, Delhi)। তাঁহার এই অতুলিত সাহায্য এবং অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষণের জন্য, দিল্লীর সকল ভক্তবৃন্দই তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। অন্যান্য নানা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে বর্মা সাহেব (শ্রীযুক্ত প্রেমহরিলাল বর্মা, Member, Union Public Service Commission) যেভাবে

সাহায্য করিয়াছেন তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। এতদিনে দিল্লীর ভক্তদের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

২৪শে নভেম্বর ১৯৫৭।

দিল্লীর পত্রে আজ বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল।

গত ২১শে বিকালে মাকে দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ কন্‌ট্রাক্টর তীর্থরামজীর বাসায় নিয়া গিয়াছিল। তীর্থরামজী দিল্লীর আশ্রমের জন্যও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। মাকে তিনি ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নাই। মাকে তাঁহার বাসাতে খুবই সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় তীর্থরামজীর স্ত্রী পক্ষাঘাত-রোগে অচল। চেয়ারে করিয়া ভদ্রমহিলাকে মায়ের নিকট আনা হইয়াছিল। মা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া নাম করিতে বলিয়াছেন। মায়ের কৃপাতে ভদ্রমহিলা যদি একটু সুস্থ হ'ন, সকলেই মনে মনে এই প্রার্থনাই মায়ের চরণে জানাইয়াছেন।

ঐদিন সন্ধ্যাতেই শ্রীহরিবাবা তাঁহার সঙ্গীয় লোকদের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়াছেন। হরিবাবা আশ্রমের একটি ঘরে আছেন। তাঁহার সঙ্গীয় লোকদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত পরশু প্রাতঃকাল হইতে মায়ের উপস্থিতিতে সংযম মহাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। হল-ঘরটি নাকি খুব সুন্দর করিয়া ফুল, মালা, চিত্রাদির দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে।

হলের শেষপ্রান্তে মা ও মহাত্মাদের বসিবার জন্য উচ্চ আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত হলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী-পুরুষ ব্রতীদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। সৎসঙ্গের ব্যবস্থা মা'র নির্দেশমত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ব্রহ্মচারী কান্তিভাই-ই করিতেছে। কীর্তনাদির জন্য মা পুষ্পকে

দেরাদুন হইতে আনাইয়াছেন। মা'র কাছে ব্রহ্মচারী হরপ্রসাদও আছে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ এবার বিভু উৎসবে যোগদান করিতে পারিল না।

সপ্তাহে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে নানা স্থান হইতে প্রায় দুই শতাধিক ভক্তবৃন্দের আগমন হইয়াছে। ভারতের কোনও প্রান্ত হইতে বোধ হয় ভক্তবৃন্দ বাদ যায় নাই। মহাত্মাদের মধ্যেও অনেকেই আসিয়া যোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী ও বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত চক্রপাণিজী আশ্রমেই আছেন। তাহা ছাড়া, বাহির হইতে অন্ধ মহাত্মা শ্রীশরণানন্দজী এবং হৃষীকেশের শ্রীশুকদেবানন্দজী মহারাজ আসিয়া সৎসঙ্গে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিতেছেন।

রাজা-মহারাজাদের ভিতরেও অনেকেই আসিয়া সপ্তাহে ব্রতী হইয়াছেন।

মায়ের আকর্ষণে বহু রাজা-মহারাজাদেরও সংযমের কাঠিন্য বরণ।

সোলনের রাজা সাহেব, টিহরীর মহারাজা-মহারানী, মহীশূরের মহারানী, অম্বের রাজা সাহেব, কুচামনের রাজা প্রতাপ সিংহজী প্রভৃতির নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মণ্ডীর রাজাসাহেব মেজর স্যর যোগেন্দ্র সেন সপরিবারে আসিয়া আশ্রমের মধ্যে একটি তাঁবুতে রাত্রিবাস করিতেছেন।

এই সব রাজা-মহারাজাদের সংযম-ব্রতে যোগদানের দৃশ্য একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। তাঁহারা যখন তাঁহাদের স্বাভাবিক বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সাধারণ তিতিক্ষাপরায়ণ একজন ব্রতীর ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসন হাতে এই সপ্তাহে যোগদান করেন, তখন তাঁহাদের ঐ রূপ দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যান। অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি যে প্রাচীন ভারতের ইহাই ছিল আদর্শ। ঋষির ন্যায় রাজাদের আচরণ ও জীবন-যাত্রা সাধারণ গৃহস্থদের মনেও এক অপূর্ব উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। মায়ের চরণে আসিয়া কিভাবে তাঁহারা তাঁহাদের বিলাস ও ভোগের এবং দৈনন্দিন নেশার সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া সংযমিত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হ'ন, ইহা

সত্য সত্যই আমাদের পক্ষে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই এক সপ্তাহের সংযমিত জীবনের প্রভাব তাঁহাদের সকলের জীবনেই যে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। অনেকের জীবন-যাত্রার ধারা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কেন? ইহা যে সংযম সপ্তাহেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব তাহা মায়ের মুখ হইতেই অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে। সর্বসাধারণের মুখেও প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে এই সপ্তাহ বৎসরে একটি না হইয়া আরও অনেক বেশী হইলে অধিক আনন্দ ও লাভ হইবে। আশ্রমের এই অনুষ্ঠানের অনুকরণে আজকাল ভারতের অন্যত্রও কোথাও কোথাও এইরূপ সংযম সপ্তাহের প্রচলন দেখা যাইতেছে।

দিল্লীর পত্রে আরও সংবাদ পাইলাম যে ব্রতীদের থাকিবার ব্যবস্থা তাঁবুতে করা হইয়াছে। আশ্রমের জমির উপরে এবং বাহিরেও খোলা মাঠের ওপরে প্রায় ৭০টি তাঁবু পড়িয়াছে। দূর হইতে দেখিয়া সৈন্য-শিবির বলিয়া মনে হয়।

২৬শে নবেম্বর ১৯৫৭।

বুনির পত্রে জানিলাম যে মা'র শরীর মোটামুটি ভালই আছে, যদিও বিশ্রাম খুবই কম হইতেছে। সপ্তাহের প্রোগ্রাম নিয়মিতভাবেই চলিতেছে। মা-ও প্রায় সব সময়ই সেখানে থাকিতে চেষ্টা করেন।

গত ২৪শে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর জ্যেষ্ঠ্যা ভগিনী মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন। সেইদিনই মোরারজীভাই দেশাইও (বম্বের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী) মা'র সঙ্গে একান্তে অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। ইনি মা'র নিকট পূর্বেও আসিয়াছেন। এবার

যখন মা দিল্লী যান সেই সময় মোরারজী দেশাই-ও ঐ গাড়ীতে দিল্লী গিয়াছেন। মোগলসরাই স্টেশনে মা'র সঙ্গে তাঁর দেখা হইয়াছিল।

২৮শে নভেম্বর ১৯৫৭।

আজ দিল্লী হইতে মা'র সংবাদ পাইলাম। সৎসঙ্গে নিত্যই খুব ভীড় হইতেছে। মা'র সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলিবার লোকেরও অন্ত নাই। দিন-রাত নাকি প্রাইভেট কথা লাগিয়াই আছে।

গত ২৬শে সকালে মৌনের সময় মা নাকি কয়েকটি বিশেষ কিছু দেখিয়াছেন। পরে তাহা সৎসঙ্গের মধ্যেই মা হরিবাবা প্রভৃতিকে বলিয়াছেন।

মায়ের একটি সূক্ষ্ম দর্শন।

মা সূক্ষ্মে দেখিতেছিলেন, একজন সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া আসিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন। মুখের একটুখানি শুধু দেখা যাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই মা চিনিলেন। তিনি মহাবীরজী স্বয়ং। তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে বস্ত্র ভেদ করিয়াও যেন দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল।

আরও একজন অতি দীর্ঘকায় মহাপুরুষ, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, মাথায় কোঁকড়ান চুল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ একজন মধ্যবয়স্কা মহিলার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেছিলেন।

ইহা ছাড়া একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী কুমারী কন্যা মা'র সম্মুখে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল। তাহার সঙ্গে সমবয়স্কা আরও কয়েকটি কন্যা ছিল, এবং একটি অতি সুন্দর ছোট্ট বালক যেন মা'র দিকে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া খুব হাসিতেছিল।

এই সমস্ত কথা মা আস্তে আস্তে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই

মৌনের সময় (সংযমের মধ্যে) মা এইরূপ কিছু-না-কিছু দেখিয়া থাকেন। অনেক সময় মা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কখনো কখনো সব কথা জানাও যায় নাই। মোট কথা, মৌনের সময় মা'র উপস্থিতিতে সমবেতভাবে ধ্যান-জপের প্রভাব যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

২৯শে নভেম্বর ১৯৫৭।

আজও বুনির চিঠিতে মা'র সংবাদ পাইলাম। ভীড় নাকি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মা'র ত হাত-মুখ ধুইবার সময়ও নাই। অনেকদিন, সমস্ত দিন পরে রাত্রিবেলা মা'র মুখ ধোয়ান সম্ভব হয়।

সৎসঙ্গের মধ্যে রাত্রে যখন মাতৃসঙ্গের সময় নির্ধারিত আছে সেই সময় প্রশ্নের উত্তরে নাকি মা'র মুখ হইতে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বাহির হয় মায়ের নিজের জীবন-সাধনার খেলা সম্বন্ধেও মা অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল কথা লিখিয়া রাখিতে পারা গেল না তাহা আমারই দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব!

ইতিমধ্যে একদিন রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার ধর্মপত্নী মা'র নিকটে আসিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে দার্ঘ সময় আলাপ করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বদাই মা'র নিকট আসা-যাওয়া করিতেছেন।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫৭।

মায়ের উপস্থিতিতে গত পরশু বেশ সুন্দরভাবে সংযম সপ্তাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সপ্তাহ নাকি এবার খুবই ভাল হইয়াছে। সকলেই

বলিতেছে যে বম্বের পরে আর এত ভালভাবে সপ্তাহ অন্য কোথাও হয় নাই। সকলের জন্যই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও যথাসাধ্য সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কাহারও কোনই অসুবিধা ছিল না। প্রায় ৭৪টি ছোট-বড় তাঁবু লাগান হইয়াছে। দেখিতে অনেকটা প্রয়াগে কুম্ভ-মেলার মত।

আমি দেখিতে পারিলাম না সেজন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। মা-ও নাকি বলিয়াছেন,—"দিদিকে ছবি তুলে দেখান দরকার।" টিহরীর মহারাজকে দিয়া সমস্ত-কিছুর ফিল্মও তোলান হইয়াছে। সময়মত আমার নিকট পাঠান হইবে।

সপ্তাহের শেষ দিনই আশ্রমের হল-ঘরের নামকরণ হইয়াছে 'নাম-ব্রহ্ম মন্দির।" একখানি শ্বেত পাথরের উপর মহামন্ত্র লেখা হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিবাবা এবং অন্যান্য মহাত্মাদের হাত দিয়া সেই প্রস্তরলিপির আবরণ উন্মোচন করান হইয়াছে। মা'র ইচ্ছামত রবিবার দিন ঐখানে অখণ্ড মহামন্ত্র নাম-যজ্ঞ হইবার কথা হইয়াছে।

নাম-ব্রহ্ম মন্দির।

ঐদিনই ভারত-সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম সস্ত্রীক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মাকে এইবারই প্রথম দর্শন করিলেন। একান্তে মা'র সঙ্গে সাধন-ভজন বিষয়েও কথা কহিয়াছেন। জয়পুরের মহারানীও মা'র সঙ্গে কথা বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

শেষদিন রাত্রিতে মৌনের পরে মা সংযমিত জীবনের সঙ্গে ধ্যান-জপ করিলে এবং গুরুর আদেশ পালন করিলে কিভাবে আত্মপ্রকাশের সহায়তা করে সেই বিষয়ে অনেকক্ষণ অনেক কথা বলিয়াছেন। ব্রতী এবং উপস্থিত সকলকেই মা একখানা করিয়া গীতা ও রামচরিত-মানস নিজের হাতে দিয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর ১৯৫৭।

দিল্লী হইতে পানুর চিঠিতে আরও অনেক কথা জানিতে পারিলাম। মা'র শরীর এক্প্রকার ভালই আছে। তবে ঐরূপ শরীর লইয়াও মা যে কিভাবে ঐরূপ হৈ-চৈএর মধ্যে যোগ দিতেছেন, তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হয়। সপ্তাহের শেষদিন ত মা প্রায় সমস্ত রাত্রি ভক্তবৃন্দের মধ্যেই ছিলেন। রাত্রি ১॥০টার পরে, মহানিশার ধ্যান ইত্যাদির পরে মা ঘরে আসেন। তখন এক এক করিয়া প্রাইভেট সুরু হয়। রাত্রি প্রায় ৩টা পর্যন্ত মা প্রাইভেট করিয়াছেন। আবার ভোর ৪টা বাজিতে-না-বাজিতেই মা নিজেই উঠিয়া আসিয়া হলঘরে বসিয়া সুমধুর স্বরে নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হঠাৎ এত ভোরে মা'র গান শুনিতে পাইয়া ভক্তবৃন্দ সকলে ছুটিয়া আসিয়া নামে যোগদান করিলেন।

সেইদিনই সকালেই হলের মধ্যে গায়ত্রী যজ্ঞ হইয়াছে। তাহার পরে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা ছিল। ব্রতী এবং আগন্তুক সকলেই মহা পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

একদিন প্রায় সাত-আটজন মেম মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈদেশিক রাজদূতদের কয়েকজন পত্নীও ছিলেন। আত্মানন্দ তাঁহাদের সহিত মা'র কথাবার্তাতে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছে।

গত ২৯শে মাকে ও মহাত্মাদের কালকাজী কলোনীতে সৎসঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে বহু স্ত্রী-পুরুষ মা'র দর্শনলাভের জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। রাত্রে মা যখন মণ্ডীতে গিয়াছিলেন, তৎকালীন তোলা ফিল্ম উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মণ্ডির রাজাসাহেব দেখাইলেন। মা-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আজ আশ্রমের হলঘরে অখণ্ড নামকীর্তন হইবার কথা। গত রাত্রিতে মেয়েরা নামরক্ষা করিয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৭।

দিল্লী হইতে পত্র আসিয়াছে। গত পরশু সকালে মা শহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত জগজ্জীবন রামজী মাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যান। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী মাকে ফুল, মালা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। জগজীবন রামজীর বাসাতে আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন।

দিল্লী শহরের বিভিন্ন ভক্তগৃহে মা।

সেখান হইতে মাকে দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে লইয়া যাওয়া হয়। কোনও একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির সহায়তায় ওখানে নূতন একটি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই উপলক্ষে এবার বিশেষ উৎসবও হইয়াছে। উৎসবে যোগদান করিবার জন্য মা'র নিকট দুই-তিনবার অনুরোধ আসিয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের জন্য সেই সময় মা'র পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। সেদিন কয়েকজন ভক্ত মোটরে লইয়া গিয়াছিল। মিশনের সাধুরা মাকে আশ্রমের সব-কিছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে মাকে শ্রীযুক্ত পি. এন. বাজাজের নূতন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাজাজ ভারত-সরকারের খাদ্য-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর।

বিকালবেলা অখণ্ড নামকীর্তনে আসিয়া মা অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিয়াছেন। মা'র সঙ্গে সঙ্গে একটি অল্পবয়স্কা মেয়েও ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় মা মেয়েটিকে তাঁহার সম্মুখে টানিয়া লইয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাতখানি রাখিলেন এবং বাম হাতখানির অঙ্গুলিগুলি মুখের সঙ্গে লাগাইয়া দীর্ঘকাল একদৃষ্টে সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া নাকি মনে হইতেছিল যে মা যেন কোন্ অসীম প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন।

একটি অলৌকিক ঘটনা।

বাহ্য চৈতন্য যেন লুপ্ত হইয়াছে! কি আশ্চর্য। মেয়েটিও একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এত লোকজন এবং মা'র এই অবস্থা দেখিয়াও তাহার কোনও চাঞ্চল্য নাই। একটু পরে মা মেয়েটির দুই কাঁধের উপরে দুইখানি হাত রাখিয়া স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কীর্তনের মধ্যে যে মা'র ভাবাবেশ হইয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও সন্দেহ হইল না। কিন্তু মা বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। পাছে কিছু ঘটিয়া যায় এইজন্যই বোধ হয় মেয়েটিকে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে নাকি মা'র চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার পরে কীর্তন সমাপ্ত হইয়া গেলেও মা অনেকটা সময় তন্ময় হইয়া গাহিতেছিলেন—

"নিতাই ডাকে আয়
গৌর ডাকে আয়।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায়॥"

৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

মায়ের নির্দেশে আমি আজ কাশী এক্সপ্রেসে বম্বে রওনা হইলাম। গতবার ভাইয়া যখন আসিয়াছিলেন আমাকে এই সময় আর একবার দুই-তিন সপ্তাহের জন্য ডাক্তার দ্বারা ভাল করিয়া পরীক্ষা করাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। কবে যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া মা'র সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিব তাহা একমাত্র মা-ই জানেন।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

আজ সন্ধ্যায় বম্বেতে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশনে লীলা বেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আমাকে সোজা ভিলে পার্লের বাসায় লইয়া আসিলেন।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

এখানে আসিয়া এতদিন পরে চিঠিতে মা'র সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মা'র শরীরটা ভাল না এবং কখন কোথায় যান, সেইজন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম।

মা'র শরীর এবং ভাব দুইটিই ভাল আছে জানা গেল। তবে দুই-তিন দিন হয় ঠাণ্ডাটা ওখানে একটু বেশী পড়ায় মা ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারিতেছেন না।

এখন লোকজনের ভীড় কমিয়া গিয়াছে। বাহিরের ভক্তদের মধ্যে বিশেষ করিয়া কেবল ডাঃ পান্নালাল, মিসেস্ শিবদাসানি, ভুবনদাদা প্রভৃতি কয়েকজন আছেন। মা আরও কতদিন ওখানে থাকিবেন এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। তবে খুব সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি দিন আছেন।

মা'র বিশ্রাম আজকাল একরূপ মন্দ হইতেছে না। তবে সকালের দিকে প্রায়ই কোথাও না কোথাও বাহিরে যাইবার প্রোগ্রাম থাকে। দিল্লীর অসংখ্য ভক্তদের প্রার্থনা এইভাবে মা ধীরে ধীরে পূর্ণ করিতেছেন। গত ২রা মাকে রাষ্ট্রপতি-ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মাকে একবার যাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। মা'র সঙ্গে হরিবাবাজী, চক্রপাণিজী, টিহরীর মহারাজা-মহারানী, মণ্ডীর রাজাসাহেব, যোগীভাই, ডাঃ পান্নালালজী

রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদজীর একান্ত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি ভবনে মা।

এবং আশ্রমের কয়েকজনও গিয়াছিল। রাষ্ট্রপতির অসুস্থতার জন্য মাকে এবং অন্যান্য সকলকেও উপরে তাঁহার পূজার ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মা'র কাছে তিনি প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—"আপনি আশীর্বাদ করুন, ভগবানে যেন ভক্তি হয়।" তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ত মাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বিশেষ করিয়া তিনি মা'র প্রতি এরূপ তীব্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন যে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

পরদিন সকালেই তিনি পুনরায় মা'র নিকট আসিয়া উপস্থিত। মা'র জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন; বৃদ্ধা মহিলা মাকে রাষ্ট্রপতি-ভবনে গিয়া একদিন ভোগ লইবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন।

দিল্লীর গান্ধী ময়দানে গীতা-জয়ন্তী উৎসব চলিতেছে। মাকে সেখানে ওরা সকালে লইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা বিড়লাজীর বিশেষ অনুরোধে মা ও হরিবাবা প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিড়লা-মন্দিরে গমন করেন। সন্ধ্যার প্রোগ্রাম সেইখানেই হইয়াছে। মায়ের দর্শনের জন্য সেখানে নাকি অস্বাভাবিক ভীড় হইয়াছিল।

৪ঠা খুব ভোরে হরিবাবাজী বৃন্দাবন রওনা হইয়া গিয়াছেন। চক্রপাণিজীও সেইদিনই চলিয়া গিয়াছে। আর অবধূতজীকে আহমদাবাদের কান্তিভাই মুন্সা তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। কান্তিভাই সস্ত্রীক কয়েকদিনের জন্য মা'র নিকটে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা'র নিকট বিশিষ্ট জনগণের আগমন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে শ্রীজগজীবন রামজী সস্ত্রীক মা'র নিকট দুই-তিনদিন আসিয়াছিলেন। আমেরিকান চিত্র-তারকা জোনিকার জোন্‌স্ মা'র নিকট হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতেও মা'র সঙ্গে কথা বলিবার জন্য পুনরায় গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করিবার কথা ছিল;

কিন্তু মা'র সহিত কথা না বলিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত না। সেইদিন রাত্রিতে মা'র সঙ্গে কথা বলিয়া পরদিনই তিনি প্লেনে আমেরিকা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া একদিন মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অর্থ-সংক্রান্ত একটি জটিল মোকদ্দমায় তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ডালমিয়াজী মাকে বলিয়া গিয়াছেন,—"মাতাজীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে; তাহাই আমার কল্যাণের জন্য, শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিব। যদি আমার জেলও হয়, তবুও আমি তাহা মায়ের আশীর্বাদই মনে করিব।" এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তাঁহার এই ভাবের নির্ভীক কথা শুনিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

মণ্ডীর রানীসাহেবার সহিত কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ যুবরাজ করণ সিং মা'র দর্শনের জন্য একদিন রাত্রিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মা (কাশ্মীরের মহারাজা স্যর হরি সিংএর স্ত্রী) পূর্বে মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ এই প্রথম মা'র নিকট আসিলেন। মা'র সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তাও হইয়াছে। মা'র নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ খুবই সমস্যাপূর্ণ। এই সময়ে যুবরাজের আগমনের ফলে মা'র আশীর্বাদে যদি কাশ্মীর-সমস্যার কিছু সমাধান হয়, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাহাই আশা করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন ধামিজা সাহেব (শ্রীযুক্ত জগন্নাথ ধামিজা আই.এফ.এস. ভারত-সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী) মাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে মা অল্প সময়ের জন্য আগা সাহেবের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন।

গতকাল মা রাষ্ট্রপতি-ভবনে সকালবেলা গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদজী মাকে তাঁহার ওখানে গিয়া আহার করিতে বার বার অনুরোধ জানাইয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারী কুসুম ও ভরদ্বাজ গিয়া

মা'র ভোগ পাকের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মা'র সঙ্গে সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি-ভবনের মধ্যে বিরাট্ মোগল গার্ডেনে মা'র জন্য পৃথক্ তাঁবু লাগান হইয়াছিল। মাকে সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখান হইয়াছে। স্থানটি খুবই শান্তিপূর্ণ। মা-ও নাকি বলিয়াছেন,—"বেশ শান্ত জায়গা। পাখীর আওয়াজও যেন শোনা যায় না। একান্ত বাস হয়ে গেল।"

মা'র ভোগ হইয়া গেলে মা খাবার জিনিস রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ত সর্বদাই প্রায় মা'র সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাহা ছাড়া রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুইজন A.D.C. মায়ের কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন, কখন কি প্রয়োজন হয় পূর্ণ করিবার জন্য।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের অফিসের কাজ খুব বেশী থাকায় তিনি মা'র খাওয়ার সময় আসিতে পারেন নাই। পরে মাকে একেবারে মোটর পর্যন্ত আসিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। বার বারই বলিতেছিলেন,—"আমার বহিনজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে আপনার ভোগ এখানে হয়। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম যে এখানে মা'র ভোগের উপযুক্ত স্থান কোথায়? তবুও আপনি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন।"

মা'র গাড়ী গেট হইতে বাহির হইয়া না আসা পর্যন্ত তিনি করজোড়েই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি এবং শ্রদ্ধা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

আজ দিল্লী হইতে দুইখানা পত্র পাইলাম। মা'র শরীর মোটামুটি বেশ ভালই আছে জানিয়া সুখী হইলাম। মা প্রায় রোজই সকালে উঠিয়া একবার সৎসঙ্গে গিয়া বসেন। বিকালেও বেশ কিছু সময় হলঘরে বসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া থাকেন।

মা হয়ত ১৩।১৪ তারিখ পর্যন্ত ওখানে থাকিতে পারেন। তাহার পর একবার বৃন্দাবন যাইবার কথা। হরিবাবা মাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য একবার বৃন্দাবন যাইতে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ভারতের অন্যতম আইন-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপাল-স্বরূপ পাঠক এলাহাবাদ হইতে মা'র দর্শনের জন্য গিয়া চুপচাপ সৎসঙ্গে বসিয়াছিলেন। প্রথমে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। পরে মা-ই তাঁহাকে দেখিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে মাত্র কয়েকদিন হয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার ৺সরস্বতী-পূজা যাহাতে এলাহাবাদে তাঁহার বাড়ীতে হয় এবং মা যাহাতে কৃপা করিয়া পদার্পণ করেন সেজন্য বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছেন।

এবার নাকি জন্মোৎসব বৃন্দাবন আশ্রমে হইবার কথা হইয়াছে। যোগী-ভাইএরও তাহাই মত। সংযম-সপ্তাহ সম্বন্ধেও বিড়লাজী বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছেন যে আগামী বৈশাখ মাসে যাহাতে হৃষীকেশের স্বর্গাশ্রমে সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। তিনি তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন।

সংযম-সপ্তাহ সম্বন্ধে মা'র নিকট শ্রীযুক্ত মোদী এবং যোধপুরের মহারানীও অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। সেইজন্য হয়ত এখন হইতে বৎসরে দুইটি করিয়া সংযম-সপ্তাহের আয়োজন হইতে পারে।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

দিল্লী হইতে পানুর চিঠি আসিয়াছে। ওখানে খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। মা'র সমস্ত শরীরে একটা খুব ব্যথা ব্যথা ভাব। দুই-তিন দিনের মধ্যেই

মা'র বৃন্দাবন যাইবার কথা। তবে বৃন্দাবনে যে কতদিন থাকা তাহা কিছুই ঠিক নাই। কারণ এখন বৃন্দাবন, দেরাদুন, বিন্ধ্যাচল সর্বত্রই খুব ঠাণ্ডা। তাই মা যে কোন্‌দিকে যাইবেন এখন কিছু স্থির হয় নাই।

গত পরশু রাত্রে পাঞ্জাবের গভর্নর স্যর চণ্ডিকাপ্রসাদ সিংহ মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে আর কখনো মা'র দর্শন পান নাই।

পাঞ্জাবের গভর্নর শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদজীর মাকে দর্শন।

একান্তে মা'র সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলিয়াছেন। মাকে নাকি বলিয়াছেন,—"মা, আপনার জন্য কত লোকের দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদিন আমি আপনার দর্শন পাই নাই। রাজেন্দ্রবাবুর সহিত আপনার একান্তে দেখা হইলে খুব ভালো হইত।"

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

বৃন্দাবন হইতে বুনির চিঠিতে মা'র বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম। গতকাল মা বেলা ১॥০টার সময় বর্মণজীর গাড়ীতে বৃন্দাবন রওনা হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে মণ্ডীর রানীসাহেবা। তাঁহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূও সঙ্গে আসিয়াছেন।

দিল্লীতে গতকাল সকালে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মা'র সঙ্গে একান্তে সাধন-ভজন সম্বন্ধে কিছু কথাও বলিয়াছেন।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৭।

বৃন্দাবন হইতে পত্রে জানিলাম যে মা নিয়মিতভাবে হরিবাবার আশ্রমে সৎসঙ্গে যাইতেছেন। আহমদাবাদ হইতে নটবরভাই প্যাটেল সপরিবারে

মা'র নিকট গিয়াছেন। তাঁহারা বড়ই শোকার্ত। কিছুদিন হয় নটবরভাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফ্রিকায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। নটবরভাইয়ের ছেলেটির বয়স যখন মাত্র দেড় বৎসর তখন মা একবার আহমদাবাদ গিয়াছিলেন। ছেলেটি সে সময় খুবই অসুস্থ ছিল। জন্মাবধি তাহার নিদ্রা হইত না। মা ঐ ছেলেটির বিষয় পিতামাতাকে কিছু বলেন। আশ্চর্যের বিষয় সেইদিন হইতেই ছেলেটির নিদ্রা হইতে সুরু হয়। মায়ের এইরূপ অযাচিত কৃপাতে নটবরভাই প্রভৃতি বিশেষ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আরও একটি সংবাদ পাইলাম। মণ্ডীর রানীসাহেবার বহুদিন হইতেই ইচ্ছা যে বৃন্দাবনে মা'র জন্য সুন্দর একটি বাড়ী নির্মিত হয়। কিন্তু গত চার-পাঁচ বৎসর তাঁহারা প্রবাসে থাকায় বাড়ীর কোনও কাজ এ-যাবৎ আরম্ভ হওয়া সম্ভব হয় নাই। এবার মা'র সঙ্গে তিনি একটি দিনের জন্য বৃন্দাবন আশ্রমে গিয়াছিলেন। সকালবেলা তিনি পরমানন্দ স্বামিজীর সহিত আশ্রমের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছেন, এমন সময় মা বাহিরে আসিলে, তাঁহার সঙ্কল্পের কথা উঠিলে মা'র মুখ হইতে বাহির হইল,—"প্রতিষ্ঠা-ট্রতিষ্ঠা ইচ্ছা হ'লে আজও করতে পার।" সঙ্গে সঙ্গে পাঁজি খুলিয়া দেখা গেল যে সেইদিনই বেলা ১২টার সময় খুব ভাল ক্ষণ।

জায়গা মাপা হইতেছে, এমন সময় মা এক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"পরমানন্দ, এইখানটা কি রকম হয়?" স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটাই ভিত্তি-স্থাপনের জন্য খুঁড়াইতে লাগিলেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের কার্য সম্পন্ন হইল। রানীসাহেবার এতদিনের শুভ ইচ্ছা এই-ভাবে পূর্ণ হইতে চলিল দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

মা বৃন্দাবন হইতে কোন্ দিকে যাইবেন, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে পানু লিখিয়াছে যে লোকজন হয়ত মা সঙ্গে বেশী রাখিবেন না। কুসুম রায়পুর আশ্রমে গিয়াছে। হীরু কল্যাণবনে থাকিবে। কান্তিভাই মা'র নির্দেশে ভীমপুরার দিকে যাইতেছে।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৭।

পানুর পত্র আসিয়াছে। লিখিয়াছে, আজ সকালে মা'র দিল্লী যাওয়ার কথা। সেখান হইতে বিকালে মোদীনগর গিয়া একরাত্রি থাকিয়া কিষণপুর আশ্রমে যাইবেন। মা'র সঙ্গে শুধু পরমানন্দ স্বামিজী, ভরতভাই, পুষ্প ও গোপালের মা'র যাইবার কথা। আর বুনি রমাদি প্রভৃতি সকলকে মা কাশী পাঠাইয়া দিতেছেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭।

আজ সন্ধ্যায় ভাইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। কলিকাতার ডাঃ সুধীন মজুমদার সরকারী কাজে দার্জিলিং গিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছেন। সুধীনদার ন্যায় আশ্রমের এইরূপ হিতৈষী বন্ধু নাই বলিলেই চলে। সর্বদা তিনি আশ্রমবাসী এবং আশ্রমের পরিচিত যে কোন লোককে অযাচিতভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ অকালমৃত্যুতে আশ্রম খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সন্দেহ নাই।

মায়ের এক বিশিষ্ট ভক্তের মৃত্যু—একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এই সংবাদে মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। ঘুম আর আসিতেছে না। হঠাৎ ফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। আহমদাবাদ হইতে আমার নামে Trunk Call আসিয়াছে। উর্মিলা (কান্তিভাই মুন্সার মেয়ে) ফোন করিতেছে আজ সন্ধ্যার সময় কান্তিভাই হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও ঐ একই উত্তর পাইলাম। সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৭।

সকালে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসিতে লাগিল যে, কান্তিভাই মুনসার মৃত্যু-সংবাদ যাহা কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা সত্য কি না? কেহই যেন এই সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

কান্তিভাই আশ্রমের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন যে কোন প্রয়োজনে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছি তিনি সর্বদা প্রাণপণে তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মা'র প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহার সমস্ত পরিবারটিই ভক্ত পরিবার। আজ এক এক করিয়া আমার সাবিত্রী-যজ্ঞের কথা, কাশীর ভগ্ন ঘাটের কথা এবং ঐ সকল কাজে কান্তিভাই কিরূপ অকুণ্ঠিতভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িতে লাগিল।

এই ত গত নভেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি মা'র নিকট দিল্লী গিয়াছিলেন। আসিবার সময় মা'র অনুমতি লইয়া শ্রীঅবধূতজী মহারাজকে সঙ্গে করিয়া আহমদাবাদ লইয়া আসিয়াছেন। অবধূতজী উৎকণ্ঠেশ্বর মহাদেব-মন্দিরে ছিলেন। হঠাৎ কি কারণে তিনি গতকাল আহমদাবাদ আসিয়াছিলেন। তখনই কান্তিভাই অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুর সময়েও অবধূতজী উপস্থিত ছিলেন।

আজ আরও একটি আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। পর পর তিনটি মৃত্যু-সংবাদ দুই দিনের ভিতরে।

রমাদির স্বামী মীরাটে ছিলেন। গত পরশু সন্ধ্যাবেলা তিনি স্টেশনে প্লাটফর্মের উপরে হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছেন। রমাদিকে মা সেইদিনই বৃন্দাবন হইতে কাশী রওনা করাইয়া দিয়াছিলেন। পরে কাশীতে এই দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি মীরাটে গিয়াছেন।

রমাদির স্বামী ডাঃ রামবাবু সাক্‌সেনা মা'র ভক্ত ছিলেন। তিনি উত্তর প্রদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান বীর ছেলেবেলা হইতেই মা'র নিকট আসা-যাওয়া করে। বর্তমানে সে I.A.S. পাশ করিয়া Railway Asstt. Traffic Supdt. হইয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭।

এই কয়দিন মা'র কোন গতিবিধির সংবাদই পাইতেছিলাম না। আজ চিত্রার চিঠিতে বিস্তারিত জানিলাম। মা গত ২৭শে হরিদ্বার হইতে যোগী-ভাইয়ের মোটরে দিল্লী আসিয়া এক রাত্রি সেখানে ছিলেন। তাহার পরে ২৮শে সকালে তুফান এক্সপ্রেসে মা এটোয়া রওনা হইয়া প্রায় সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছান।

এটোয়াতে দাদা আশ্রমের জন্য একটি জমি নিয়াছে। সেখানে মহাবীরের একটি ছোট মন্দিরও আছে। আশ্রমের সেই নূতন জমিতে মা'র চরণ-স্পর্শ করাইবার জন্যই দাদা বিশেষ করিয়া মাকে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মা অবশ্য এবারও বাজপেয়ীদের বাড়ীতেই আছেন। মা'র সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, ভরতভাই, চিত্রা, পুষ্প ও গোপালের মা আছেন।

বৃন্দাবনে বিদ্যাপীঠের ছেলেরা সকলে আছে। তাহারা মথুরা স্টেশনে আসিয়া মা'র দর্শন করিয়াছিল।

মা'র কথানুসারে দাদা আশ্রমের জমির উপর যে হনুমানজীর মন্দির আছে সেখানে পূজা করিয়া ভালভাবে ভোগ দিলেন।

———